আধুনিকীকরণ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

(এম ফিল অভিসন্দর্ভ)

গবেষক
হোসনে জাহান জেবা
তত্ত্বাবধায়ক
ডালেম চন্দ্র বর্মণ

Dhaka University Library
400909
400909

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
এপ্রিল ২০০৩

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

M. Phil

GIFT

400909

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এ এম ফিল অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা হয়েছে । এটি হোসনে জাহান জেবার নিজস্ব রচনা । এর কোন অংশ কোথাও প্রকাশের জন্য জমা দেয়া হয়নি ।

05/04/03

400909

(ড. ভালেম চন্দ্র বর্মণ)
অধ্যাপক
শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
অধ্যায় - ১	
ভূমিকা	১-৫
অধ্যায় - ২	
আধুনিকীকরণ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা	৬-২৮
অধ্যায় - ৩	
আধুনিকীকরণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও পাকিস্তান ভাঙ্গন	২৯-৫৮
অধ্যায় - ৪	
পার্বত্য চট্টগ্রামে আধুনিকীকরণের প্রভাব ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা	৫৯-৯৪
অধ্যায় - ৫	
কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা (ঐতিহাসিক ও বর্তমান প্রেক্ষাপট)	৯৫-১৩৪
অধ্যায় - ৬	
শিল্পে আধুনিকীকরণ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা	১৩৫-২১২
অধ্যায় - ৭	
উপসংহার	২১৩-২১৬
গ্রন্থপঞ্জী	২১৭-২২৩

400909

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রণয়নে সর্বপ্রথম যাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয় তিনি হলেন সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ও উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মণ । তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, যথার্থ নির্দেশনা, সক্রিয় সহযোগিতা, মূল্যবান উপদেশ, গঠনমূলক ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ, সুচিন্তিত অভিমত, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় আমি এ গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। সেজন্য আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী। তাঁর স্নেহপূর্ণ আচরণ, নৈতিক সমর্থন এবং যৌক্তিক উপদেশ আমার জীবন পথে পাথেয় হয়ে থাকবে ।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান এবং সকল শিক্ষককে যাঁদের মূল্যবান উপদেশ ও নির্দেশনা আমার গবেষণাকর্মে গঠনমূলক ভূমিকা রেখেছে।

আমার এ গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে যে সকল প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, ঢাকা পাবলিক লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা (BIDS), বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS), ব্যানবেইস, জাতীয় গ্রন্থাগার ও আর্কাইভ্স, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ (BIISS) ও এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী অন্যতম। এ সকল প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ।

আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার সহপাঠী বন্ধুদের, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ ও আপনজনদের যারা আমার গবেষণাকর্ম চালিয়ে যেতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। তাঁদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ।

সবশেষে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা বেগম বেগজাদী মাহমুদা নাসির, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সরদার কজলুল করিম এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলীকে যাঁদের অবদান আমার গবেষণা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে ।

হোসনে জাহান জেবা

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ১

ভূমিকা

আধুনিকতা মানুষের কার্যক্ষেত্রে এনেছে গতিময়তা এবং বিপদজ্জনক প্রতিবেশ সম্বন্ধে বোধ এবং বোধজাত পরিবর্তন । ঐতিহ্য এবং আধুনিকতা শাব্দিকক্ষেত্রে যুক্ত। আধুনিকতার বিপরীত হচ্ছে ঐতিহ্য । বলা যায় আধুনিকতা ঐতিহ্য কিংবা পশ্চাদপদতার বিপরীত এক মতাদর্শ ।

সনাতন সমাজ পশ্চিমের সংশ্রবে আসার আগে ছিল স্থির, পণ্যহীন বিনিয়োগ এবং সমাজবদ্ধ কাঠামো। এই অর্থে ঔপনিবেশিক মতাদর্শ আধুনিকতার সঙ্গে যুক্ত। সনাতন সমাজে ঔপনিবেশিকতার মাধ্যমে আধুনিকতার উদ্ভব হয়েছে। এই আধুনিকতা ঔপনিবেশিকতার আগের ঐতিহ্যকে নিচু করে দেখেছে এবং ঔপনিবেশ সৃষ্ট আধুনিকতার উপর জোর দিয়েছে । ঔপনিবেশিক সময়ের সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় দিক হল ঔপনিবেশিক প্রশাসন প্রত্যক্ষ ও স্তরস্পর্শী প্রভাব তৈরী করেছে যেমন ঃ রাজনৈতিক কাঠামো, ভূমি ব্যবস্থা, অন্যান্য সমাজ সংগঠন ।

বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীরের মতে, " আধুনিকতা প্রত্যয়টি পশ্চিমের ইতিহাস থেকে উদ্ভব লাভ করেছে । প্রত্যয়ের ইতিহাসটি জনকালো হয়েছে বৈশ্বিক ধনতন্ত্রের সম্পদ থেকে এবং এই সম্পদের পরিপ্রেক্ষিত তৈরী হয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেসিকতাবাদ থেকে এবং এই দুইয়ের সম্মিলিত আরোপনের মধ্য দিয়ে । সেজন্য কর্তৃত্বের যে প্রক্রিয়া তৈরী হয়েছে সে প্রক্রিয়া সর্বগ্রাসী" ।[১]

আধুনিকতা হল সামাজিক বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতা, আর আধুনিকায়ন হচ্ছে সামাজিক বৈশ্বিক প্রক্রিয়া । আধুনিক জীবনের শক্তি সঞ্চয়, বিকাশ ও রূপান্তরের উৎস হচ্ছে আধুনিকায়ন। যেমন জৈব বিজ্ঞানের বড় বড় উদ্ভাবনা, শিল্পায়ন, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রাযুক্তিক রূপান্তর ইত্যাদির ফলে নতুন পরিবেশের উদ্ভব হয় ও পুরোনো পরিবেশের বিলুপ্তি ঘটে। জীবন গতিময় হয় এবং নতুন ক্ষমতা সংগঠন ও নতুন শ্রেণী সংঘাত দেখা দেয়। এভাবেই মানুষ পূর্বপুরুষের জীবন থেকে বেরিয়ে এসে নতুন ধরনের জীবনে প্রবেশ করে এবং নগরের পর নগরের পত্তন ঘটে । যোগাযোগের বিকাশ ও গতিশীলতায় মানব সমাজ বদলাতে থাকে । বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের বোধ ও মানুষের অবস্থানের কল্পনা রূপান্তরিত হয়। ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক বাধনগুলো শিথিল হয় এবং মানব সমাজগুলো কাছাকাছি চলে আসে । এর মধ্য দিয়েই বিভিন্ন শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। আর আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের মাধ্যমে ক্ষমতা বাড়তে থাকে । এক পর্যায়ে রাষ্ট্র ও আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর বিরুদ্ধে সাধারণ জনগণ প্রতিবাদী হয়ে উঠে। ফলে দেখা দেয় সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন। এই ঘটনাগুলো একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে ঘটতে থাকে আর এই প্রক্রিয়াকেই মার্শাল বার্মেন বলেছেন আধুনিকায়ন এবং এই প্রক্রিয়া যে অভিজ্ঞতার জন্ম দেয় তাকে বলেছেন আধুনিকতা । আধুনিকীকরণ থেকে মানুষ জগত বদলানোর শক্তি পায় আবার মানুষদেরকে বদলে দেয় ঐ আধুনিকীকরণ। মার্শাল বার্মেন তার " অল দ্যাট ইজ সল্যিসেনট্স ইনটু এয়ার" বইটিতে আধুনিকায়ন ও আধুনিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন । তার মতে আধুনিকতা একটা অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞতা আধুনিকায়নের মধ্যদিয়ে প্রবাহমান এবং যার মাধ্যমে উদ্ভব ঘটে আধুনিকবাদের। তিনি মনে করেন অভিজ্ঞতা হলো ব্যক্তির অসীম আত্ম-উন্নয়ন, আত্মবিকাশ, আত্ম-বিস্তার। বারমেনের বিশ্বাস, আধুনিক অর্থনৈতিক জীবন থেকেই আধুনিকতার সকল উদ্যম, আবেগ, অন্তদৃষ্টি ও উদ্বেগ উৎপন্ন হয়েছে ।

পাকিস্তান ভাঙ্গনের প্রক্রিয়াটি অনুধাবন করতে পারলে বিষয়টির গভীরতা বুঝা যায়। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, প্রধানত অর্থনৈতিক শোষণের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ প্রতিবাদি হয়েউঠে। এর সুদূর প্রসারি প্রভাব হচ্ছে পাকিস্তান ভাঙ্গন। সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে বিষয়টির বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সনাতন সমাজ ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ভেঙ্গে আধুনিক সমাজের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আর এটা সম্ভব হচ্ছে যোগাযোগের মাধ্যমে। ঐ অঞ্চলের কিছু শিক্ষিত মানুষের সচেতনতার ফলস্বরূপ পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি অনগ্রসর জনগোষ্ঠী নিজেদের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সোচ্চার হয়। তাদের দাবী দাওয়া বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে আন্দোলনের পথ বেছে নেয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়। আর অনগ্রসর ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে সচেতন করে তুলতে ও নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসে তাদেরই ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর কিছু উচ্চ শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিপ্রাপ্ত আধুনিক চেতনামনস্ক তরুণ ব্যক্তিত্ব। পাহাড়িদের মধ্যে চাকমারাই অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর ছিল, ফলে স্বাভাবিকভাবেই নেতৃত্বস্থানে তারাই মূখ্য ভূমিকা পালন করে। সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে ।

দেশবিভাগের আগে বাংলাদেশে তেমন শিল্প-কারখানা ছিলনা । দেশবিভাগের পর থেকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়া শুরু হলেও দ্রুত গতিতে হচ্ছে না । আধুনিকীকরণের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে শিল্পায়ন। শিল্পায়নের ফলে উন্নয়নের পাশাপাশি এর নেতিবাচক প্রভাবও পড়ছে সমাজে । বর্তমানে বাংলাদেশে রপ্তানীখাতের সর্বোচ্চ আয় পাট শিল্পের পরিবর্তে গার্মেন্ট সেক্টর দখল করেছে । শিল্প ক্ষেত্রে যখন মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় তখন শ্রম অসন্তোষ দেখা দেয় । বাংলাদেশের শ্রমিকসংঘ উন্নত বিশ্বের তুলনায় দুর্বল হলেও বিভিন্ন সময়ে তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে মালিকপক্ষ ও সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে যার ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয় । তাছাড়া, শিল্প বিরাষ্ট্রীয়করণ করতে গেলেও শ্রম অসন্তোষ দেখা

Dhaka University Institutional Repository

দেয় । বাংলাদেশে বর্তমানে ৪.৫% হারে শিল্প শ্রমিক বাড়ছে । বাংলাদেশে শিল্প শ্রমিকদের মজুরি হার আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় অনেক কম । আর এ কারণেই গার্মেন্টস সেক্টর প্রসার লাভ করেছে । নিম্ন মজুরিকে কেন্দ্র করেই প্রায়ই শ্রম অসন্তোষ দেখা দেয়। দেশের শ্রমিকদের অদক্ষতার অন্যতম কারণ হচ্ছে নিম্ন মজুরি । আধুনিকীকরণ সামাজিক, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিতেও ভূমিকা রাখে। বর্তমান বিশ্বে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে কৃষি সেক্টর প্রায় ইন্ডাষ্ট্রির পর্যায়ে চলে এসেছে । এখানেও আধুনিকীকরণের ফলে উন্নয়নের পাশাপাশি নেতিবাচক প্রভাবের বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে । বর্তমান বিশ্বের বিপুল সংখ্যক কৃষককুল / শ্রেণী জৈব প্রযুক্তি, জিন প্রযুক্তি ও বহুজাতিক কর্পোরেশনের কাছে জিম্মি । তৃতীয় বিশ্বের কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় এবং বাস্তবতার নিরিখে তারা অসহায় ও দরিদ্র । বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা এই অবস্থা থেকে মোটেও মুক্ত নয় । তারা আর্থিক অনটনের পাশাপাশি মানসিক অস্থিরতায় ভুগছে যা সামাজিক অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি করে । কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ, দ্বন্দ্ব থাকলেও তারা তা বাস্তবে রূপায়িত করতে অক্ষম । কারণ তাদের মধ্যে নেতৃত্ব দেবার মত ব্যক্তিত্ব তেমন নেই । তাছাড়া বাংলাদেশের কৃষকদের মধ্যে চেতনা নেই বললেই চলে শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের তুলনায় । তারা অন্তর্কলহ বা অন্তর্দ্বন্দ্বে বেশী লিপ্ত থাকে । আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ বা সবুজ বিপ্লবের ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং লাভবান হয়েছে বেশী পুঁজির অধিকারি ধনী কৃষকরা । ১৯৯৬ সালের সার সংকটের সময় কৃষকরা আন্দোলনে নামলে রাজনৈতিক অস্থিশীলতা দেখা দিয়েছিল । ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় বাংলার কৃষকরা যুগ যুগ ধরে শোষিত হলেও একপর্যায়ে তারা বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা রাখে এবং তারা জয়ী হয়। সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের কৃষক বিদ্রোহগুলো লক্ষ করলে তা অনুধাবন করা যাবে । পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে কৃষি, শিল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পাকিস্তান ভাঙ্গনে আধুনিকীকরণের প্রভাব ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা ঃ

বর্তমান গবেষণার বিষয় হচ্ছে "বাংলাদেশে আধুনিকীকরণ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ঃ একটি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ।" এ বিষয়ের উপর আগে খুব বেশী গবেষণা হয়নি। বাংলাদেশে বর্তমানে সামাজিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সর্বক্ষেত্রেই পরিবর্তন হচ্ছে। দেশটি আধুনিক রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে গিয়ে আধুনিকায়ন প্রক্রিয়া অতিক্রম করে আসতে হচ্ছে। এর ফলে নানা সমস্যা দেখা দেয়ায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা ও অরাজকতার সৃষ্টি হচ্ছে। যা প্রায়ই জাতীয় রাজনীতিকে অস্থিতিশীল করে তুলে। এ থেকে বুঝা যায়

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিকীকরণ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তাই আমি মনে করি এ বিষয়ে গবেষণা করার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। যেমন-গবেষণার মাধ্যমে জানতে পারছি আধুনিকতার প্রভাব বাংলাদেশে কতটুকু। সমাজ জীবন ও রাজনীতিতে এর প্রভাবে কি ঘটছে। আধুনিকীকরণের প্রভাব কিভাবে রাজনীতিকে অস্থিতিশীল করছে। অতএব, বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে "বাংলাদেশে আধুনিকীকরণ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ঃ একটি আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ" এর উপর গবেষণা করা যৌক্তিক ।

গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

প্রত্যেকটি গবেষণার প্রধান বা মূখ্য উদ্দেশ্য কি বা গবেষণা বিশেষ কি উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবে তা জানা প্রয়োজন । এ গবেষণার মূখ্য উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশে আধুনিকীকরণের ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হচ্ছে তা নিরূপণ ও অনুসন্ধান করা । এই মূখ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যাবলী নির্বাচন করা হল ঃ-

- বাংলাদেশ বর্তমানে সনাতন, আধুনিক না রূপান্তরশীল সমাজ ?
- বাংলাদেশ সৃষ্টিতে আধুনিকতার অবদান কি ভূমিকা রেখেছে ?
- পার্বত্য চট্টগ্রামের মত সনাতনধর্মী সমাজে আধুনিকীকরণের প্রভাবে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মাত্রা নির্ধারণ ।
- কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের প্রভাব নিরূপণ ।
- শিল্পে আধুনিকীকরণের প্রভাবের ফলে অস্থিতিশীলতার প্রকটতা কতটুকু ।

গবেষণার পদ্ধতিঃ

গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় । যেমন -

(১) সামাজিক জরিপ পদ্ধতি, (২) ঐতিহাসিক পদ্ধতি (৩) সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ।

বর্তমান গবেষণায় ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে । ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে যখন কোন কিছুকে পর্যালোচনা করা হয় তখন তাকে ঐতিহাসিক পদ্ধতি বলে । এসব ঘটনাবলীকে বিশ্লেষণ করতে হলে তা অবশ্যই ঐতিহাসিক পটভূমির ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করতে হবে । তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য বিষয় সম্পর্কিত দেশী বিদেশী জার্নাল, পুস্তকাদি, পত্র-পত্রিকা, বিশ্বব্যাংক রিপোর্ট, এডিবি রিপোর্ট, বিভিন্ন ধরনের গবেষণামূলক রিপোর্ট, গ্রন্থ ইত্যাদির সাহায্য নেয়া হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার শ্রেণীবদ্ধকরণ ঃ

এই গবেষণাপত্রটিকে ৭ টি অধ্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে । ভূমিকা থেকে শ্রেণীবদ্ধকরণ পর্যন্ত প্রথম অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে আধুনিকীকরণ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত আলোচনা । তৃতীয় অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে পাকিস্তান আমলে আধুনিকীকরণ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত আলোচনা। চতুর্থ অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে আধুনিকীকরণের প্রভাব ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে । পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা (ঐতিহাসিক ও বর্তমান প্রেক্ষাপট) সম্পর্কিত আলোচনা। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আছে শিল্পে আধুনিকীকরণও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সম্পর্কিত আলোচনা এবং সপ্তম অধ্যায়ে রয়েছে উপসংহার।

তথ্য নির্দেশ

১. বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, *আধুনিকতা ও উত্তর আধুনিকতার অভিজ্ঞতা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ২

আধুনিকীকরণ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

ভূমিকা ঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষকগণ যে সব তত্ত্ব ও বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন আধুনিকীকরণের ধারণা তাদের মধ্যে অন্যতম । সময়ের বিবর্তনে মানুষ গতানুগতিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে যুক্তিবাদী উচ্চতর অবস্থার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে । আর এই ধারায় পৃথিবীর প্রতিটি জনপদ সামাজিক পরিবর্তনের একটি দৃঢ় প্রত্যয় হিসেবে এই পদবাচ্যটি ব্যবহার করে থাকে । আধুনিকীকরণ দুটো বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে (১) যুক্তিবাদ এবং (২) সমাজের অন্তর্গত সব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণের উপর আস্থা স্থাপন ।

সনাতন ও আধুনিকের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে সনাতন সমাজের ক্ষয়সাধন ও আধুনিক সমাজে উত্তরণের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াই হচ্ছে আধুনিকীকরণ। প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ,ব্যাপক সামাজিক আত্ম নির্ভরশীলতা, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, নগরায়ণ, শিক্ষিতের হার, সামাজিক গতিশীলতা ইত্যাদি উপাদানের উপস্থিতির মাধ্যমে আধুনিকীকণ সম্ভব । এক কথায় পশ্চিমের ধাচে নিজেদের কত তাড়াতাড়ি বদলে নেয়া যায় তা-ই আধুনিকীকরণ । S.P. Huntington এর মতে " Modernization is a special kind of hope. Embodied within it are all the past revolutions of history and all the supreme human desires. The modernization revolution is epic in its scale and moral in its significance. Its consequence may be frightening."

আধুনিকীকরণের উদ্ভব ঃ

ইতিহাসবিদরা মানব ইতিহাসের এক পর্বকে আখ্যা দিয়েছেন আধুনিক বলে । কিন্তু এই আধুনিক পর্বের সূচনা নিয়ে বিতর্ক আছে । ধর্মনিরপেক্ষতা ও যুক্তিবাদকে আধুনিক যুগের বিশিষ্ট লক্ষণ বলে ধরে নেয়া হয় । অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারকে আধুনিকতার মাপকাঠি হিসেবে দেখা হয় । কারো কারো মতে কম উন্নত দেশগুলো সামাজিক পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়ায় উন্নত দেশগুলোর ধরণ-ধারণ অর্জন করে তাই আধুনিকতা। বারমেন বলতে চেয়েছেন যে আধুনিকতা একটা অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞতা আধুনিকীকরণের মধ্য দিয়ে প্রবাহমান এবং যার মাধ্যমে উদ্ভব ঘটে আধুনিকবাদের । বারমেনের মতে এই অভিজ্ঞতাটা হল ঃ ব্যক্তির অসীম আত্ম-উন্নয়ন, আত্ম-বিকাশ, আত্ম-বিস্তার ।

আধুনিকতার ইতিহাসকে বারমেন তিন পর্বে ভাগ করেছেন । প্রথম পর্বের সময়কাল সতের শতকের প্রথম থেকে আঠারো শতকের শেষ পর্যন্ত । মানুষ এসময়ে কেবলমাত্র আধুনিক জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

অভিজ্ঞতা লাভ করতে শুরু করে । 'মর্ডান পাবলিক' বিষয়ে তাদের ধারণা ছিলনা । আধুনিকতার অভিঘাত বিষয়েও তারা অচেতন ছিল । ১৭৮৯ এর ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে দ্বিতীয় পর্বের শুরু । এ যুগে মর্ডান পাবলিকের উত্থান দেখা যায় । তারা বিপ্লবীযুগের বসবাসের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি শেয়ার করে । বিপ্লবোত্তর যুগে আধুনিকতার সঞ্চার ঘটলেও সে জীবন পুরোপুরি আধুনিক ছিলনা । বৈপরীত্য ছিল, একই সঙ্গে দুই জগতে বসবাসের উপলব্দি থেকে উদ্ভূত হয় আধুনিকতা এবং আধুনিকায়ন । বিংশ শতাব্দী হল তৃতীয় ও শেষ পর্ব । এ পর্বে পুরো পৃথিবী আধুনিকায়নের অন্তর্গত হয়েছে ।

ঐতিহাসিকভাবে আধুনিকীকরণের উদ্ভব হয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ইউরোপে । ইউরোপের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও রেনেঁসার মধ্য দিয়েই আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, মধ্যযুগের শেষভাগের স্বায়ত্তশাসিত নগররাষ্ট্রগুলোর বাণিজ্যিক অগ্রগতি পাশ্চাত্য জগতে আধুনিকীকরণের সূচনা করেছিল ।

মূলত Modernization প্রথম শুরু হয় ইংল্যাণ্ডে (১৭৬০-১৮৩০) শিল্প বিপ্লবের সাথে এবং ফ্রান্সে (১৭৮৯-১৭৯৪) ফরাসী বিপ্লবের ফলে । এসময় আমেরিকাও তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ শুরু করে এবং এটাকে বলা হত Westernization তারপর এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে শিল্পায়ন শুরু হয় । এ অবস্থায় সমাজতন্ত্রের বিপরীতে পুঁজি প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বব্যাপী আমেরিকার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে । এ প্রেক্ষাপট থেকেই আধুনিকীকরণের যাত্রা শুরু হয় । বর্তমানে আধুনিকীকরণ ও এর আকাঙ্খা বিশ্বব্যাপী।

আধুনিকীকরণ কি ?

আধুনিকীকরণ শব্দটি সমাজে বিভিন্নভাবে প্রচলিত । সাধারণভাবে বলতে গেলে, আধুনিকীকরণ হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার । অর্থাৎ প্রকৃতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে উন্নততর সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া । বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আধুনিকীকরণের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন । যেমন - বেঞ্জামিন সোয়ার্জেব (Benjamin Sehwariz) মতে- "বিভিন্ন মানবিক উদ্দেশ্যে মানুষের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে যুক্তিসঙ্গতভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মানুষের কর্মশক্তিকে সুব্যবস্থিত সুসংগঠিত ও উদ্দেশ্যপূর্ণ উপায়ে প্রয়োগ করার নামই হচ্ছে আধুনিকীকরণ।" (Modernization is the systematic, sustained and purposeful application of human energies to the rational control of man's physical and social environment for various human purposes."/D.A. Rustow

Dhaka University Institutional Repository

এর মতে " Modernization is the process of rapidly widening control over nature through closer co-operation among men." S.P.Huntington এর মতে "Modernization is a multi-faceted process involoving change in all areas of human thought and activity."

Marion Levy'র মতে, যে সমাজে শক্তির উৎসরূপে জড় পদার্থের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে অধিক, সে সমাজে আধুনিকতার পরিমাণও অধিকতর।[১] আবার সি.ই. ব্ল্যাক (C.E.Black) লিখেছেন যে, আধুনিকীকরণ এমন এক প্রক্রিয়া যার ফলে ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দ্রুত পরিবর্তনশীল কার্যকলাপ সম্পাদনের উপযোগী হয়ে উঠে এবং যা মানুষের জ্ঞানের বিকাশ, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক উন্নতি সাধন ও পরিবেশের উপর মানুষের সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।[২] রবার্ট ওয়ার্ড (Robert Ward) এর মতে, আধুনিকীকরণ হল মানুষের জীবনযাত্রার উপর প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের যুক্তিযুক্ত প্রভাব। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ আবেদন সৃষ্টি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা। জাতি ও রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রে একে রাজনৈতিক মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয় ।

রষ্টো (Rustow)-র ভাষায় আধুনিকায়ন হল ঐতিহ্যগত ও পাশ্চাত্য প্রভাবের এক গতিময় সংমিশ্রণ। (A dynamic blend of tradi-tional and western influence.)"[৩] (D.A.Rustow A World of Nations Problems of Poli-tical Modernization গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য)

ক্লড ই. ওয়েলচ (Claude E. Wlch) তাঁর Political Modernization : A Reader in Comperative Political Change নামক গ্রন্থে আধুনিকীকরণ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেছেন । তাঁর মতে আধুনিকীকরণ হচ্ছে এমন এক প্রক্রিয়া যা প্রাপ্ত সম্পদের যুক্তিযুক্ত সদ্ব্যবহার ঘটায় এবং আধুনিক সমাজ গড়ে তোলাতে চেষ্টা করে ।

সমাজে পরিবর্তন চলছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে । আর এ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী একথা সর্বজনস্বীকৃত বিশ্লেষকগণের মতে আধুনিকীকরণের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রেও সমভাবে পরিবর্তন সাধন অপরিহার্য । অন্য কথায় বলা যায় এরা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত । তাই এ সবকিছুই আধুনিকীকরণ অত্যাবশ্যক ।

Dhaka University Institutional Repository

সনাতন সমাজ ও আধুনিক সমাজের মধ্যে পার্থক্য ঃ

ভূমিকা ঃ মানব সমাজের ইতিহাস পরিবর্তনের ইতিহাস অর্থাৎ Change is the basic fact in the universe. মানুষের সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে আর এই পরিবর্তনের ধারায় সনাতন সমাজ রূপান্তরিত হচ্ছে আধুনিক সমাজে । আর এই পরিবর্তনের ধারার সঠিক অনুধাবনের প্রচেষ্টাই মানুষকে প্রগতি ও অগ্রগতির দিকে আকৃষ্ট করছে ।

সমাজ কি ?

সমাজ মূলত একটি সংগঠন বিশেষ । পারিবারিক বন্ধনে মানুষ এ সমাজে বাস করে । সমাজ গঠিত হয় বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সমন্বয়ে । F. Brown বলেন, The basic unit of social structure in every society is the family.

সমাজবিজ্ঞানী গিডিংসের মতে, সমাজ হলো একই মনোভাব সম্পন্ন কতগুলো ব্যক্তির সমষ্টি যারা একই মনোভাবের কথা জানে ও উপভোগ করে এবং সে কারণে সমজাতীয় লক্ষ্যের জন্য সমবেতভাবে কাজ করতে সক্ষম হয় ।

Hobbes এর মতে, "Society is a means for the protection of men against the consequences of their own untramelled natures." T.H. Green এর মতে, " A society is the lerger group to which any individual belongs. সমাজবিজ্ঞানী Page এর মতে, A society is the system of social relationship in and through which we live. সমাজ প্রসঙ্গে Aristotle বলেন, Man is by nature a social animal. The man who is outside of the society either he is beast or god." সুতরাং বলা যায় একই ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে মানুষের মাঝে সম্পর্ক আদান প্রদান, অভাব অনটন, চাহিদা, চাল-চলন ও মূল্যবোধ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে যে চিন্তাধারা ও সাধারণ জীবন যাপন প্রণালী রচিত হয় তাকেই বলে সমাজ।

সমাজের প্রকারভেদ

ঃ বিগত শতাব্দীতে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ করেছেন । এগুলো হচ্ছে -

Rural and urban	Static and Dynamic
Folk and urban	Sacred and secular
Agriculture and Industrial	Traditional and rational
Primitive and civilized	Traditional and modern

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ তারা এই সিদ্ধান্তে একমত হন যে, সমাজ মূলতঃ দুই প্রকার যথা ঃ- (১) সনাতন সমাজ বা Traditional society এবং (২) আধুনিক সমাজ বা Modern society.

সনাতন সমাজ ঃ যেটা হয়ে আসছে তাই-ই Tradition. সনাতন সমাজে যুক্তির চেয়ে বিশ্বাসকেই বেশী প্রাধান্য দেয়া হয় । এখানে পরিবর্তন আসে ধীরে ধীরে । এরা Modernization কে ভয় পায় । এই সমাজের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে ধর্মের উপর বিশ্বাস । এছাড়া -যে সমাজ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ জীবনবিধান ইত্যাদি প্রায় সর্বক্ষেত্রে প্রচলিত রীতিনীতিকে আঁকড়ে ধরে চলতে চায় তাকে সনাতন সমাজ বলে ।

সনাতন সমাজের বৈশিষ্ট্য ঃ সাধারণত অতীতের সমাজগুলোকে সনাতন সমাজ বলা হলেও এ সমাজে কিছু স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় । যেমন -

(ক) পেশা ঃ সনাতন সমাজে অধিকাংশের পেশা সাধারণ এবং স্থায়ী ভূমির মালিকদের সামাজিক মর্যাদা বেশী ছিল ।

(খ) ধর্মের প্রভাব ঃ সনাতন সমাজে ধর্মের প্রভাব খুব বেশী ছিল । জনগণের জীবনযাত্রা ধর্ম, কুসংস্কার ভাগ্যের দ্বারা প্রভাবিত হত ।

(গ) সম্মানবোধ ঃ রক্তের সম্পর্ক, জৈষ্ঠ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একে অপরকে সম্মানিত করত ।

(ঘ) শিক্ষা ঃ শিক্ষার প্রতি উদাসীনতার ফলে জনসাধারণ ছিল প্রায় অসচেতন, সংস্কৃতিতে পশ্চাৎপদ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ।

(ঙ) প্রথা ঃ সনাতন সমাজ লোকাচার, প্রথা, রীতিনীতির দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হত ।

(চ) Population mobility ঃ যেখানকার অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ সে সব অঞ্চলের (গ্রামের) মানুষ ভাগ্যান্বেষণে শহরে চলে আসে বিপুল হারে ।

(ছ) সীমিত প্রযুক্তিবিদ্যা ঃ সনাতন সমাজের সাধারণ মূল বৈশিষ্ট্য হল- উহারা সীমিত প্রযুক্তিবিদ্যার ভিতরই বিকাশ লাভ করেছিল। এই সকল সমাজে কোন কোন দিক দিয়ে উচ্চমাত্রার বিশেষ নৈপূন্য পরিলক্ষিত হয় । কিন্তু সেখানে নিয়মিতভাবে নব নব আবিষ্কার ও উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়নি । তাছাড়াও সীমিত প্রযুক্তি, মুখোমুখী যুদ্ধ, জোতদার ও সামন্ত প্রভুর প্রভাব, রক্ষণশীলতা, উপজাতিভিত্তিক সংগঠন, দ্রুত ভাঙ্গন, অঞ্চলগত সমস্যা, রাজনৈতিক অসচেতনতা ইত্যাদি সনাতন সমাজের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখযোগ্য দিক ।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক সমাজ ঃ

The society in which modern science and technology have been institutionalized is a modern society । আধুনিক গণমুখী ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রভাবে শিল্পায়ন, শহরায়ণ ও শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির সাথে যে সমাজ সংহতি বজায় রেখে নিজেকে পরিবর্তন ও যুগোপযোগী করে তুলেছে তাকেই আধুনিক সমাজ বলে ।

এ সমাজ মূলতঃ একটি বহুমুখী জটিল ও যান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা । উহার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো -

(ক) অর্জিত মর্যাদার প্রাধান্য, বিশ্বজনীন মূল্যবোধ ও সুনির্দিষ্ট ভূমিকার বিকাশ ।

(খ) উচ্চ সামাজিক গতিশীলতা ।

(গ) উন্নত পেশাভিত্তিক সংঘের আধিক্য এবং বিভিন্ন সংঘ সমিতির বিকাশ ।

(ঘ) যুক্তিভিত্তিক ও আইন ভিত্তিক কর্তৃত্বের শাসন ।

(ঙ) শ্রমের বিশেষ যন্ত্রশীলতা।

তাছাড়াও শিল্পে উন্নতি, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, প্রযুক্তির উন্নয়ন, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান, ধর্ম নিরপেক্ষতা, রাজনীতিতে ব্যাপক সংখ্যক জনগণের অংশগ্রহণ ও প্রচার মাধ্যমের ব্যাপক প্রসার ইত্যাদি আধুনিক সমাজের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

দুই সমাজের মধ্যে পার্থক্য ঃ বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সনাতন ও আধুনিক সমাজকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন এবং এদের মধ্যে পার্থক্য নিম্নোক্তভাবে নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন ।

(১) Sir Henry Maine তাঁর Ancient Law তে ১৯৬১ সালে দুই ধরনের সমাজের কথা বলেছেন। যেমন ঃ

(ক) Status বা কুলভিত্তিক সমাজ - যার ভিত্তি হল সনাতন মূল্যবোধ এবং

(খ) Contract বা পেশাভিত্তিক সমাজ - যার ভিত্তি হল যুক্তি ।

Max Weber তাঁর "The Theory of Social and Economic Organization" গ্রন্থে সমাজকে দুইভাগে বিভক্ত করে বলেছেন- যুগ যুগ ধরে প্রচলিত ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল কর্তৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হয় সনাতন সমাজ । অপরদিকে আইনভিত্তিক ও যুক্তিবাদী কর্তৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হয় আধুনিক সমাজ ।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি দু'ধরণের সমাজের মধ্যে নিম্নরূপ পার্থক্য দেখিয়েছেন।

Traditional society	Modern society
(i) Affective - নিরপেক্ষতা অনুপস্থিত তীব্র অনুভূতি প্রবণতা বিদ্যমান।	(i) Nutrality - নিরপেক্ষতা বিদ্যমান।
(ii) Ascriptive status- ব্যক্তির মর্যাদা বা পরিচয় বংশানুক্রমিকভাবে আরোপিত।	(ii) Achievement status -ব্যক্তির মর্যাদা, কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে অর্জিত ।
(iii) Diffus roles- ব্যক্তি পরিব্যাপ্ত ভূমিকা পালন করে ।	iii) Specific Roles- ব্যক্তি সমাজের জন্য নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে।
(iv) Collective Orientation - সমষ্টিগত ভূমিকা বিদ্যমান । একজন ব্যক্তিই পরিবারের ভরণ-পোষণ করে ।	(iv) Self Orientation- ব্যক্তি কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুপস্থিত ।কেউ কারো উপর নির্ভরশীল নয়।
(v) Particularistic values - ব্যক্তি কেন্দ্রিক মূল্যবোধ বিদ্যমান ।	(v) Universalistic Values - এখানে বিশ্বজনীন মূল্যবোধ বিদ্যমান ।

Fx. Sutton তাঁর *Social Theory and Comparative Politics* গ্রন্থে Talcott Parsons এর অনুকরণে সমাজকে দুটো ভাগে ভাগ করে তাদের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ তুলে ধরেছেন -

Agricultural/ কৃষিভিত্তিক	Industrial/শিল্পভিত্তিক
i) আরোপিত মর্যাদার প্রাধান্য পরিব্যাপ্ত ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক মূল্যবোধের বিকাশ ।	i) অর্জিত মর্যাদার প্রাধান্য। বিশ্বজনীন মূল্যবোধ ও সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ।
ii) সমাজে সীমিত গতিশীলতা।	ii) উচ্চ পর্যায়ে সামাজিক গতিশীলতা ব্যাপক ।
iii) সহজ ও স্থিতিশীল পেশাগত বিভাজন।	iii) উন্নত পেশাভিত্তিক সংঘের আধিক্য ।
iv) সমাজে পরিব্যাপ্ত ও রক্ষণশীল স্তর বিন্যাস।	iv) পেশাগত কৃতিত্বের ভিত্তিতে সমাজে সুযোগ ভোগকারী শ্রেণীব্যবস্থা ।
v) সীমিত সংঘ ও সমিতির উপস্থিতি।	v) বিভিন্ন সংঘ সমিতির পর্যাপ্ত উপস্থিতি।

Dhaka University Institutional Repository

F.W. Riggs ১৯৬৪ সালে তাঁর Adminstration in Developing Countries গ্রন্থে ৩ ধরনের সমাজের কথা উল্লেখ করেছেন ।

(i) Fused society বা traditional society

(ii) Diffracted society বা সনাতন এবং আধুনিক সমাজের মধ্যবর্তী পর্যায় ।

(iii) Prismatic socicty বা Modern socicty.

তিনি Fused এবং Diffracted সমাজের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে মূলত কৃষিভিত্তিক ও শিল্পভিত্তিক সমাজের পার্থক্যের কথাই উল্লেখ করেছেন । এগুলো ছাড়াও সনাতন ও আধুনিক সমাজের আরও কতগুলো পার্থক্য হচ্ছে -

Traditional society		Modern society
i. Political Basis is weak		i. Political Basis is strong
ii. Traditional culture		ii. Developed culture
iii. Private ownship		iii. Public ownership
iv. Elite mass gap		iv. Elite-mass directly related
v. Low techonology		v. High technology
vi. Underdeveloped administration		vi. Developed administration

উপরোক্ত আলোচনা মোতাবেক Traditional and modern society-র মধ্যে basic feature গুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ

Traditional society		Modern society
i. Rural		i. Urban
ii. Folk		ii. Urban
iii. Agriculture		iii. Industrial
iv. Prismatic		iv. Civilized
v. Stable		v. Dynamics
vi. Organic		vi. Machanical
vii. Secred and collectively		vii. Seculary and liberation
viii. Fused		viii. Diffractcd

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার ঃ Gisfied একটি মন্তব্য করেছেন Tradition and modernity are always in conflict. তার এই বক্তব্যকে মেনে নিলেও কোন কোন সমাজ ব্যবস্থায় বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য নিয়ে সনাতন ও আধুনিক সমাজ বিদ্যমান রয়েছে । তবে সবসময়ই আধুনিকত্ব প্রাচীনত্বকে প্রভাবিত করছে ।

রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের বৈশিষ্ট্য ঃ

স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন (Samuel P. Huntington) রাজনৈতিক আধুনিকীকরণকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে " Political modernization involves the rationalization of authority. the diffrentiation of strucures and the expansion of political participation"Yale University Press, 1968, p.93)[৪] তাঁর মতে - রাজনৈতিক আধুনিকীকরনের বৈশিষ্ট্য হল ঃ

১) কর্তৃত্বের যুক্তিসিদ্ধতা (Rationalization of authority);
২) কাঠামোর পৃথকীকরণ (Differentiation of structures);
৩) রাজনৈতিক অংশগ্রহণ (Potitical participation);

হান্টিংটন মনে করেন যে, কর্তৃত্বের যুক্তিসিদ্ধতা, কাঠামোর পৃথকীকরণ ও ব্যাপক রাজনৈতিক অংশগ্রহণ আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সনাতনধর্মী রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে পৃথক করে। এস.এন. আইসেনস্টেট (S.N. Eisenstatt) এর মতে রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের চারটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যায় -

১) রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুনির্দিষ্ট বিধি- বিধানের উপস্থিতি এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক কাঠামোর উচ্চমাত্রায় বিভক্তিকরণ ও বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনের বিকাশ ।
২) কেন্দ্রীয় আইনগত, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্রম সম্প্রসারণ এবং সমাজের সর্বক্ষেত্রে এদের অনুপ্রবেশ ।
৩) সমাজের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর হাতে প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক ক্ষমতার অব্যাহত সমাবেশ।
৪) সনাতন এলিট শ্রেণীর বৈধতার সনাতন রীতি পদ্ধতি ক্রমশঃ দুর্বল হতে থাকা এবং সেস্থলে শাসিতদের শাসকশ্রেণীর কাছে কোন এক প্রকার আদর্শগত ও প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতার প্রতিষ্ঠা ।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিকীকরণ শব্দটি আরো স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য একে তিনটি দিক থেকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে ।

১) অর্থনৈতিক বিষয় হিসেবে যা শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত ।

২) সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন হিসেবে যা মানুষের সংস্কৃতি ও চিন্তা-চেতনার সাথে সংশ্লিষ্ট ।

৩) রাজনৈতিক পরিবর্তন হিসেবে যেমন - নতুন নতুন রাজনৈতিক কাঠামোর পৃথকীকরণ এবং রাজনীতিতে ব্যাপক অংশগ্রহণ ও জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ইত্যাদি ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে পারি ।

১. রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতার ক্রমকেন্দ্রীভূতকরণ এবং সেই সঙ্গে ক্ষমতার সনাতন উৎসগুলোর অবক্ষয় ।

২. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পৃথকীকরণ এবং বিশেষীকরণ ।

৩. রাজনীতিতে জনগণের বর্ধিত পরিমাণে অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে জনগণের অধিকতর একাত্মবোধ ।

রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ এমন পরিবর্তন ঘটায় যার ফলে ধর্মীয়, সনাতনধর্মী, পরিবার ভিত্তিক ও বর্ণগত কর্তৃত্বের পরিবর্তে একটি একক, ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়-রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ জনগণের মনোভাবের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটায়। জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলে এবং রাজনীতিতে তাদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

আধুনিকীকরণের মডেল ও পদ্ধতিঃ

আধুনিকীকরণ মূলত কোন আধুনিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত হওয়ার পদ্ধতি বিশেষ । আধুনিকীকরণ অনেক উপায়ে হতে পারে । ক্লড.ই.ওয়েলচ (Claud. E. Welch) লিখেছেন যে, "Methods differ, the time available differs; the priorities differ" (C.E.Welch Jn.(ed.) *Political Modernization* . দ্রষ্টব্যঃ)[৫]

Dhaka University Institutional Repository

যেমন ব্রিটেনে যেভাবে আধুনিকীকরণ ঘটেছে, সোভিয়েট ইউনিয়ন কিংবা জাপানে সেভাবে ঘটেনি । গ্রেট ব্রিটেনে আধুনিকীকরণ ক্রমান্বয়ে সম্পন্ন হয়েছিল । সেখানে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন একসাথে ঘটেনি । অসংখ্য প্রথা বিবর্তনের মাধ্যমে প্রবর্তিত হতে কয়েক শতাব্দী লেগেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ হয়নি, বিপ্লবের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ হয়েছে। রুশ বিপ্লবের পর কমিউনিষ্ট পার্টির কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন সোভিয়েত ইউনিয়নকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করে । আবার জাপানে কোন বিপ্লবের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ হয়নি । এক অভিজাত-তান্ত্রিক আমলাতন্ত্রের (Aristocratic Bureaucracy) হিতকর উদ্যোগের মাধ্যমেই আধুনিকীকরণ হয়েছিল ।

ডাঙ্কার্ট রস্টো (Duncurt Rostow) রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তিনটি পছন্দের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

১) প্রথমটি হল আধুনিকীকরণের গতি সংশ্লিষ্ট (Choice concerning the speed of modernization)-এর দুটি দিক হল ঃ (ক) সংস্কার (Reform) : (খ) বিপ্লব (Revolution)

২) দ্বিতীয়টি হল আধুনিকীকরণের আওতা বা পরিচিতি সংশ্লিষ্ট (Choice concerning the scope of modernization) তা হচ্ছে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংমিশ্রণের মাধ্যমে আধুনিকীকরণের পথে অগ্রসর হওয়া ।

৩) তৃতীয়টি হল তিনটি রাজনৈতিক অনুসন্ধানের সময় নির্ধারণ সংক্রান্ত (Choice concerning the timing of three political quests. এই তিনটি অনুসন্ধানের বিষয় হচ্ছে একাত্মতা (Identity) কর্তৃত্ব (Authoriy) এবং সমতা (Equality)।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে ৪টি প্রধান বিষয় উল্লেখযোগ্য । যথা ঃ (ক) বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্ব ও ভূমিকা (খ) পরিবর্তনের অসম প্রকৃতি (গ) আদর্শবাদের গুরুত্ব এবং (ঘ) সরকারী উদ্যোগ ও নেতৃত্ব । সবশেষে বলা যায় আধুনিকীকরণ একটি জটিল প্রক্রিয়া এবং প্রক্রিয়ায় বিরতি ও বিচ্ছিন্নতা ঘটতে পারে । আধুনিকীকরণ যে সব সময় শান্তিপূর্ণ উপায়ে হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই ।

আধুনিকীকরণের সমস্যা ও প্রভাব ঃ

গতানুগতিক সমাজ, রীতিনীতি, ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস আধুনিকীকরণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে । গতানুগতিক সমাজে সামাজিক আদর্শ, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে । এই গতানুগতিকতার প্রভাব ও শক্তিকে দুর্বল করাই নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর পথে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । নতুন রাষ্ট্রগুলোতে আরেকটি বিষয় দেখা যায় তা হচ্ছে জাতীয় আনুগত্য (National loyality) এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক আনুগত্যের (Communal loyality) মধ্যে দ্বন্দ্ব যা রাজনৈতিক আধুনিকীকরণের গতিকে বহুলাংশে নির্ধারণ করে । ফরাসী সমাজতত্ত্ববিদ গুষ্টাভ লি বোঁ (Gustave Le Bon) সমস্যাটি সম্পর্কে এভাবে বলেন - "গতানুগতিকতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কোন জাতির টিকে থাকার শর্ত স্বরূপ; আর তা থেকে মুক্ত হবার উপায় জানা প্রগতির শর্ত স্বরূপ" (To respect tradition is a condition of existence for a people; to know how to disengage from it is a condition for progress")

আধুনিকীকরণের সমস্যা হল - সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনীতিতে জনসাধারণের ব্যাপক অংশগ্রহণ সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব-বিরোধের ব্যাপকতা ও গভীরতা হ্রাস করার পরিবর্তে বৃদ্ধি করতে পারে । আধুনিকীকরণের ফলে জাতীয় ঐক্য বৃদ্ধি না পেয়ে বরং গোষ্ঠীগত ও বর্ণগত দ্বন্দ্ব-বিরোধ ও কৃষ্টির পার্থক্যই বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৯৬১ সালে শ্রীলংকাতে জাতীয় আনুগত্যের চেয়ে বর্ণগত আনুগত্যই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল । সেখানে রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ সিংহলী ভাষী ও তামিল ভাষীদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি করেছিল । এর ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐক্যবদ্ধ চেতনা লোপ পায় এবং দ্বন্দ্ব -বিরোধ ও হানাহানির সূত্রপাত হয় । অন্যান্য অনেক নতুন রাষ্ট্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে । এতে ঐসব রাষ্ট্রে অস্থিতিশীলতা ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয় । আধুনিকীকরণ সমাজের সনাতন মূল্যবোধ ও নতুন নতুন মূল্যবোধের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধ সৃষ্টি করে একাত্মহীনতা, শত্রুভাব ইত্যাদির উদ্ভব ঘটায় । সনাতন প্রতিষ্ঠানগুলির ভাঙনের ফলে মানুষের মনে মানসিক বিচ্ছিন্নতাবোধ ও একাত্মহীনতাবোধের সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে এরূপ পরিস্থিতিতে মানুষ নতুন একাত্মতা ও আনুগত্যবোধের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে । জার্মান চিন্তাবিদ কার্ল মার্ক্সের মতে শিল্পায়নের ফলে প্রথমে বুর্জোয়াদের মনে ও পরে সর্বহারাদের মনে শ্রেণী-চেতনার সৃষ্টি হয় । মার্কস কেবলমাত্র আধুনিকীকরণের একটি দিক শিল্পায়নের দিকে মনযোগ দান করেছিলেন । আধুনিকীকরণ ঠিক শ্রেণী-চেতনার জাগরণ ঘটায় না বরং এটি সকল ধরণের উপজাতি অঞ্চল, বংশ ও বর্ণ এবং শ্রেণী, পেশা ও সংঘের ক্ষেত্রে নতুন গোষ্ঠী চেতনা জাগ্রত করে । বস্তুত আধুনিকীকরণের অন্যতম অতি সুস্পষ্ট বিষয় হল সচেতনতা বৃদ্ধি, সংহতি, সংগঠন ও কার্য প্রবণতা ।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিকীকরণের সুফল ঃ

পশ্চিম ইউরোপের রেনেসাঁসের মাধ্যমে যে আধুনিকতার সূত্রপাত তা বর্তমান বিশ্বের আধুনিকতার ফলস্বরূপ । বর্তমান সভ্যতা আধুনিকীকরণের আর্শীবাদে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছে । আধুনিকীকরণের সুফলের একটি দিক হল কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতি আরোপের ফলে উৎপাদনের হার বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায় । বর্তমান সমাজকে আধুনিক হতে হলে বিজ্ঞানমনস্ক ধ্যান ধারনার অধিকারী হতে হয় । ফলে উক্ত সমাজ উন্নততর সমাজে পরিণত হয় । আধুনিকীকরণের ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে গতির সঞ্চার হয় এর ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ আর্থিক স্বাচ্ছন্দবোধ করে । আর শিল্প বিপ্লবের ফলে নিত্য নতুন কলকারখানা ও ব্যবসা বাণিজ্যের সৃষ্টি হয় ফলে অনেক নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার ফলে বেকারত্ব দূর হয় । আধুনিকতার বাহক হচ্ছে শিক্ষা । যে সমাজ শিক্ষা সংস্কৃতিতে যতবেশী অগ্রগামী সেই সমাজ ততবেশী আধুনিক । ফলে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায় ।

আধুনিকীকরণের কুফল ঃ

আধুনিকীকরণ সমাজ জীবনে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটালেও এর থেকে অনেক সামাজিক সমস্যাও সৃষ্টি হয় । অনগ্রসর সমাজ সাধারণত আধুনিক সভ্যতা সংস্কৃতি ও জীবনধারার বাহ্যিক আড়ম্বর ও চাকচিক্যে অভিভূত ও আবেগতাড়িত হয়ে পড়ে । অগ্রসর সমাজেব অন্ধ অনুকরণে সে প্রবৃত্ত হয় । শিল্পায়ন ও কর্মচঞ্চলতা দেখা দেয় । শিল্পায়ন ও কর্মচঞ্চলতা দেখা দেয়ায় তরান্বিত ও প্রবৃত্তমূলক এক পরিবর্তন প্রক্রিয়া দেখা যায় । পরিবর্তনমুখী অনেক সমাজেই আধুনিকীকরণেব উপযোগী প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হয়না । দ্রুত কাম্য পরিবর্তন ঘটানোর প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা কার্যকর করার উপায় বা মাধ্যম থাকেনা । ফলে ভারসাম্যহীন এক ক্ষতিকর অবস্থা দেখা যায় ।

বিভিন্ন দিকে আধুনিকীকরণের উদ্যোগ ও আয়োজন থাকে অথচ আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের উপযোগী প্রস্তুতি থাকেনা । এর ফলে সমাজে দেখা দেয় অসংগতি ও বিশৃংখলা । সমাজে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ, মানসিকতা, ধ্যানধারণা হঠাৎ করে বদলানো যায়না। অর্থাৎ জীবনধারা অপরিবর্তিত থাকে। ফলে দেখা দেয় সামাজিক সংহতির সংকট ও সামাজিক কাঠামোর দুর্বলতা ।

রাজনৈতিক আধুনিকতার অর্থ হল রাজনীতিতে জনগণের অংশ গ্রহণ । গণতান্ত্রিক আদর্শ ও রীতিনীতির বিকাশ, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি ইত্যাদি । কিন্তু বাস্তবে বৃহত্তর জাতীয় ও

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক স্বার্থের পরিবর্তে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের প্রাধান্য ও স্বৈরাচারী প্রবণতা দেখা যায় । দলগুলি যেকোন উপায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করে । যার ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিংসাত্মকভাবের সৃষ্টি করে । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি ভোটে জয়লাভের জন্য জাতপাত, ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতা প্রাদেশিকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ এমনকি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। আধুনিকীকরণের প্রভাব প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জাতভিত্তিক সংগঠনগুলির রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদা বেড়েছে ।

আধুনিক সমাজে যেমন - একশ্রেণীর পুঁজিপতির উদ্ভব হয় তেমনি সমাজে বিরাট গরীব শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে । এতে রাষ্ট্রে মূলত দুইটি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে যা রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বিভক্তি ও বিশৃংখলার সৃষ্টি করে ।

আধুনিকীকরণের অংশ হিসেবে সংবাদপত্র, রেডিও, টি.ভি. ইত্যাদির মাধ্যমে শহরবাসীদের জীবনরীতি, শহুরে সভ্যতা ও সামগ্রীর ব্যাপক প্রচার ঘটায় গ্রামবাসীদের মধ্যে অবাঞ্ছিত আকর্ষণের ও বিভিন্ন ইচ্ছার সৃষ্টি করে । কিন্তু তা পূরণের জন্য আর্থিক সামর্থ বা সম্পত্তি অধিকাংশরই থাকেনা । ফলে দেখা দেয় অস্থিরতা, অসন্তোষ ও অশান্তি। আধুনিকীকরণের অংশ হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার ঘটায় মানুষের জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ দেখা দেয় । কিন্তু কিছু অসাধু লোক নিজ স্বার্থে দেশের ও জাতির ক্ষতি করে । তারা নোট জাল করে, শিশুখাদ্য ও জীবন রক্ষাকারী ঔষধে ভেজাল মেশায় । নিত্য ব্যবহার্য পণ্য সামগ্রীর উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রেও তারা জনবিরোধী কাজ করে থাকে ।

' আধুনিকীকরণ সভ্যতা' বিভিন্ন বিকৃত মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য অনেকাংশে দায়ী । এর ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় দুর্নীতিগ্রস্ত ও মুনাফালোভী একটি শ্রেণীর । এমনকি সরকারী প্রসাশনের উচ্চস্তরের লোকদের মধ্যেও এরূপ দেখা যায় । যেমন ভারতের বফোর্স, ফেয়ার ফ্যাক্স কেলেঙ্কারী, চিনি, সার ইত্যাদি কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারীর কথা বলা যায় । আধুনিক সমাজে এই পশ্চিমী সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত শ্রেণীর দাপট প্রবল। মুক্তবাজার অর্থনীতির ফলে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের প্রাধান্য দেখা যায় । সৃষ্টি হয় শিল্পপতির এক ধনিক শ্রেণীর। এদের লক্ষ্য মুনাফা অর্জন । ফলে আর্থিক বৈষম্য ও শ্রেণী দ্বন্দ্ব বাড়ে ।

শিল্পায়ন ও নগরায়ণ হল আধুনিকীকরণের অন্যতম অংশ । গ্রামের মানুষ নানা কারনে এসে শহরে ভিড় করে । কিন্তু নগর জীবনে তারা উপেক্ষিত হয় । ফলে মানসিক অবসাদের শিকার হয় । এতে মাদক দ্রব্যেব নেশা বৃদ্ধি পায় ও নানা দুস্কর্ম ঘটতে থাকে । যানবাহন ও শিল্পায়নের ফলে পরিবেশ দূষণ দেখা

Dhaka University Institutional Repository

যায় । অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়, শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় । তাছাড়া যৌথ পরিবার ভেঙে পড়ে । পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দূরত্ব বাড়ে । বিবাহ বিচ্ছেদ বাড়ে এবং নিউক্লিয়ার পরিবার দেখা দেয় ।

আধুনিকায়নের সর্বশেষ উদাহরণ হচ্ছে ' ডিশ সংস্কৃতি' । এটি আমাদের যুব সমাজের বখে যাওয়ার অর্থাৎ নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ । অতএব, বলা যায়, আধুনিকীকরণের ফলাফল ইতিবাচকও নয় আবার নেতিবাচকও নয় বরং উভয়ের সম্মিলিত পরিণতি ।

রূপান্তরশীল সমাজ (Transitional society) : সনাতন ও আধুনিক সমাজের মাঝামাঝি সমাজ হচ্ছে রূপান্তরশীল সমাজ । যাকে পুরোপুরি সনাতনও বলা যায়না আবার আধুনিকও বলা যায়না । অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে উন্নততর ছিল এমন সমাজের সংস্পর্শে আসার ফলেই সনাতন সমাজগুলো ভেঙে যায় এবং তাদের সংহতাবস্থা, অখণ্ডতা ও মর্যাদা ধ্বংস হয় । উপনিবেশবাদের নীতিই সনাতন সমাজগুলোকে রূপান্তরশীল করে তুলেছিল। কিন্তু এ সমাজ কোনক্রমেই আধুনিক সমাজের পূর্ণ মর্যাদা অর্জন করতে পারেনি। উন্নততর সমাজগুলোর সংস্পর্শে আসার ফলে আধুনিকীকরণ কি ভূমিকা পালন করতে পারে সে ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠে। সচেতনতার ফলে দ্রুত ও অধিকতর উন্নতির জন্য চাপের সৃষ্টি হয়। ফলে সনাতন সমাজে ভাঙন ধরে এবং রূপান্তরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। সনাতন সমাজের কিছু ব্যক্তি আধুনিক সমাজের সংস্পর্শে আসার ফলে নতুন নতুন দক্ষতায় প্রশিক্ষণ লাভ করে । আধুনিক শিক্ষা সনাতন সমাজগুলোর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করার শক্তি হিসেবে কাজ করে। রূপান্তশীল সমাজগুলোর অনেক বুদ্ধিজীবী ছাত্রজীবনে মার্কিনবাদী ও অন্যান্য সমাজবাদী ধারণা লাভ করেন পাশ্চাত্য দেশগুলোতে । রূপান্তরশীল সমাজগুলোতে তাদের ধারণা বিরাট আবেদন সৃষ্টি করেছিল। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে যারা শিক্ষা লাভ করেছিলেন তারাই সাধারণত উপনিবেশিক দেশগুলোতে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্বদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। আইন ও ডাক্তারী পেশায় প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন । তাছাড়া সেনাবাহিনী, প্রশাসন এবং শিল্প সংগঠন ও শ্রমিক ইউনিয়নে কাজ করার মাধ্যমে তাদের চিন্তাধারা বাস্তবে প্রয়োগ করেছিলেন। সেনাবাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে তৃতীয় বিশ্বের কোন কোন দেশে আধুনিকীকরণের বাহণ হিসেবে কাজ করলেও এখন তাদের ভূমিকা ক্ষীণ এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে গৌণ । উন্নততর সমাজের সংস্পর্শে আসার ফলেই সনাতন সমাজের কাঠামো ও মূল্যবোধ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । ভৌগোলিক অনুপ্রবেশ, অর্থনৈতিক দৃষ্টান্ত এবং দক্ষতা ও ভাবধারার গতি এসবের মাধ্যমে উন্নততর সমাজ সনাতন সমাজকে যেভাবে প্রভাবিত করে, তাই সনাতন সমাজগুলোতে রূপান্তর প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটায় । রূপান্তর প্রক্রিয়ার প্রথমদিকে আধুনিকীকরণের দিকে অগ্রগতি সাধারণত মন্থর হয়ে থাকে। শাসক এলিটের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যস্থিত গোষ্ঠীগুলো বিশৃংখল ও অস্থিতিশীল উপায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয় এবং ক্ষমতা এক গোষ্ঠী থেকে অপর গোষ্ঠীর হাতে প্রায়ই বদল হতে থাকে । কিন্তু এসময়ে কতগুলো গতিশীল শক্তি সমাজে ক্রিয়াশীল থেকে সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোকে নতুন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ।

বাংলাদেশে রূপান্তর প্রক্রিয়া ঃ

'A new state in an old society'[৬] বলে বাংলাদেশ সমাজবিজ্ঞানে স্বীকৃত । বাংলাদেশের অতীত সমাজকে গতানুগতিক সমাজ বলে ধরে নেয়া যায় কারণ গতানুগতিক সমাজের সকল বৈশিষ্ট্য যেমন - (১) ভূমি নির্ভরতা, (২) সীমিত প্রযুক্তির বিকাশ (৩) পশ্চাৎপদ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারণা (৪) জনসংখ্যার চাপ (৫) বিভক্ত সমাজ[৭] ইত্যাদি অতীতে বিদ্যমান ছিল। সমাজ গতিশীল। তাই স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের সনাতন ও গতানুগতিক সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে । বিশেষকরে ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর থেকেই এ অঞ্চলের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন পরিবর্তিত হতে থাকে । ফলে স্থিতিশীল সমাজ ব্যবস্থা রূপান্তরশীল হয়ে উঠে । এক পর্যায়ে জনগণ জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমানাধিকার, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, উদারনৈতিকতাবাদ, মার্কসবাদ ও অন্যান্য সমাজবাদী ধারণার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠায় স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জিবীত হয়ে উঠে ।

সাধারণত পরিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রকৃতিই এমন যে প্রায় ক্ষেত্রেই আধুনিকীকরণের উপাদানগুলোর পক্ষে পুরাতন ধ্যান-ধারণার সক্রিয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে।এভাবে বলা যায় অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা(Internal dynamics) বরং বহিস্থ গতিশীলতা (External dynamics)এর অব্যাহত দ্বন্দ্ব সংঘাত একটি স্বাভাবিক ধারা । বাংলাদেশের সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে বিরাজমান।[৮] সনাতন সমাজে মানুষের ঐতিহ্যগত মর্যাদার ধারণা এতই সুদৃঢ় যে, মানসিক ও সামাজিক দিক থেকে তার যে মূল্যবোধগত ও ব্যবহারিক অবস্থান সেখান থেকে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। রূপান্তরশীল সমাজের মানুষ পরিবর্তন আশা করলেও পুরাতন সন্দেহ ও ভয়ভীতি দেখা দেওয়ায় মানসিক দিক থেকে দ্বন্দ্ব সংঘাতে আক্রান্ত হয় এবং সীমিত পরিবর্তনকেই সহজে গ্রহণ করতে পারে । পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একগুয়েমির পরিচয় দেয়ার সম্ভাবনা থাকে । সামাজিক পরিবর্তনের নিয়ামক হচ্ছে ঃ (১) সামাজিক কাঠামো (Social structure) (২) শ্রেণী কাঠামো (Class structure) (৩) শিক্ষা কাঠামো (Education structure) (৪) গ্রাম ও শহরের পার্থক্য (৫) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি।[৯] বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এগুলোর উপর ভিত্তি করে সামাজিক পরিবর্তন পরিমাপ করা যায় এবং এর মাধ্যমে সনাতন ও আধুনিকীকরণের বিরোধটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। এ পরিবর্তনকে তিনটি পর্যায়ে দেখা যেতে পারে ।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল (১৯০৫-১৯৪৭) ঃ-

এই সময়কালে সমাজ, শ্রেণী, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা এবং ভাবাদর্শগত ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল । ক্ষুদিরাম, বিণয়, বাদল, দিনেশের মত বিদ্রোহিরা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন, রক্ত ঝরিয়েছেন। এসময়েই বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায় সামাজিক কাঠামোতে অগ্রগতি অর্জন করেছিলেন । ইংরেজি শিক্ষাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন । কৃষি নির্ভরতা কাটিয়ে বাণিজ্যে উদ্যোগী ও উৎসাহিত হওয়ায় শহরমুখী প্রবণতা বৃদ্ধি পায় । এ পর্যায়েই একটি আত্মসচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছিল । এসব উন্নয়ন বা উত্তরণ ছিল নৈতিকতা নির্ভর, রক্ষণশীল ও ধর্মাশ্রয়ী । ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব বৈপরীত্য বয়ে যায় । আর এর মধ্যেই পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় ।

পাকিস্তান আমল ঃ

এ পর্যায়ে নব্য শিক্ষিতরা স্ববিরোধিতায় ভোগেন এবং অন্য শ্রেণী অর্থাৎ ধর্মাশ্রয়ী মোল্লা শ্রেণী দ্বীনবিভোর ও দুনিয়া সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন । এর ফলে জাতিগঠন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় । তবে ধর্মীয় আবেগ পর্যায়ক্রমে হ্রাস পেতে থাকে । এ সময়ে পূর্বে পেটি বুর্জোয়া ও পশ্চিমে বুর্জোয়া শ্রেণীর উৎপত্তি ঘটে । ধনী -গরীব ব্যবধান বৃদ্ধি পায় । পাকিস্তানী শাসক এলিটরা মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তনে ব্যর্থ হয় । নগরায়ণ সীমিত হওয়া ছাড়াও সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বন্ধ্যাত্বও সূচিত হয় এ পর্যায়ে ।

জাতীয় রাষ্ট্রীয় যুগ ঃ

লাখ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অনেক আশা আকাংখা নিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল । কিন্তু বিপ্লব পরবর্তী সময়ে শাসকদের ব্যর্থতা ও সামাজিক অস্থিরতার সুযোগে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে । তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশের এ ধরণের সামাজিক অবস্থাকে হান্টিংটন (Huntingtion) প্র্যাটোরিয়ানইজম (Pratorianism) বা রাজনৈতিক অস্থিরতার পর্যায় বলে অভিহিত করেছেন । এ সময়ে - The whelthy bride, students riot, workers strike, mobs demonstrate, and the military coup[১০] বাংলাদেশের বৈশিষ্টে পরিণত হয়। হান্টিংটনের Political order in changing societies গ্রন্থের এই কথাটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সত্যি প্রমাণিত হয় । এখানে উল্লেখ করতে হয় ১৯৯০ সালের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলস্বরূপ সামরিক বাহিনী ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান কাল ঃ

বর্তমানে রাজনৈতিক ও শাসক এলিটরা দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত থাকায় সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিচ্ছে । সাংবিধানিক পন্থার উপর আস্থা না থাকায় রাজপথ ক্ষমতা দখলের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হচ্ছে। সামাজিক সম্প্রীতি ও সমঝোতার অভাব সমাজকে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতিতে নিয়ে যাচ্ছে। ছাত্ররাজনীতি ও সন্ত্রাস শিক্ষাঙ্গণকে অস্থিতিশীল করে তুলছে। ফলে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যয়ের সম্মুখীন, তাছাড়া শিক্ষা কাঠামো দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ শুরু হয়েছে । এ অবস্থা সম্পর্কে রেহমান সোবহানের মন্তব্য তুলে ধরা হল ঃ 'এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে আমরা একটি দ্বৈত সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করছি এবং সে সমাজের প্রতিষ্ঠানিক রূপ দিচ্ছি যেখানে কিছু লোকের জন্য সামাজিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা সংখ্যাগরিষ্ঠের চেয়ে বেড়ে যাচ্ছে এবং বংশানুক্রমিকভাবে এর প্রভাব থেকে গিয়ে এই দ্বৈততা চিরস্থায়ী রূপ লাভের দিকে অগ্রসর হচ্ছে ।'

গ্রাম ও শহরের পার্থক্য দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় বেকার, নিস্ব, গরীব মানুষের ঢল শহরকে বস্তির নগরীতে পরিণত করছে । শিল্পাঙ্গণেও লুটপাট আর অরাজকতার কারনে অস্থিরতা বিরাজ করছে । ট্রেডইউনিয়ন সুশাসনের বিপরীতে কাজ করছে, এই অজুহাতে সিভিল সোসাইটি ট্রেডইউনিয়ন নিষিদ্ধের দাবি তুলছে । অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বৈদেশিক বিনিয়োগে স্থবিরতা বিরাজ করছে । ভাবাদর্শের সংঘাতের ফলে পার্লামেন্ট, রাজপথ, বিশ্ববিদ্যালয় সর্বক্ষেত্রেই জাতির মৌলিক সংকটের চেয়ে অতীত ইতিহাস দ্বন্দ্ব-সংঘাত হিংসা বিদ্বেষ প্রাধান্য পাচ্ছে । গুড-গভর্নেন্স বা সুশাসনের অভাবে দেশের উন্নয়ন এবং সামাজিক পরিবর্তন ঠিকমত হচ্ছে না। সুনির্দিষ্ট পথে এগুচ্ছে না। সুশাসনের ভিত্তি হচ্ছে আইনের শাসন, জনক্ষমতায়ন, দক্ষতা, স্বচ্ছতা, বিকেন্দ্রীকরণ এবং রাজনৈতিক অংশ গ্রহন । কিন্তু এসব বিষয়ে আমাদের বর্তমান অবস্থা অন্ধকারময় ।

গবেষক রঙ্গলাল সেন বাংলাদেশের সমাজের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন ঃ (ক) কোন্দলের আধিক্য (খ) সরকার বা বিরোধী দলের বিপ্লবাত্মক ভূমিকা (গ) রাজনৈতিক কার্যকলাপে নতুন ব্যক্তির সংখ্যাধিক্য (ঘ) প্রজন্মগত বিভেদ (ঙ) অভ্যন্তরীণ বিষয়ের চেয়ে বৈদেশিক বিষয়ে অধিকতর স্বচ্ছ অবস্থান এবং (চ) দ্বন্দ্ব সংঘাতের রাজনীতি।[১১]

সাম্প্রতিকালে রাজনৈতিক গবেষক ইফতেখার উজ জামান বাংলাদেশের সমাজের নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন ঃ (ক) গণদারিদ্র্য (খ) মানব সম্পদের অনুন্নয়ন (গ) অসাম্য (ঘ) কোন্দল (ঙ) বৈদেশিক

Dhaka University Institutional Repository

নির্ভরশীলতা (চ) সুশাসনের অভাব (ছ) জাতিগঠন সমস্যা (জ) রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক সংকট (ঝ) জবাবদিহিতার অভাব (ঞ) সংকীর্ণ রাজনীতি ।[১২]

অধ্যাপক রেহমান সোবহান জাতীয় নৈতিকতার সংকটকে বর্তমানে দেশের প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত বলে মনে করেন । বর্তমানে বাংলাদেশে সর্বত্র পলিটিসাইজেশন বা রাজনীতিকরণ সামাজিক অস্থিরতার অন্যতম একটি কারণ । ব্যারিষ্টার ইসতিয়াক আহমেদ রাজনীতির ক্রিমিনালাইজেশন এবং গ্রুপ পলিটিসাইজেশনকে বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য অনেকাংশেই দায়ী মনে করেন । (এমাজউদ্দীন আহমেদ, 'একুশ শতকের রাজনীতি', *দিনকাল*, ১ জানুয়ারি, ২০০০) ।

উপরের সামগ্রিক আলোচনা শেষে বলা যায় বাংলাদেশ বর্তমানে রূপান্তরশীল পর্যায়ে রয়েছে । এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যেই অস্থিরতা ও অরাজকতা দেখা দেয় ।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ঃ

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা উন্নয়নশীল দেশগুলোর এক সাধারণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে । আধুনিকীকরণের পথে ধাবমান এসব দেশ তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল রাখার শত চেষ্টা করেও তা করতে পারছেনা। আধুনিকীকরণ ও অস্থিতিশীলতার মধ্যে এক জটিল সম্পর্ক বিদ্যমান । বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায় যে, সামাজিক গতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রার সঙ্গে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার এক প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বিদ্যমান ।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও বিশৃংখলার জন্ম দেয় এবং কোন দেশের সামাজিক ও আর্থিক পশ্চাদপদতাকে এ অবস্থার জন্য দায়ী মনে করা হয় । আর এই পশ্চাদপদতা দূরীকরণ ও স্থিতিশীলতা আনার জন্য আধুনিকীকরণকে একান্তভাবে কাম্য মনে করা হয় । স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন (Samual P. Huntington) যথার্থই বলেছেন, Clearly countries which have high levels of both social mobilization and economic development are more stable and peaceful politicaly. Modernty goes with stability.[১৩] (1968, p. 40)

বিশ্বব্যাংকের এককালীন প্রধান রবার্ট ম্যাকানামারা (Robert Mcnamara) বলেছেন যে, হিংসাত্মক কার্যকলাপ ও অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিরাজমান । অন্যভাবে বলতে গেলে সর্বগ্রাসী দারিদ্র যেকোন ধরনের সরকার ব্যবস্থাকে কুলষিত করে । এটা অস্থিতিশীলতার এক

Dhaka University Institutional Repository

নিরবচ্ছিন্ন কারণ যা গণতন্ত্রের বাস্তবায়নকে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব করে তুলে । হান্টিংটন (Huntingtion) আধুনিকীকরণ ও স্থিতিশীলতার এই সরলীকৃত সম্পর্ককে স্বীকার না করে বলেন "আসলে আধুনিকতা স্থিতিশীলতা জন্ম দেয়, কিন্তু আধুনিকীকরণ অস্থিতিশীলতার জন্ম দেয় " (In fact, modernity breeds stability, but modernization breeds instability"[১৪] এর অর্থ হচ্ছে আধুনিকতার অনুপস্থিতি নয় বরং আধুনিকতা অর্জনের প্রচেষ্টাই বিশৃংখলার সৃষ্টির জন্য দায়ী। দরিদ্র দেশগুলোর অস্থিতিশীল হওয়ার কারণ হচ্ছে তাদের ধনী হওয়ার উগ্র বাসনা, সনাতন সমাজ অজ্ঞ দরিদ্র এবং স্থিতিশীল। ষাটের দশক থেকে প্রায় সবগুলো পশ্চাদপদ রাষ্ট্রই আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হতে শুরু করে। বস্তুত আধুনিকীকরণই হচ্ছে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার চারণভূমি। উইলিয়াম কর্ণহুজার এর মতে নব্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের শহর এলাকায় অসংখ্য লোকের দ্রুত অনুপ্রবেশ গণআন্দোলনের সূচনা করে। যেখানেই শিল্পায়ন দ্রুত ঘটে এবং শিল্পায়নের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিস্থিতির মধ্যে প্রকট বিচ্ছিন্নতার সূত্রপাত ঘটে সেখানেই অধিকতর উগ্রপন্থী শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সূত্রপাত হতে দেখা যায়। আর এ থেকেই অস্থিতিশীলতা জন্ম লাভ করে ।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণসমূহ ঃ

(১) দারিদ্র (Poverty) (২) সরকারের প্রতি বিতৃষ্ণা (Antipathy to government) (৩) স্বৈরতান্ত্রিক ঐতিহ্য (Autocratic tradition) (৪) বিরোধী মনোভাব (Attitudc of oppositionism) (৫) গণতন্ত্র সম্পর্কে সীমিত অভিজ্ঞতা (Limited experience with democracy) (৬) হিংসাত্মক কার্যকলাপের অভ্যাস (Habits of violance) (৭) সিভিল সার্ভেন্টগণের স্বল্পতা (Shortage of civil servents) (৮) ক্ষুদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণী (Small middle class) (৯) নেতৃত্ব (Leadership) (১০) দল (Party) (১১) সমাজে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব (Social heterogencity) (১২) সহনশীলতার অভাব (Lack of tolerance) (১৩) রাজনৈতিক মূল্যবোধের অভাব (Lack of political values) (১৪) সাংবিধানিক ঐক্যমতের অভাব (Lack of constitutional consensus) (১৫) সরকার নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম (Government -controlled public media) (১৬) সামরিক হস্তক্ষেপ (Military intervention) (১৭) আন্তর্জাতিক উত্তেজনা (International tension) (১৮) বৈদেশিক সাহায্যের অভাব (Lack of foreign aid)

সাম্প্রতিককালে আধুনিকীকরণের পথে অগ্রসরমান দেশগুলোর রাজনীতিতে দুটো সহগামী ফলাফল হচ্ছে গণতন্ত্রের অবলুপ্তি এবং সামরিক বাহিনীর অভ্যুদয় । অধ্যাপক লুসিয়ান পাই বলেন, " In

Dhaka University Institutional Repository

short, progress toward a more realistic and responsible form of world politics involving the new states is going to be slow and uncertain. Yet the direction of development is unmistakable for in all forms of politics stability and justice can be realized only when power and responsibility are recognized and are congruent."

অর্থাৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে, অপেক্ষাকৃত বাস্তবভিত্তিক ও দায়িত্বশীল নতুন রাষ্ট্রসমূহের সাথে সম্পৃক্ত বিশ্ব রাজনীতির উন্নয়ন ধীরগতি সম্পন্ন এবং অনিশ্চিত । তথাপি উন্নয়নের নির্দেশনা অবশ্যম্ভাবী কেননা সব ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই স্থিতিশীলতা এবং ন্যায় বিচার বাস্তবে লাভ করা সম্ভব কেবল তখনই যখন ক্ষমতা ও দায়িত্ব স্বীকৃত এবং পরস্পর একত্রিত হয় ।[১৫]

অস্থিতিশীলতার উদাহরণ ঃ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো অর্থাৎ ডান-বাম, পক্ষ-বিপক্ষ ক্ষমতাশীল অথবা ক্ষমতাহীন দল মিছিল মিটিং -এ যে ধরনের শ্লোগান দেয় যেমন 'এ্যাকশন এ্যাকশন ডাইরেক্ট এ্যাকশন' অথবা 'জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো' ইত্যাদির মধ্য দিয়েই সামাজিক রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রমাণ মেলে । এমনকি রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ গ্রুপিং এবং কোন্দলেও এক গ্রুপ আর এক গ্রুপের বিরুদ্ধে এ জাতীয় শ্লোগান দিয়ে থাকে । তাছাড়া ব্যক্তি এবং ব্যক্তিগত কারণে রাজনৈতিক কর্মীরা, শিল্প অঞ্চলের শ্রমিকেরা, কল-কারখানার মজুরেরা, সরকারী কর্মচারীরা স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রায়ই এ ধরনের শ্লোগান দিয়ে থাকে। শুধু শ্লোগানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছেনা । বাস্তবে এসব বিবদমান গোষ্ঠীগুলো সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে । ব্যবহৃত হচ্ছে আধুনিক মারণাস্ত্র এবং বন্দুকযুদ্ধে অনেকে প্রাণও দিচ্ছে । রাজনৈতিক অঙ্গণে যেমন লাঠালাঠি, মারামারি, সংঘর্ষ, ভাংচুড়, জ্বালাও-পোড়াও, যোনাযাজি, গুলি, হত্যা, লুটতরাজ ইত্যাদি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার তেমনি দেয়াল লিখনের মাধ্যমেও এসব অরাজকতা ও দ্বন্দ্ব বিদ্বেষ এর বহিঃপ্রকাশ ঘটছে । বর্তমানে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে এক গ্রুপ আরেক গ্রুপকে সহ্য করতে বা মেনে নিতে পারছেনা । উৎখাত বা নির্মুলের জন্য বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান উচ্চারিত হচ্ছে । আর এসব অসহিষ্ণুতা মূলক ও অরাজকতাপূর্ণ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি অনুধাবন করা যায় ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ঃ

১. Marion J.Levy, Jr. *Modernization and the Structure of Societies* : a setting for international affairs, Princeton University Press, 1969, pp. 35-36.

২. C.E. Black, *The dynamics of Modernization*, New York, Harper and Row, 1966, p. 7

৩. D.A. Rostow, *A World of Nations Problems of Political Modernization*-----

৪. S.P. Huntingtion, *Political Order in Changiong Societies*, Yale University Press, New Haven, London, 1968, p. 93

৫. C.E. Welch Jr. (ed.), *Political Modernization : a Reader in Comperative Political Change*, State University of New York Press, 1976

৬. Baxter, C., 1984, *Bangladesh: A New Nation in an old setting*, West View, London.

৭. Finkle, J.L., and Gable R.W. 1974, *Political Development and Social Change*, John Willey & Sons, p. 265

৮. For Explanation see, Roy, Santimoy. 1986, " An Over view of the dynamics of Bangladesh Politics", in Bahadur Kalim (ed.), *South Asia in Transition : Conflicts and Tensions*, Patriot, New Delhi.

৯ Points oure Gathered from Huntingtion, S.P., 1968, *Political Order in changing Societies*, Yale University Press, New Haven & London.

১০. Huntingtion, op. cit. p. 196

১১. Sen, Rangalal, 1968, *Political Elites in Bangladesh*, UPL, Dhaka, See Preface.

১২. Iftekharuzzaman, 1999, *Bangladesh in Tomarrow's World: Challanges and outlook*, Unpublished BIISS Seminar paper.

১৩. S.P. Huntingtion, *Political Order in Changing Societies*, 1968, p. 40

১৪. Huntingtion ,op. cit., p. 47..

১৫. Pye, L.W. Aspects of Political Development, Boston, Little Brown and Co., 1966, p.198.

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ৩

আধুনিকীকরণ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও পাকিস্তান ভাঙ্গন

পাকিস্তান ভাঙ্গন সম্বন্ধে জানার আগে ইতিহাসের দিকে একটু নজর দেয়া দরকার।

ভারত বিভক্তি ঃ প্রায় দেড়শ বছরের বৃটিশ শাসনামলে গোটা ভারত উপমহাদেশের ভাগ্য ছিল একসূত্রে গাঁথা। ১৯৪৭ সালে বৃটিশ ঔপনিবেসিক শাসনের অবসানের ফলে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয় । দেশের দুই প্রধান ধর্মাবলম্বী মুসলমান ও হিন্দুদের ভুল বোঝাবুঝি এবং বিরোধিতাই ছিল বৃটিশ ভারতের বিভক্তির মূল কারণ । বৃটিশ ভারতের শেষ পর্যায়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধিতা ও বিদ্বেষ ছিল চরম পর্যায়ে । সে সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অগণিত মানুষ মৃত্যুবরণ করে ও বিত্তহীন হয় । মুসলমান সম্প্রদায়ের তুলনামূলক পশ্চাদপদ অবস্থানও বৃটিশ ভারত বিভক্তির অন্যতম কারন ।

বৃটিশ শাসনের প্রথমদিকে মুসলমানদের অবস্থান ঃ বৃটিশ রাজত্ব কায়েম হওয়ার পর মুসলমানগণ সহজে ভুলতে পারতেন না যে, এই কিছুদিন আগেও তারা রাজত্ব করতেন, তাই অল্পতেই বৈষন্য অনুভব করতেন, ভাগ্যের এই পরিবর্তনকে সহজভাবে মেনে নিতে না পারায় বৃটিশদের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ ছিল। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথা চালু হওয়ার ফলে অনেক হিন্দু এই সুযোগে জমিদার হয়ে যান। তাছাড়া সুর্যাস্ত আইনের জন্য অনেক মুসলিম জমিদার তাদের চতুর নায়েবদের কাছে জমিদারি হারান । বেশ কিছুদিন মুসলমানরা প্রশাসনে উচ্চপদে আসীন ছিলেন, তখন দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনে তাঁরাই পারদর্শী ছিলেন। ১৮৩৭ সালে আদালতের ভাষা ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি হয়। ফলে তাদের সেই অবস্থান আর থাকেনি । ক্ষুব্ধ মুসলিম সমাজ ইংরেজি শিক্ষা থেকে দূরে থাকলেন এবং ধর্ম শিক্ষায় ব্রতী হওয়ায় কুসংস্কার ও পশ্চাৎমুখিনতা তাদের পেয়ে বসে । ১৮৭১ সালে প্রকাশিত 'ইন্ডিয়ান মুসলমান্স' গ্রন্থে ডাব্লিউ ডাব্লিউ হান্টার মুসলমানদের তুলনামূলক পশ্চাৎপদতার বিষয়টি তুলে ধরেন । তিনি বলেন, "একশ পঁচাত্তর বছর আগে একজন অভিজাত মুসলমানের পক্ষে গরীব হওয়া অসম্ভব ছিল, বর্তমানে তার পক্ষে ধনী থাকাটাই অসম্ভব । বিগত পঁচাত্তর বছরে আমাদের শাসনের ছত্রছায়ায় যে নতুন সামাজিক প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে, তাদের চাপে মুসলমান অভিজাত পরিবার হয় বিলীন হয়ে গেছে অথবা নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে "।[১]

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ঃ ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহ, গোটা ভারতের মুসলমান নেতাদের ঢাকায় আমন্ত্রণ জানালে, ১৯০৬ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগে সকল মুসলিম নেতা সমবেত হন । নবাব সলিমুল্লাহ্‌র প্রস্তাবে তখন নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা হলো । এটিই ছিল মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন আর তার উদ্দেশ্য ছিল ত্রিবিধ । যেমন ঃ (১) বৃটিশ শাসনের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য সৃষ্টি । (২) মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার, সুযোগের প্রসার ও সংরক্ষণ এবং (৩) অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিরোধিতার নিরসন ও নিবৃত্তি।[২]

বাংলায় মুসলিম সমাজে আধুনিকতা ঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে শুরু হয় একটি আন্দোলন যাকে অনুগত মুসলমানদের উদ্যোগ বলা যায় । ১৮৬৩ সালে নবাব আব্দুল লতিফ প্রতিষ্ঠা করলেন মোহামেডান লিবারটি সোসাইটি, তবে এর আবেদন ছিল অত্যন্ত সীমিত।[৩] এরপর ১৮৬৪ সালে এলো স্যার সৈয়দ আহমদের আলিগড় সাইন্টিফিক সোসাইটি।[৪] ১৮৭৮ সালে সৈয়দ আমিরআলী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন।[৫] আব্দুল লতিফ ও আমিরআলী ছিলেন মুসলিম আধুনিকতার প্রবক্তা । ১৮৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হল মোহামেডান রিফর্ম সোসাইটি। এইসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই শুরু হয় মুসলিম নবজাগরণ ও রেনেসাঁ । এসব সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের আলোকসম্পাত, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, ইংরেজি শিক্ষা, বৃটিশদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, বৈধ অভিযোগের ন্যায় বিচার দাবি এবং পশ্চিমি ভাবধারার বিশ্লেষণকে জায়েজ করার প্রচেষ্টা । এতেই সূচনা হয় মুসলিম সমাজের আধুনিকতা বা চিন্তার মুক্তি।[৬]

পাকিস্তান আন্দোলন ঃ বৃটিশ আমলের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯১৩ সাল থেকে ১৯২৪ সাল ছিল হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির গৌরবময় যুগ । ১৯১৯ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগ স্বতন্ত্র কোন সম্মেলনও আহ্বান করেনি । কিন্তু ১৯২৪ সাল থেকে পরিস্থিতি পাল্টাতে থাকে । মুসলমানদের গো-মাংস ভক্ষণ এবং মসজিদের সামনে বাদ্যযন্ত্র বাজানো নিয়ে প্রায়ই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধত।[৭] তখন হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ছিল টানটান উত্তেজনাপূর্ণ এবং ১৯২৮ সালে তা চরমে পৌঁছল । ১৯২৯ সালে ঐক্যের দূত মোহাম্মদ আলী সর্বশেষ চেষ্টা হিসেবে চৌদ্দদফা দাবি পেশ করেছিলেন। কিন্তু তা বিফল হয় এবং এরপর তিনি বিলেতে চলে যান । ১৯৩৪ সালে মুসলিম নেতাদের চাপে জিন্নাহ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মুসলিম লীগের পূণর্জাগরণের ভার নেন । ১৯৩৭ সালে ৭টি প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় কংগ্রেস সরকার। কোয়ালিশন সরকার গঠনের আহ্বান জানিয়ে মুসলিম লীগ ব্যর্থ হয়।[৮] দু'বছরের কংগ্রেসের শাসনামলে মুসলমানদের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল । অনেক জায়গায় গো-মাংস নিষিদ্ধ হয়, আজান প্রদান বিঘ্নপ্রাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

হয় । নানা জায়গায় মসজিদেও পবিত্রতা ক্ষুন্ন হয়, মুসল্লিরা নিরাপত্তাহীণতায় ভোগে । শিক্ষা ক্ষেত্রে দ্বীন দর্শনের শিক্ষার পরিবর্তে হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মাচার হয় বাধ্যতামূলক শিক্ষার বিষয় । এ দু'বছর কংগ্রেস সংখ্যালঘিষ্ঠদের কোনো দাবি দাওয়া শুনেনি এবং তাদের সন্তুষ্ট রাখার কোন প্রচেষ্টাই নেয়নি । এতেই নিহিত হয়েছিল ভারত বিভাগের বীজ ।

কবি ইকবাল ১৯৩০ সালে,[৯] বিলেতে অধ্যয়নরত গোঁড়া মুসলিম স্বাতন্ত্রবাদী চৌধুরী রহমত আলী ১৯৩৩ সালে পৃথক মুসলিম (পাকিস্তান) রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেন ।[১০] প্রথমে তাদের প্রস্তাবকে কল্পনাবিলাস মনে করা হয়েছিল । কিন্তু কংগ্রেস শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে তা বাস্তবরূপ ধারন করতে লাগল । ১৯৪০ সাল পর্যন্ত এ ধরনের আরো প্রস্তাব উত্থাপিত হতে থাকে । ১৯৪০ সাল থেকেই স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য চিন্তাভাবনা শুরু হয় । বাঙালী নেতা শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ২৩ মার্চ বিখ্যাত পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করেন এবং পরদিন এ প্রস্তাব কাউন্সিল গ্রহণ করে ।[১১] ১৯৪০ সালের এ প্রস্তাবে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের ধারণা দেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তী বছরে লাহোর প্রস্তাবের ভাষা বদলানো হয় এবং এক পাকিস্তানের ধারণা ক্রমে গৃহীত হয় । সরকারীভাবে ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লীতে মুসলিম সংসদের সম্মেলনে তা মেনে নেয়া হয় ।[১২]

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি মাসে দেশব্যাপী নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্তান দাবীর জনপ্রিয়তা যাচাই করা হয় । নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করে , মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় পরিষদের সব মুসলিম আসনে নির্বাচিত হয় এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক পরিষদের মোট ৪৯৫ টি আসনের মধ্যে ৪৪৬ টি দখল করে।[১৩] বাংলায় মুসলিম লীগ ১১৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১১৩টি পেয়ে সহজেই সরকার গঠন করে এবং সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস সরকার ও পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট আকালি কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয় ।[১৪]

১৬ই আগষ্ট মুসলিম লীগ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালনের ঘোষণা দেয় । এর পেছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, মুসলমানদের জন্য অধিকার আদায়, বৃটিশ দাসত্বের অবসান এবং পরিকল্পিত হিন্দু রাজত্বের মূলোৎপাটন ।[১৫] ১৬ই আগস্টে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ড দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে । কলকাতায় মুসলমানরা হিন্দুদের হাতে মার খায় ।[১৬] দাঙ্গার সময় দেখা যায় যে, মুসলমানদের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছিল এবং হিন্দু দাঙ্গাকারীরা সুযোগ গ্রহণ করছিল । সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নৃশংসতা ও বিস্তার বৃটিশ সরকারকে আতঙ্কিত করে তোলে, ফলে প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি আশু ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিলেন । লর্ড ওয়াভেল পদত্যাগ করলেন এবং লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন নতুন বড়লাট হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

এলেন।[১৭] ১৯৪৭ সালের ৩ জুন লর্ডমাউন্ট ব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন।[১৮] অতঃপর ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হয় ।

মুসলমান সমাজে আধুনিকতার সূচনা হয় বাংলা ও মধ্যভারতে (যুক্ত প্রদেশে)। পাকিস্তান আন্দোলন মূলত এই অঞ্চলের অধিবাসিরাই পরিচালনা করেছিলেন । পাকিস্তান আন্দোলনে যারা জড়িত ছিলেন তাদের প্রায় সকলেই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত এবং আধুনিক চিন্তা-চেতনার অধিকারী ছিলেন । এই চেতনাই তাদেরকে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে সোচ্চার হতে সাহায্য করে । উল্লেখ্য যে, তাদের অনেকেই বিলেতে পড়াশুনা করেছিলেন।

আমরা দেখতে পাই মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা থেকে পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করা পর্যন্ত বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল । বাঙালি মুসলমান পাকিস্তান চেয়েছিলেন এবং তার জন্য অসীম ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন । পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পরেও তাদের মধ্যে এই ত্যাগ স্বীকার অব্যাহত ছিল ।

পূর্ববাংলার জনগণ যে আশা নিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে ত্যাগ স্বীকার করেছিল, পাকিস্তান সৃষ্টির পর তাদের সে আশা ভঙ্গ হয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের একরোখা, স্বার্থপর, বৈষম্যমূলক নীতির কারণে । ফলে পূর্ববাংলার জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ সঞ্চারিত হয় । তাই পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ নিজেদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আবার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে । এ আন্দোলনে দেশের সচেতন শিক্ষিত শ্রেণীই অগ্রগামী ভূমিকা পালন করে । আমরা দেখতে পাই তুলনামূলকভাবে শিক্ষিত তরুণ ছাত্রশ্রেণীই আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করে । সে সময় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্ররাই বেশী হারে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নিতেন। এ পর্যায়ের ৮৫ জনের মধ্যে ৭২ জনই (৮৫.৭১%) ছিলেন রাজনীতিতে সক্রিয়। এমনকি সকল পর্যায়ের প্রায় অর্ধেক ছাত্র সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন।[১৯] পাকিস্তান সৃষ্টির পরই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি নানা ধরনের শোষণ ও বৈষম্যমূলক আচরণ ধরা পড়ে যা দ্বন্দ্ব ও ক্ষোভের সৃষ্টি করে । এই ক্ষোভ ও দ্বন্দ্বই আধুনিকীকরণের প্রভাবের ফল এবং আন্দোলনের মাধ্যমে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। যা অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি করে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে । আর এরই ফলশ্রুতি হচ্ছে পাকিস্তান ভাঙ্গন। ক্ষোভ সৃষ্টির জন্য দায়ী সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের স্বরূপ নিম্নোক্ত আলোচনায় তুলে ধরা হল । পাকিস্তান ভঙ্গের জন্য সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যকেই সরাসরি দায়ী করা হয় ।

<u>সামাজিক বৈষম্য</u> ঃ পাকিস্তানের উর্দু পত্রিকা সবসময় বাঙালিদের বিরুদ্ধে ছিল এবং পশ্চিম পাকিস্তানে অধিকাংশ সময় তারা নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরেছে । কেন্দ্রে যারা শাসন করেছে তারাও পূর্ব পাকিস্তানকে

Dhaka University Institutional Repository

নিজেদের অংশ বলে মনে করেনি । প্রথম থেকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তা করেছে সরকারী প্রচারণা এবং সংবাদপত্র ।

মেজর জেনারেল তোজাম্মেল হোসেন মানিক (অবঃ) তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন পশ্চিম পাকিস্তানীরা বিশেষ করে সেনাবাহিনী বাঙালীদের 'নিগার' হিসেবে মনে করত । একজন উচ্চপদস্থ বাঙালী আমলাকে পাঞ্জাবের গভর্নর গুরমনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আচ্ছা' পূর্ব পাকিস্তানে যে রাজনীতিবিদ ও আমলা শাসন করছেন তারা সমাজের কোন স্তর থেকে এসেছেন ? ভদ্রলোক উত্তর দিয়েছিলেন সাধারণ স্তর থেকে । গুরমানি তখন বলেছিলেন "ইফ ইউ হ্যাভ টু লিভ উইল পিপল অফ ডার্স্ট ফ্রম ইস্ট পাকিস্তান, তাহলেতো চলবেনা" ।[২০]

বেনজীর ভুট্টো বলেছিলেন, "আসলেই বাঙালিদের সমভাবে দেখা হতনা"[২১] করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষক খালিদ মাহমুদ জানিয়েছেন, "বাঙালিদের নীচু চোখে দেখা হতো, তাদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করা হতো।" ১৯৬৩-৬৪ সালের সময় তিনি ঢাকায় ছিলেন ।[২২]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আহমেদ হাসান দানি অভিযোগের সুরে বলেছিলেন "পশ্চিম পাকিস্তানীরা সবসময় বাঙালীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে । আমি তার সাক্ষী, যেহেতু আমি পূর্ব পাকিস্তানে ছিলাম, আমার প্রতি খারাপ ব্যবহার করেছে । বাঙালীরা স্বাধীনতা চাইবে এতে অবাক হওয়ার কি আছে"?[২৩] দেশবিভাগ কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ রাজনৈতিক ভাবেতো বটেই চাকুরীর ক্ষেত্রেও উর্দুভাষী তথা পাকিস্তানীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় । তারা যেন বাঙালীদের চাইতে উন্নতর জাতের লোক এরূপ মনোভাব পাকিস্তানীদের আচরণে প্রকাশ পায় । স্বভাবতই চাকুরী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বাঙালী সুবিচার পাবেনা, এই আশঙ্কা বাঙালী সমাজে ঘনীভূত হতে থাকে ।

এম এইচ আসকারী এক প্রবন্ধে লিখেছেন "১৯৪৭ সাল থেকে পাকিস্তানের প্রভাবশালী গোষ্ঠীরা এমন নীতি কার্যকর করেছে যা দুই অংশের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পার্থক্য না ঘুচিয়ে বরং দূরত্ব সৃষ্টি করেছে । প্রতিটি সরকারের রুলিং এলিটরা এ ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। পাকিস্তান মানবাধিকার কমিশনের প্রধান, সাংবাদিক আই-এ রেহমানও বলেছেন - "এই পার্থক্য ক্রমেই বাড়ছিল এবং শাসকরা ধর্মের ধুয়া তুলে এ পার্থক্য ঢাকতে চেয়েছিলেন" ।[২৪]

পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ফারুক আহমেদ লেঘারি বললেন, আমি তখন নিম্নপদের কর্মকর্তা ছিলাম কিন্তু পাঞ্জাবি ও পশ্চিম পাকিস্তানী সিনিয়র ব্যুরোক্রাটদের দেখেছি বাঙালীদের হেয় চোখে দেখতেন। এমনভাব করতেন যেন, পূর্ব পাকিস্তানকে দয়া করে তারা কিছু দিচ্ছেন এবং বাঙালীদের

Dhaka University Institutional Repository

অসন্তোষের মূল কারণ ছিল এটি। রেহমান সোবহান ও অন্য অনেকের ফিলিং ছিল ইষ্ট পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ডিসক্রিমেন্ট করা হচ্ছে।[২৫]

পঞ্চাশের দশকে জেনারেল তোজাম্মেলকে সদরি ইস্পাহানি বলেছিলেন, "পাকিস্তানী শাসকদের ব্যবহারের প্যাটার্ণ না বদলালে পাকিস্তান এক থাকবেনা"।[২৬] ডঃ মুবাশ্বির হাসান বলেছেন, "বাংলাদেশের জন্ম ছিল অবশ্যম্ভাবী"।[২৭] অধ্যাপক দানি বলেছেন, 'তিনি উপাচার্যকে জানিয়েছিলেন এখানকার অবস্থা দুঃসহ করে তোলা হচ্ছে । আমি দেখতে পাচ্ছি পাকিস্তান ভেঙে যাবে' ।[২৮]

মুনতাসীর মামুনের কথায় "পাকিস্তানীরা জানত বাংলাদেশ হবে এবং তার কারণ তারা নিজেরাই, যে কদিন থাকে তার থেকে লুটপাট করে নাও এবং ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সে কাজটিই তারা করে গেছে"।[২৯] সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করত পাকিস্তান সরকার যেমন- ১৯৬১ সালের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকীর সময় সরকার এ অনুষ্ঠান বন্ধ করার জন্য সব ধরনের চেষ্টা চালায় । জনগণও এর তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে । প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন । প্রেসিডেন্ট আয়ুব এর উদ্দেশ্য ছিল এক ভাষা, এক জাতি, এক ধর্ম, এক সংস্কৃতি এবং এক আদর্শ তথা পাকিস্তানের আদর্শভিত্তিক সাহিত্য রচনা করা, ফলে বাঙালীর সংস্কৃতিতে বিশ্বাসীরা শংকিত হয়ে উঠে এবং তারা প্রতিবাদি হয়ে উঠে ।[৩০]

আবুল মাল আব্দুল মুহিতের মতে "বাঙালী সংস্কৃতিকে আরো নানাভাবে বিপর্যস্ত করার প্রয়াস নেয়া হয় । ১৯৫৫ সালে পূর্ববাংলার নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম করা হল 'পূর্ব পাকিস্তান', যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের এলাকাগুলোকে তাদের পূর্বতন নামেই বহাল রাখা হয় । অনেক বাঙালী কবি সাহিত্যিকের রচনাকর্ম নিষিদ্ধ করা হয় । তাঁদের একমাত্র অপরাধ ছিল তাঁরা খাস বাঙালী হলেও মুসলমান ছিলেননা । এরকম কোন ব্যবস্থা কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নেয়া হয়নি । রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের সার্বজনীন আবেদন সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানে তা আদৃত হতোনা । বাঙালী পোশাক পরিচ্ছদ এবং সৌন্দর্য্য চর্চার রীতিনীতি পাকিস্তান সহ্য করতে পারত না । এই ধরনের সুক্ষ্ম আঘাত ছিল অত্যন্ত বিরক্তিকর"।[৩১]

রাজনৈতিক বৈষম্য ঃ পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ছিল একনায়ক সুলভ নেতৃত্ব। প্রথম ক'বছর শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মত বাঙালী নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের রাজনীতিতে অবদান রাখবার কোন সুযোগ পাননি । পাকিস্তানের রাজনীতি থেকে এসব মহান নেতা বিতাড়িত হন । মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র পর লিয়াকত আলী খানও তাঁর নীতি অনুসরণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সোহরাওয়ার্দী অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অথচ পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী হতে পারলেননা শুধুমাত্র পাকিস্তান মুসলিম লীগের উর্ধ্বতন মহলের ষড়যন্ত্রে । কিন্তু এই ক্ষোভ ও হতাশা তাঁকে উপমহাদেশের বিশাল রাজনৈতিক অঙ্গনে ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দেয় । এ সময় ভারতে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয় তা প্রশমনে তিনি মহাত্মাগান্ধীর সাথে যোগদেন । মহাত্মাগান্ধীর তিরোধানের পর পাকিস্তান বসবাস শুরু করেন । কিন্তু পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের নিষেধাজ্ঞার ফলে ঢাকা ছাড়তে হয় । তারপর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর উদ্যোগে তাঁকে জাতীয় রাজনীতি থেকেও সাময়িকভাবে অবসর নিতে হয় । এমনকি তার গণপরিষদ সদস্যপদও কেড়ে নেয়া হয় । শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ১৯৪১ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র সাথে একমত হতে না পেরে মুসলীম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। দেশভাগের সময় মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃহত্তর স্বার্থে তিনি পাকিস্তানের পক্ষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন । বিশেষ করে কলকাতাকে পূর্ব পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার দাবী তোলেন । পাকিস্তান মুসলিম লীগে তার কোন স্থান ছিলনা । দেশভাগের পর কিছুদিন কলকাতায় অবস্থান করে ঢাকায় চলে আসেন । এখানে অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর কোন রাজনৈতিক ভূমিকা ছিলনা এবং তিনি নিজস্ব দল গঠনেরও উদ্যোগ নেননি । পাকিস্তানে নেতৃত্ব দেবার মত যে দুজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী রাজনীতিবিদ ছিলেন, তাঁদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবেই কোন রকম ভূমিকা নিতে দেয়া হয়নি ।

বাঙালী রাজনীতিবিদরা পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই নানা ধরনের ত্যাগ স্বীকারের পরিচয় দেন । পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ পূর্ববাংলার হওয়া সত্ত্বেও রাজধানী স্থাপিত হলো পশ্চিম পাকিস্তানে । এছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান দফতরগুলো স্থাপিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে যেমন সশস্ত্র তিনটি বাহিনীর প্রধান দপ্তর স্থাপিত হয় করাচী ও রাওয়ালপিণ্ডিতে । কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান দপ্তর হয় করাচীতে । বাঙালী রাজনীতিবিদরা প্রথমদিকে এসব বিষয়ে বাদ প্রতিবাদ করেননি । মন্ত্রিপরিষদেও বাঙালী প্রতিনিধিত্ব ছিল অত্যন্ত সীমিত । পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রিসভায় মোট সদস্যসংখ্যা ছিল ৭ এবং এদের মধ্যে মাত্র ২ জন ছিলেন বাঙালী । এছাড়াও ৬ জন প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নিযুক্ত হন, যার মধ্যে মাত্র ২ জন ছিলেন বাঙালি । জেনারেল উমর জানিয়েছেন "ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানে কোনো গোলন্দাজ বাহিনী ছিলনা, ... ছিলনা কোন ট্যাংক রেজিমেন্ট । তখন বলা হতো পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে ন্যাস্ত। এটি ছিল একটি বোগাস থিওরি । জেনারেল তোজাম্মেলও একই কথা বলেছেন" ।[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

আলতাফ গওহর তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেছেন "বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানী বা পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ছিলনা । তারা কেন্দ্রের কিছু নীতির বিরুদ্ধে ছিল, যা ছিল যুক্তিযুক্ত, আয়ুব খান বাঙালীদের মেরিট বোঝেননি, তখন বাঙালীদের সেনাবাহিনীতে নেয়া হতনা, আলতাফ গাওহর আরও বলেছেন, 'বাঙালি অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ কোন পোষ্টিং দেয়া হতনা" ।[৩৩] ব্রিগেডিয়ার এ আর সিদ্দীকী বলেছেন, "আর্মি সহানুভূতিশীল ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি আর ভুট্টো ছিলেন তাদের মুখপাত্র" ।[৩৪] মাসুদ মুফতি ১৯৭১ সালে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ছিলেন । তিনি বলেছিলেন, "আর্মি ফিউডাল এক্সিস যেকোন উপায়ে আধিপত্য বজায় রাখতে চেয়েছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানকে তারা হুমকি মনে করেছিল । কারণ বাঙালীরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও উচ্চকণ্ঠ" ।[৩৫] পাকিস্তানের দুই অংশের রাজনীতি ছিল বিবাদমান এবং অস্থিতিশীল । বাঙালীরা প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিদের তেমন কোন ত্যাগ স্বীকার করতে হয়নি ।

আবুল মাল আব্দুল মুহিতের ভাষায়, " কিছু দিনের মধ্যেই বোঝা গেল দুদেশের ভাষাই শুধু বিভিন্ন নয় তাদের মধ্যে রাজনৈতিক ভাবধারারও কোন মিল নেই । পাকিস্তানের আন্দোলনে হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যে অভিযোগ ছিল, পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাঙালিদেরও একই ধরনের অভিযোগ গড়ে উঠলো । তারা দেখলো, তাদের ভাষা এবং সাংস্কৃতিক সত্তা দলিত হচ্ছে । অর্থনৈতিক শোষণ অব্যাহত থাকছে এবং ক্ষমতার অঙ্গণে তাদের কোন স্থান নেই । অবিভক্ত ভারতে ধর্ম যেভাবে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিল, পাকিস্তানে তার কোন সুযোগ ছিলনা । ফলে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী সামনে উঠে আসে " ।[৩৬]

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক কিথ কালার্ড এর একটি মন্তব্য তুলে ধরা হল ঃ "সামরিক বাহিনী ছিল পুরোপুরি পশ্চিম পাকিস্তানী । জাতীয় জনপ্রশাসনেও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি আমলাদের প্রাধান্য । বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রেও বাঙালিদের কোন ভূমিকা ছিলনা । পাকিস্তানের প্রথম দশ বছরের ইতিহাস বাঙালিরা এভাবেই বিবেচনা করে । এরই ফলে জাতীয় পর্যায়ে সমতার কোন সম্ভাবনা দেখতে না পেয়ে তারা ক্রমশ অধিকতর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দিকে ঝুকে পড়ে" ।[৩৭]

<u>অর্থনৈতিক বৈষম্য</u> ঃ ১৯৫১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পাকিস্তানের মোট আয়তন ছিল ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ২১৮ বর্গমাইল । এর মধ্যে ৫৩ হাজার ৯২০ বর্গমাইল জুড়ে ছিল পূর্ব পাকিস্তান এবং বাকী ৩ লক্ষ ১০ হাজার ২৯৮ বর্গমাইল এলাকাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তানের মোট আয়তনের মাত্র ১৪.৮ ভাগ পেয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান।[৩৮] অথচ পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ ভাগই বাস করত পূর্ব পাকিস্তানে ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫১ সালের শুমারী অনুযায়ী পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৫৮ লক্ষ ৪২ হাজার, এর মধ্যে ৪ কোটি ২০ লক্ষ ৬৩ হাজার জন বাস করত পূর্ব পাকিস্তানে । ঐ বছরের শুমারী অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে সাক্ষরতার হার ছিল ১৬ ভাগ, আর পশ্চিম পাকিস্তানে সাক্ষরতার হার ছিল ১৩.২ ভাগ। পশ্চিম পাকিস্তানে মোট শ্রম শক্তির শতকরা ৬৫.৫ ভাগই কর্মরত ছিল কৃষিখাতে এবং বাকী শতকরা ৩৪.৫ ভাগ ছিল অ-কৃষিখাতে, অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানে মোট সক্রিয় শ্রম শক্তির ৮৩.৩৪ ভাগই কাজ করত কৃষিখাতে এবং ১৬.৬ ভাগ নিয়োজিত ছিল অ-কৃষিখাতে । শহরায়নের দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান ছিল পাকিস্তানের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ এলাকা, পাকিস্তানে বসবাসকারী মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ জন বাসকরত শহরে কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে শহরে বসবাসকারীর সংখ্যা ছিল মাত্র শতকরা ৪ জন । অর্থাৎ শহরে বসবাসরত মানুষের মধ্যে শতকরা ৭৮ জন মানুষ বাস করতেন পশ্চিম পাকিস্তানের শহরগুলিতে এবং মাত্র ২২ ভাগ মানুষ বাস করতেন পূর্ববাংলার শহরগুলিতে । আর্নলভ এর সার্ভের তথ্যানুযায়ী তখন ১২টি বড় শহরের মধ্যে ১০টিই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানে অসংখ্য উদ্বাস্তু আগমন করেছে। উদ্বাস্তু আগমনের হার পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল অনেক বেশী। এদের সাহায্যের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয় তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য । ১৯৫১-৫২ অর্থ বছরে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ব্যয় করা হয় মোট ৬ কোটি ৭২ লক্ষ ১৯ হাজার রূপী । তার মধ্যে মাত্র ২ লক্ষ ৫৪ হাজার রূপী ব্যয় করা হয় পূর্ব পাকিস্তানে উদ্বাস্তু কলোনী গড়ে তোলার পেছনে।[৩৯] আর বাকী সব ব্যয় করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। অর্থাৎ মোট পুনর্বাসনের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় তার মধ্যে মাত্র ০.৩৭ ভাগ ব্যয় করা হয় পূর্ব পাকিস্তানে । এখান থেকেই পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনীতির প্রাথমিক বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় ।

সেচ ব্যবস্থা ঃ ১৯৪৯-৫০ এর হিসেব অনুযায়ী পাকিস্তানে মোট কৃষিজমি ছিল ৬ কোটি ৫৪ লক্ষ ৩২ হাজার একর । এর মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ একর এবং পূর্ব পাকিস্তানে ছিল ২ কোটি ৭৬ লক্ষ ২৪ হাজার একর।[৪০] পূর্ব পাকিস্তানের মোট নীট কৃষি জমির মাত্র শতকরা ১.৫৮ ভাগ জমি সেচ-সুবিধা পেত আর পশ্চিম পাকিস্তানের মোট নীট কৃষিজমির শতকরা ৭৮.৪১ ভাগ ছিল কৃত্রিম সেচের আওতাভুক্ত ।[৪১] উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছাড়া অন্যান্য অংশের সেচ-সুবিধা প্রাপ্তি ছিল আরও বেশী এবং সিন্ধু প্রদেশে শতকরা ১০০ ভাগই ছিল সেচ সুবিধার অন্তর্গত । এথেকেই বুঝা যায় পূর্ববাংলার কৃষি ব্যবস্থা কি অবহেলিত অবস্থায় ছিল ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫০ সালের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষি জমির শতকরা ২১.০৭ ভাগ যান্ত্রিক চাষের আওতায় ছিল।[৪২] অথচ পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৩ সালের এক জরিপে দেখা যায় চাষাবাদের জন্য তখন কোন যন্ত্রকৌশল ব্যবহৃত হতনা । কৃষি ব্যবস্থায় দু'অংশের মধ্যে যে ব্যাপক বৈষম্য ছিল তা এ আলোচনা থেকেই বুঝা যায় ।

বিদ্যুৎ ঃ ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমান ছিল মাত্র ৭.২৮৬ কিলোওয়াট অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে সরবরাহের পরিমান ছিল ৬৪.০৭২ কিলোওয়াট । তখন মোট সরবরাহের শতকরা ৮৯.৭৯ ভাগ ব্যয় করা হত পশ্চিম পাকিস্তানে আর শতকরা ১০.২১ ভাগ ব্যয় করা হত পূর্ব পাকিস্তানে।[৪৩] ১৯৫৩ সালের এক হিসেবে দেখা যায় এই ক'বছরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বেড়েছিল যথাক্রমে পূর্ব পাকিস্তানে ৪.৪০৭ কিলোওয়াট এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৯৬.১৪৪ কিলোওয়াট অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল ২২ গুণ । ফলে দেখা যায়, দুই অংশের মধ্যে বৈষম্যতো কমেইনি বরং বেড়েছে । পূর্ব পাকিস্তনে শতকরা ১০.২১ ভাগ থেকে ৬.৮ ভাগে দাড়িয়েছে আর পশ্চিম পাকিস্তানে ৮৯.৭৯ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৯৩.২ ভাগে উন্নীত হয়েছে ।[৪৪]

সড়ক , যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পরিবহণ ঃ দেশবিভাগের সমসাময়িক কালের এক হিসেব অনুযায়ী মোট উন্নত সড়কের মাত্র ৯.০৬ ভাগ ছিল পূর্ব পাকিস্তানে এবং শতকরা ৯০.৯৪ ভাগ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে।[৪৫] এথেকেই অনুমান করা যায় কি পরিমাণ বৈষম্য নিয়ে পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হয়েছিল । এফ বি আর্নল্ড এর সার্ভে অনুসারে ১৯৪৭-৫২ সালে সড়ক ও জনপদ উন্নয়নে খরচের মাত্র শতকরা ২০.৮৪ ভাগ খরচ করা হয় পুর্ব পাকিস্তানে আর বাকী ৭৯.১৬ ভাগই খরচ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে।[৪৬] এ রকম বৈষম্য দেখা যায় মানুষ ও মাল পরিবহনের ক্ষেত্রে। যেমন- ১৯৪৮-৪৯ অর্থবছরে পূর্ব পাকিস্তানে রেলপথে যাত্রী ভ্রমনের সংখ্যা ছিল ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ কিন্তু ১৯৫১-৫২ অর্থবছরে তা কমে দাঁড়ায় ৫ কোটি ৮৭ লক্ষে। অথচ এ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে যাত্রী সংখ্যা ৭ কোটি ১৭ লক্ষ থেকে বেড়ে ৭ কোটি ৯২ লক্ষে গিয়ে দাঁড়ায় ।[৪৭] মালামাল পরিবহনের ক্ষেত্রেও ব্যাপক প্রতিকূল পরিবর্তন হয়েছিল। ১৯৪৮-৪৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে রেলপথে মাল পরিবহনের মোট সার্ভিসের পরিমাণ ছিল ৬৩.৭ কোটি টন মাইল, কিন্তু ১৯৫১-৫২ অর্থ বছরে তা কমে দাঁড়ায় ৫৪.৫ কোটি টন মাইলে; অথচ এ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে সার্ভিসের পরিমান ১৭০.২ কোটি টন-মাইল থেকে বেড়ে ২৫২.৩ কোটি টন মাইলে গিয়ে দাঁড়ায়।[৪৮] এ থেকে বৈষম্যের ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে বুঝা যায় ।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প ঃ শিল্প খাতেও বৈষম্য ছিল প্রকট । পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব প্যাকিস্তানে সিমেন্ট আমদানী শুরু হয় । কিন্তু এরপরও এখানে বছরে আরও ২৫,০০০ টন সিমেন্ট ঘাটতি থাকত। কিন্তু তা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে নতুন কোন সিমেন্ট কারখানা প্রতিষ্ঠা না করে পশ্চিম পাকিস্তানে ২ লক্ষ ২২ হাজার টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন আরও দুটি সিমেন্ট কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয় ।[৪৯] সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে সমুদ্রতীরবর্তী ব্যাপক এলাকায় লবণ উৎপাদনের বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এখানে লবণ উৎপাদনের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি । পূর্ব পাকিস্তানে শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তান থেকে লবণ আমদানির উপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছিল ।[৫০] ফলে অনেক সময় ৪ আনার লবণ ৮/১০ টাকা সের দরে বিক্রি হতেও দেখা গেছে।[৫১] শুধু শিল্পক্ষেত্রেই নয় সমস্ত ক্ষেত্রেই উৎকট রকমের বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল । যেমন ঃ পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪৯-৫০ অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতে যা খরচ করা হয় তা ছিল মোট খরচের মাত্র শতকরা ২৫.৬১ ভাগ। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ করা হয় মোট অর্থের ৭৪.৩৯ ভাগ । অথচ তখন পূর্ব পাকিস্তানে মোট জনসংখ্যার ৫৬% বাস করত । তার পরের বছর পূর্ব পাকিস্তানে স্বাস্থ্যখাতে যা ব্যয় করা হয় তা ছিল মোট খরচের ২০% এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় শতকরা ৮০% । ১৯৫১-৫২ অর্থ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় শতকরা ৮৫.৪৫ ভাগ আর পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় মোট খরচের মাত্র ১৪.৫৫ ভাগ, অর্থাৎ দু'বছরে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ বেড়ে যায় আঠার গুণেরও বেশী । ১৯৪৯-৫০ অর্থ বছরে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে মাথাপিছু চিকিৎসা সুবিধা হল ৩.৬ গুণ বেশী । কিন্তু মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে এ বৈষম্যের ব্যবধান দাঁড়ায় ৭.৩ গুণ ।

পাট ছিল তৎকালীন প্যাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধানতম উৎস । অথচ পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী পরিমাণ কাঁচা পাট উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও এখানে কোন পাটকল ছিলনা। আমদানী-রপ্তানীর ক্ষেত্রেও বৈষম্য ছিল । পশ্চিম পাকিস্তানে যা আমদানী করা হয় তা ছিল পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা ৫ গুণ বেশী । আর বেসরকারী খাতেও আমদানীর পরিমাণ ছিল গোটা পাকিস্তানে আমদানীর শতকরা ৭১.৪৬ ভাগ । অথচ জনসংখ্যার ৫৬% ই পূর্ব পাকিস্তানে বাস করত । তাছাড়া রাজস্ব আয়-ব্যয়, শিল্পায়ন, ব্যবসা-বাণিজ্যে, বৈদেশিক ঋণ ব্যবহারে সবকিছুতেই বৈষম্য ছিল । নিম্নে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্যের আরও কিছু খতিয়ান তুলে ধরা হল -

ভারত বিভাগের সময় পাকিস্তানের দু-অংশের শিল্পভিত্তিই ছিল উপক্ষেণীয়। তুলনামূলকভাবে পশ্চিম পাকিস্তান রাস্তাঘাট, সেচ ব্যবস্থার সুবিধা ও বিদ্যুৎ ইত্যাদি ক্ষেত্রে একটা উন্নততর অবকাঠামো লাভ করে । উভয় অংশের জি.ডি.পি. প্রায় সমানই ছিল । ১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৬৯-৭০ এর মধ্যে জি.ডি.পি.

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় সমানই ছিল । ১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৬৯-৭০ এর মধ্যে জি. ডি. পি. পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানে লক্ষণীয়ভাবে দ্রুততার সঙ্গে বর্ধিত হয় ।[৫২]

'৫০ এর দশকে পূর্ব পাকিস্তানের ১.৯% এর তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধির হারের গড় ছিল ২৭% । '৬০ এর দশকে এ ব্যবধান আরও বেড়ে পূর্ব পাকিস্তানের ৪.৩% এর তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৬.৪% এ। ১৯৫১-৫২ এবং ১৯৫৯-৬০ সালের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক আয়ের ক্ষেত্রে শিল্পের হিস্যা ৭% থেকে ১০% এ উন্নীত হয়েছিল ।[৫৩] একই সময়ে শিল্প ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পের হিস্যা দাঁড়ায় ৪১% থেকে ৭২%। আর পূর্ব পাকিস্তানের এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৫% থেকে ৪৩% । পাকিস্তানের দু' অংশে শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ এভাবেই ঘটেছিল । পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪৯-৫০ এবং ১৯৫৭-৫৮ সালের মধ্যে শিল্পোৎপাদন ৩২ কোটি থেকে ৬৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে ৮৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা থেকে ১৮০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায়।[৫৪] এ থেকেই অনুধাবন করা যায় যে, পঞ্চাশের দশকে শিল্পের বিকাশ পাকিস্তানের উভয় অংশে ঘটলেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবধান অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বেড়ে যায় ।

১৯৬৯-৭০ সাল নাগাদ পশ্চিম পাকিস্তানের জি ডি পি-তে শিল্পের হিস্যা ১৬% এ উন্নীত হয়, পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানে তা বৃদ্ধি পায় ৮.৯% । রপ্তানি খাতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ১৯৫৫-৬০ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পাকিস্তানের মোট রপ্তানি বাণিজ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮.৬%।[৫৫] ১৯৬০-৬৫ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪০.৫% । ১৯৬৫-৭০ সালের তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈদেশিক রপ্তানির পরিমাণ পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানির পরিমাণকে ছাড়িয়ে ৫০.২% এ দাঁড়ায় ।

পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি কাঠামো পাকিস্তানি শাসনামলে অত্যধিক পরিমাণে পাট নির্ভর ছিল । ১৯৫৬-৫৭ ও ১৯৫৮-৫৯ এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের মোট আন্তর্জাতিক ও আন্তঃআঞ্চলিক রপ্তানি বাণিজ্যে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের পরিমাণ ছিল ৭৬.১ শতাংশ।[৫৬] ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে মোট আঞ্চলিক রপ্তানির ক্ষেত্রে পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদির হিস্যা ছিল ৯০.৫ শতাংশ এবং আরও সাম্প্রতিককালে এটা ৯১.৪ শতাংশে পৌঁছায় । পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি কাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন আনা হলেও সেটা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানমুখি । অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে কাঁচা তুলা, সুতা সুতিবস্ত্রের ওপর তার যে নির্ভরশীলতা ছিল সেটার অবসান ঘটে।[৫৭]

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নের সারণীতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য তুলে ধরা হল ।

সারণী ৩.১ ঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য (টাকার অংকে) -

সন	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তন(২-১)	বৈষম্য	বৈষম্যের অনুপাত (২-১) (২-১) x ১০০ ২
১৯৪৯/৫০	২৮৮	৩৫১	৬৩	২১.৯
১৯৫৪/৫৫	২৯৪	৩৬৫	৭১	২৪.১
১৯৫৯/৬০	২৭৭	৩৬৭	৯০	৩২.৫
১৯৬৪/৬৫	৩০৩	৪৪০	১৩৭	৪২.২
১৯৬৯/৭০	৩৩১	৫৩৩	২০২	৬১.০

উৎসঃ পাকিস্তানের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপর অর্থনীতিবিদদের প্যানেলের রিপোর্ট (পশ্চিম পাকিস্তানি অর্থনীতিবিদদের রিপোর্ট)

সারণীতে তৎকালীন পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় বৈষম্যের মোটামুটি একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যাদিতে দেখা যায় যে ১৯৪৯-৫০ ও ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে মাথাপিছু আয়ের বৈষম্যগুলো চূড়ান্তভাবে বেড়ে যায় । ১৯৫০ এর দশকে বৈষম্যের বৃদ্ধি ঘটেছিল ৫০ শতাংশ এবং ১৯৬০ এর দশকে তা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায় । ১৯৫৯-৬০ সালে ৩২.৫ শতাংশ ছিল । ১৯৬৯-৭০ সালে তা ৬১ শতাংশে দাঁড়ায়

১৯৫৯-৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে যখন একটন চালের দাম ছিল ৫১৮ টাকা তখন পশ্চিম পাকিস্তানে ৩৩৪ টাকা দাম ছিল, ঐ সময় পূর্ব পাকিস্তানে একটন গমের দাম ছিল ৫১৭ টাকা আর পশ্চিম পাকিস্তানে দাম ছিল ২৬৭ টাকা ।

পূর্ব পাকিস্তানে বেসরকারি খাতে অবাঙালিদের প্রাধান্য ঃ

পি. আই. ডি.সি. পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫২ ও ১৯৫৪ সালের মধ্যে ২২ কোটি ৯০ লাখ টাকার স্থির পরিসম্পদসহ ১২টি জুটমিল স্থাপন করে । এতে অবাঙালীদের অর্থনৈতিক অবস্থান যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠে। অবাঙালী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর সহযোগিতার ভিত্তিতে জুটমিলগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় । এসব পাটকল স্থাপনে ই. পি. আই. ডি. সি. বৈদেশিক মুদ্রা যোগায় । পরবর্তীকালে ১৯৫৪ সালে দাউদ গোষ্ঠীর কাছে কর্ণফুলী কাগজের মিলটি ৬ কোটি ৮০ লাখ টাকা মূল্যে হস্তান্তর করা হয় । যা ছিল মিলটির প্রকৃত

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যের চাইতে অনেক কম।[৫৮] পি. আই. ডি. সি. এবং আই. ডি. বি. পি.- প্রদত্ত ঋণের এক তৃতীয়াংশ লাভ করে অবাঙালিরা । অবাঙালীরা ১৯৫৭-৬৯ সাল পর্যন্ত ১১৮ কোটি ৭০ লাখ টাকা ঋণের ৬২ শতাংশ লাভ করেছিল ।[৫৯]

স্বাধীনতার আগে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শহরাঞ্চলীয় অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে অবাঙালিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।[৬০] শিল্পক্ষেত্রে দেখা যায় ৪৭% পরিসম্পৎ নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়াও ২৮টি চা বাগানও নিয়ন্ত্রণ করত । এই বাগানগুলো থেকে মোট চা উৎপাদনের ১৯% আসত ।[৬১] তালিকাভুক্ত বাঙালি আমদানিকারকদের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনই অত্যন্ত ছোট লাইসেন্স পেত । রপ্তানী বাণিজ্যও অবাঙালীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল । পাটের রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবাঙালীদের হিস্যা ছিল ২৫% , বাঙালিদের ৩৩% আর বাকিটা বিদেশী ও সরকারী খাতের ধারকগণ নিয়ন্ত্রণ করত । পূর্ব পাকিস্তানের পাইকারী ব্যবসা এবং শহরাঞ্চলের খুচরা ব্যবসার বেশীর ভাগই অবাঙালিরাই নিয়ন্ত্রণ করত । ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে ডিপোজিটের শতকরা ৭০ ভাগই যেত অবাঙালি ব্যাংকগুলোতে। অবাঙালী বীমা কোম্পানীগুলি বীমা ব্যবসার বেশীরভাগ চালাত । অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহনের ক্ষেত্রেও অতি বৃহৎ জাহাজ মালিকদের দু'জনই ছিলেন অবাঙালি । ১৯৭১ সালের আগ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহদায়ন শিল্প খাতের ১৫ শতাংশ উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারে পরিণত হয় পূর্ব পাকিস্তান ।[৬২] বৈদেশিক সাহায্যের অর্থপ্রদান ও ব্যয়ের ক্ষেত্রেও বৈষম্য করা হয় । যা বাঙালিদের বঞ্চনাবোধকে আরও তীব্র করে তুলে ।

ব্যবসাখাতে বাঙালিদের কোনঠাসা অবস্থা ঃ জাতীয় ক্ষমতা কাঠামোর মধ্যে জাঁদরেল অবাঙালি ব্যবসায়ীদের উত্থানও বাঙালিদেরকে কথা বলার ক্ষেত্রে কোনঠাসা করে রেখেছিল । যে ৪৩টি পরিবার পাকিস্তানি অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করত তাদের মধ্যে একজন মাত্র বাঙালি ছিলেন এ কে খান্না । ১৯৫১ সালের জরিপের তথ্যানুযায়ী পাকিস্তানের সকল শিল্প পরিসম্পদের মাত্র ২.৫% ছিল বাঙালি মুসলমানদের হাতে ।

অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্বন্ধে কয়েকজনের মন্তব্য তুলে ধরা হল ঃ

প্রাক্তন ফেডারেল মন্ত্রী ড. মুবাশ্বির হাসান বলেছেন, "এক কথায় বলা যেতে পারে পাকিস্তানে ছিল একটি ইন্টার্ণাল কলোনিয়াল সিষ্টেম । পূর্ব পাকিস্তান ছিল কলোনি যার টাকাতে আমরা চলেছি" ।[৬৩]

জেনারেল তোজাম্মল লিখেছেন, "পূর্ব পাকিস্তানের গ্রাম-শহরের মানুষরা ছিল গরীব । যে কোন উন্নয়নই হোকনা কেন টাকা-সম্পদ জমা হচ্ছিল কয়েকজনের হাতে । এদের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানীরাও ছিল যাদের ব্যবসা ছিল এখানে । পূর্ব পাকিস্তানে যা হয়েছে তার জন্য হিন্দুরা দায়ী - একথা বলার অর্থ নিজেদের ফাঁকি দেয়া ।'[৬৪] আলতাফ গওহর বলেছেন, " কেন্দ্র প্রদেশগুলোর অর্থনৈতিক অধিকার কেড়ে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়েছিল এবং পূর্ব পাকিস্তানকে ক্রমান্বয়ে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল করে তোলা হচ্ছিল । পাটের আয় কেন্দ্রকে দেয়া হয়েছিল"।[৬৫] পাকিস্তানের পরিকল্পনা কমিশনের সচিব ও ডেপুটি চেয়ারম্যান কামারউল ইসলাম বললেন, "দু'প্রদেশের মধ্যে পার্থক্য ছিল । বাঙালীদের প্রতিনিধিত্ব ছিলনা কেন্দ্রে । পূর্ব পাকিস্তান কখনও তার শেয়ার পায়নি"।[৬৬] ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় ১০ লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটে। পাকিস্তান সরকার এই বিপর্যয়কে তেমন গুরুত্ব দেয়নি । তারা সংকটের ভয়াবহতা অনুধাবন না করেই প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল সাহায্য দেয় । পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাদের সীমিত সম্পদ দিয়ে তেমন কিছু করতে পারেনি । এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় । আমরা বলতে পারি বৃটিশ আমলে বাঙালী মুসলমান হিন্দুদের দ্বারা বঞ্চিত হয়েছে আর পাকিস্তান আমলে অবাঙালী মুসলমানদের দ্বারা বঞ্চিত হয়েছে ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের উপর বিরতিহীন শোষণ-শাসন করার ষড়যন্ত্র করে তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় যা পাকিস্তান ভাঙ্গনকে ত্বরান্বিত করে ।

এই বৈষম্যের ফলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই ক্ষোভ ও দ্বন্দ্ব থেকেই পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে আন্দোলনের চেতনা জাগ্রত হয় এবং সেই আন্দোলনে আধুনিক চিন্তা চেতনার অধিকারী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও ছাত্র সমাজই অগ্রণী ভূমিকা রাখেন এবং দেশের জনগণকে সচেতন করেন, উদ্বুদ্ধ করেন । যার ফলে জনগণ ও ছাত্র সমাজের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনই পাকিস্তান ভাঙ্গনে সহায়তা করে । আধুনিক চেতনায় জাগ্রত হওয়ার ফলে তখন পূর্ব পাকিস্তানে প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছিল যা পরবর্তীতে যুদ্ধে পরিণত হয়। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয় এবং পাকিস্তান ভেঙ্গে যায় । আমরা দেখতে পাই জনতার আক্রোশ, ক্ষোভ, চেতনা, সচেতনতা ও দ্বন্দ্ব থেকেই আন্দোলনের সূচনা হয় ।

আধুনিক চিন্তাশীল লেখকরা তাদের লেখনী ও যুক্তির মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করেন । যেমন আবুল মনসুর আহমদ, "বাংলা ভাষাই হবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, " উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করলে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি অশিক্ষিত ও সরকারী চাকুরীর অযোগ্য বনিয়া যাইবেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফার্সীর জায়গায় ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে রাতারাতি 'অশিক্ষিত' ও সরকারী কাজের অযোগ্য করেছিল"।[৬৭]

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক আজাদে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ডঃ শহীদুল্লাহ্ বাংলাকে পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রভাষারূপে এবং উর্দুকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। হাবিবুর রহমানের মতে, "রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে সে সময় তিনি যুক্তিসিদ্ধ বাস্তব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন একথা বলা কঠিন। তবে এ প্রশ্নে তাঁর অভিমতের গুরুত্ব এখানে যে তিনি একমাত্র উর্দু রাষ্ট্রভাষার দাবীকে সমর্থন করেননি"।[৬৮] চৌধুরী হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী তাঁর 'ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় বাঙালীর বাংলাদেশ' বইতে এভাবে লিখেছেন ঃ নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত 'কৃষ্টি' নামক মাসিক পত্রিকায় কার্তিক ১৩৫৪ সংখ্যায় 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উর্দু ও বাংলা' শীর্ষক প্রবন্ধে ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক উর্দুকে একটি অপরিচিত বিদেশীভাষা বলে বিরোধীতা করেন । "উর্দুকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকার করে লইলে বাংলা ভাষার সমাধি রচনা করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানবাসীদেরকে জাতি হিসেবে 'গোর' দেওয়ার আয়োজন করতে হবে"।[৬৯] উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সম্ভাব্য ফলাফল বিশ্লেষণ করে ড. এনামুল হক বলেন, " ইহাতে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সর্বনাশ ঘটিবে । উর্দু বাহিয়া আসিবে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মরণ, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু । এই রাষ্ট্রীয় ভাষার সূত্র ধরে শাসন ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তান হবে উত্তর ভারতীয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানী উর্দুওয়ালাদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র যেমন- ভারত ছিল ইংরেজী রাষ্ট্রভাষার সূত্রে ইংরেজদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র "।[৭০]

বিভিন্ন আন্দোলনে ছাত্র জনতার অংশগ্রহণ ঃ একমাত্র ধর্মীয় সাদৃশ্য ছাড়া ভৌগলিক, অর্থনৈতিক, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক সবদিক দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিনস্তানের জনগণ পরস্পর থেকে ভিন্ন । মওলানা আবুল কালাম আজাদ মনে করেন পাকিস্তান ভেঙ্গে যাবার পেছনে ভাষা ও সংস্কৃতি শক্তিশালী কারণ হিসেবে কাজ করেছে ।

বাঙালীদের উপর প্রথম আক্রমণ আসে ভাষার দিক থেকে । রাষ্ট্রীয় কাজে উর্দুর ব্যবহার শুরু হয় ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসের গোড়ার দিক থেকে । রেলের টিকিট, ডাকটিকিট এবং মানি-অর্ডার ফর্মে উর্দু ও ইংরেজি ব্যবহার করা হয় । বাংলাকে বাদ দেয়া হয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বিষয়গুলোর মধ্য থেকেও। ১৯৪৮ সালেই বাংলাভাষাকে নিয়ে আন্দোলন শুরু হয় । ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের প্রথম সক্রিয় ভাষা আন্দোলনের পেছনে সচেতনভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার চেতনা এবং একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠী হিসেবে স্বাতন্ত্রবোধ কাজ করছিল । প্রথমে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই এ আন্দোলন সীমিত ছিল । ভাষার উপর যখন আক্রমণ শুরু হয় তখন অগ্রসর জনগোষ্ঠী অর্থাৎ আধুনিক চেতনার অধিকারী শিক্ষিত তরুণ এবং

Dhaka University Institutional Repository

সচেতন গোষ্ঠী খুব দ্রুতই পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর উপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে । এদের প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের ফলেই সাধারণ মানুষ পূর্ববাংলার অধস্থন অবস্থান এবং পাকিস্তানী রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের বিষয়টি খুবই সুস্পষ্টভাবে ধরতে শুরু করেন ।

বৃটিশ আমলে মানুষ পাকিস্তান আন্দোলনে যোগদান করেছিল অধিপতি শ্রেণীর শোষণ বঞ্চনা থেকে এবং আর্থিক মুক্তি পাবার আকাংখা থেকেই । কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির পর তাদের সে আকাংখা পূরণ হয়নি বরং নানা ধরনের বৈষম্য বিশেষ করে দ্রুত অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে তাদের আশা ভঙ্গ হয় । এর ফলশ্রুতিতে শিক্ষিত সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী হতাশ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে । এরকম একটি অস্থির সমাজে যখন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ভাষার উপর আঘাত আসে তখন জাতীয়সত্তা খুবই দ্রুত বিকশিত হতে থাকে ও প্রতিবাদে ফেটে পড়ে । ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম সফল বহিঃপ্রকাশ । এ আন্দোলনই পাকিস্তানের ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দেয় । বাঙালী জাতীয়তাবাদ অর্থাৎ এই স্বতন্ত্র জাতীয় চেতনাই পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রতিফলিত হতে থাকে । ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের পরাজয় ও যুক্তফ্রন্টের প্রতি মানুষেব স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সবকিছুরই ভিত্তি তৈরী করেছিল ভাষা আন্দোলন । আন্দোলনের ফলে যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছিল দৃষ্টান্তস্বরূপ তা তুলে ধরা হল ।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাস্তায় যে ধর্মনিরপেক্ষ ভাষা আন্দোলন হয়েছিল সে আন্দোলনের পূর্ণ কৃতিত্ব ছিল সে আমলের ছাত্র সমাজের । ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন যে, 'উর্দু এবং উর্দুই' হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু রেসকোর্স ময়দানে এবং সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রীরা এ ঘোষণার প্রতিবাদ করেন । এদের একজন মিসেস লিলি খান বলেন, " উনি যখন আমাদের কনভোকেশনে গেলেন, তখন উনি বললেন যে, আমার একটাই উইশ আছে যে, ষ্টেট আমাদের ল্যাংগুয়েজটা উর্দুই হবে । তখন নইমুদ্দিন সাহেবই বলেছেন যে, 'No' তখন আমরা সাথে সাথে "No, No" THIS CAN NOT BE , IT CANNOT HAPPEN IN OUR LIFETIME, তখন সবাই মিলাইয়া খালি 'NO' চিৎকার যে, BENGALI WILL BE THE LANGUAGE বাংলা ভাষা আমরা চাই । তখন আমরা চিৎকার করেছি যে, বাংলাভাষা আমাদের মাতৃভাষা বাংলাভাষা আমরা চাই" ।[৭১]

অবশ্য এসব ঘটনার আগে গণপরিষদে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব পাশ হলে ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্ররা এক সর্বাত্মক আন্দোলন করেছিল এবং ১১ই মার্চ ঢাকায় হরতাল হয় ও সারা প্রদেশে

Dhaka University Institutional Repository

ভাষাদিবস পালিত হয়েছিল । এটাই ছিল ৪৮ সালের প্রথম ভাষা আন্দোলন । এরপর প্রতিবছরই ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পালিত হত।

১৯৫২ সালের ২৬ শে জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন ঢাকার পল্টন ময়দানে মুসলিম লীগের এক জনসভায় বক্তৃতাদানকালে ঘোষণা করলেন যে, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।" এর প্রতিবাদে পূর্ববাংলার শিক্ষিত মহল বিশেষ করে ছাত্রসমাজ হল সোচ্চার । এর পরের প্রতিক্রিয়াগুলো যা অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ২৯ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটি প্রতিবাদ সভার মাধ্যমে বিক্ষোভের সূচনা করেন । রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পোষ্টারিং করা হয় । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ৩০ শে জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের 'প্রতীক ধর্মঘট' আহ্বান করে । ঐদিন দুপুরে কলাভবন প্রাঙ্গনের আমতলায় একটি ছাত্রসভার ঘোষণাও প্রদান করে । এই ধর্মঘট ও ছাত্রসভার নোটিশ সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়। ৩০শে জানুয়ারির 'প্রতীক ধর্মঘট' সম্পূর্ণ সফল হয় এবং ছাত্রছাত্রীরা কর্মসূচী অনুযায়ী আমতলায় নাজিমুদ্দীনের পল্টন বক্তৃতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করেন । এতে সভাপতিত্ব করেন মুসলিম ছাত্রলীগের অন্যতম নেতা খালেক নওয়াজ খান । সভাশেষে মিছিল বের করা হয় এবং মিছিলের শেষে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ছাত্রধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয় । ৩০শে জানুয়ারির রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের বৈঠকে কিছু কর্মসূচী গৃহীত হয় ঃ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ববঙ্গে "ভাষাদিবস" হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তাছাড়াও ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল এবং জনসভার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় ।

৩১ শে জানুয়ারি ঢাকার বার লাইব্রেরীতে একটি সভা আহ্বান করা হয় । সভায় ঢাকার প্রায় সব রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন । এ সভায় সভাপতিত্ব করেন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী । মওলানা ভাসানী ছাত্র ও কর্মীদের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন চালিয়ে যাবার আহ্বান জানান । ইডেন কলেজের ছাত্রী মাহবুবা খাতুন বলেন, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য প্রয়োজন হলে মেয়েরা তাদের রক্ত বিসর্জন দিবে।

১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকা নগরীতে সফলভাবে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয় । কলাভবন চত্বরে অনুষ্ঠিত সভায় গাজীউল হক ২১ ফেব্রুয়ারির আহুত হরতালকে সফল করার আহ্বান জানান । এরপর ১০ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী শোভাযাত্রা সহকারে শহর প্রদক্ষিণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

২১ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচী সফল করার জন্য ৫-১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেয়ালে দেয়ালে পোষ্টার লাগানো, প্রচারপত্র বিলি এবং বহু সংখ্যক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভাষা আন্দোলনকারীদের সাথে একাত্মতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দীন আহমেদ ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেন। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সরকার ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে এবং একমাসের জন্য ঢাকায় সভা ও শোভাযাত্রার আয়োজন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন ।

১৪৪ ধারা জারির ফলে ছাত্র সমাজে প্রতিক্রিয়া ঃ

বিশ্ববিদ্যালয়, ম্যাডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ২০ ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘটে যোগদান এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সমবেত হবার জন্য আহ্বান জানান। মেয়েদের সংগঠিত করার কাজ সম্পর্কে ওমেন্স স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ভি. পি. শাফিয়া খাতুন বলেন, " তখন ছাত্রীদের মাঝেও এমন উৎসাহ লক্ষ্য করেছি যে, তা কোনদিন ভুলবার নয়। পায়ে হেঁটে মেয়েরা বাংলাবাজার গালর্স স্কুল ও কামরুন্নেসা গার্লস স্কুলে গিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির আমতলার সভায় যোগ দেওয়ার জন্য সংগঠিত করেছে। একুশের আন্দোলনকে সফল করার পেছনে এসব তৎপরতা অসীম অবদান রেখেছে"।[৭২] শামসুর নাহার আহসান এ সম্পর্কে বলেন, "একুশে ফেব্রুয়ারিকে সফল করে তোলার জন্য আমরা গ্রুপে ভাগ হয়ে বিভিন্ন স্থানে মেয়েদের স্কুলে গিয়ে পরদিন আমতলার মিটিং-এ উপস্থিত হওযার জন্য ছাত্রীদের সংগঠিত করি। এসব তৎপরতার প্রতি উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া যায়"।[৭৩]

১৪৪ ধারা জারির ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যাডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের ছাত্ররা সভা করে সরকারের এই ঘোষণার তীব্র সমালোচনা করতে থাকেন । ছাত্রদের মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য প্রতিনিধি স্থানীয় ছাত্রদেরকে বৈঠকরত সর্বদলীয় কমিটির কাছে পাঠানো হয় । ২০ তারিখ সন্ধ্যায় সলিমুল্লাহ ও ফজলুল হক হলের সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় । ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিরুদ্ধে সর্ব দলীয় সংগ্রাম কর্মিটর সিদ্ধান্ত ছাত্রাবাসগুলিতে পৌছলে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে প্রত্যেকটি হলে প্রচারকার্য শুরু করেন । এইজন্য বেশ কিছু পোষ্টারও লেখা হয় । ২০-২১ ফেব্রুয়ারি রাতে প্রায় সারাক্ষণই এ ধরনের তৎপরতা ছাত্রাবাসগুলিতে বজায় থাকে ।

হাবিবুর রহমান শেলী বলেন, "সেদিন রাতে অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয়া হল ১৪৪ ধারা ভাঙ্গতে হবে এবং আন্দোলন বন্ধ করা চলবে না, আমরা কেমন করে আইন অমান্য করব তার কোন স্পষ্ট ছবি তখন আমাদের মনে ছিলনা । তবন মনে এই আশা ছিল যে, একবার ১৪৪ ধারা ভাঙ্গলে বেশীর ভাগ ছাত্রই

Dhaka University Institutional Repository

স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবে আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য"।[৭৪] এম আর আকতার মুকুল বলেন, "২০ ফেব্রুয়ারি রাতে আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে, ২১ ফেব্রুয়ারি স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হরতাল করবই আর ১৪৪ ধারা ভাঙ্গবই"।[৭৫] ছাত্ররা এই ভাষা আন্দোলনকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যে, তখন আর একে ছাত্র আন্দোলন বলা চলেনা । এখানে দেখতে পাই যে, ছাত্ররাই জনগণের মধ্যে চেতনা জাগ্রত করে যা সর্বসাধারণের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং জনগণকে সক্রিয় হতে উদ্বুদ্ধ করে । তখন দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয় । অতএব, আধুনিকতার প্রভাব ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা একটির সাথে আরেকটির যোগাযোগ ও সম্পর্ক আছে তা আমরা এই আলোচনায় দেখতে পাই।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের কর্মসূচী মোতাবেক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো কলাভবনে এসে জমায়েত হলে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় । এরই মধ্যে পুলিশের টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও দফায় দফায় লাঠি চার্জ শুরু হয় । এরকম পরিস্থিতিতে গাজিউল হক সভার কাজ শুরু করেন। সভায় 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগানের মধ্য দিয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার প্রস্তাব গৃহীত হলেও এর পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলে আব্দুস সামাদ আজাদের 'দশজনী' ছাত্রের মিছিল ও গ্রেফতার বরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এরপরই শুরু হয় স্বেচ্ছায় কারাবরণ এবং পুলিশের লাঠিচার্জ ও কাদুনে গ্যাস নিক্ষেপ ।

২১ ফেব্রুয়ারি ২ টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়াল ভেঙ্গে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী এসে জড়ো হয় ম্যাডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গনে । ফলে ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে দ্বিতীয় দফা সংঘর্ষ শুরু হয় । বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা পুলিশের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে এবং পুলিশ অবিরাম টিয়ার গ্যাস ও লাঠিচার্জ চালায় । পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আরও সশস্ত্র পুলিশ আসে । কিন্তু অবিরাম সংঘর্ষ ও তৎকালীন পূর্তমন্ত্রীর জিনের চাকা নষ্ট হলে পরিস্থিতির আরও অবনতি হয় । ঐদিন বিকাল ৩ টা ১০ মিনিটের সময় একদল সশস্ত্র পুলিশ বিক্ষোভরত ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে । ফলে সাথে সাথে দুজনের মৃত্যু ঘটে।[৭৬] সচেতনতার উপলব্ধি থেকে নিজের ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ বাধে । তখন দেশে অস্থিতিশীল অরাজকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয় । ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনার পর বহু ছাত্রকর্মীকে গ্রেফতার করে কারাগারে প্রেরণ করা হয় ।

ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণের খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে । বিকাল ৪ টা থেকে ঢাকায় শুরু হয় হরতাল । ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় হরতাল হয় । ২৪ ফেব্রুয়ারি অবস্থার উন্নতি হলেও বিক্ষোভ পুরো মাস ধরে চলে । গুলিবর্ষণের পর সেনাবাহিনী মোতায়েন করা সত্ত্বেও পরবর্তী সাতদিন পর্যন্ত সরকার ছিল

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় অকেজো । ঐ দিনগুলিতে সলিমুল্লাহ হল থেকে মাইকযোগে ছাত্রদের ঘোষিত কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার আহ্বান জানানো হয় । এরপর সামরিক বাহিনী সলিমুল্লাহ হলের দরজা ভেঙ্গে হলে প্রবেশ করে ছাত্রদের গ্রেফতার করে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায় । এই ভাষা আন্দোলন বিভিন্ন জেলার থানা পর্যায়েও ছড়িয়ে পড়ে । এরপর থেকে প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি জাতীয় শহিদ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে । ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ফলে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয় । ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানে যে শাসনতন্ত্র চালু হয় তাতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেয়া হয় । এ সম্পর্কে আব্দুল মতিনের মন্তব্য হল -

"এইখানে যে জাতিসত্তা, বাঙ্গালী জাতিসত্তা, সেটাতো ছিল । কিন্তু এই ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এইটা একটা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করল এবং জাতিবোধটা সেইখানে প্রাধান্যে এসে গেল । আগে জাতিবোধটা প্রাধান্যে ছিলনা । মুসলমান ধর্মীয় বোধটা ছিল প্রধান"।[৭৭] ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পরের আন্দোলনগুলোর পথিকৃৎ হিসেবে মনে করা হয় । সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী বলেন, "ভাষা আন্দোলনের যে চরিত্র ছিল সেক্যুলার, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চরিত্র, তাই ধীরে ধীরে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী মুসলমানকে একটা জাতীয়তাভিত্তিক, সংস্কৃতিভিত্তিক, ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার দিকে এবং জাতিত্ব প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে নিয়েছে । যার পরিণতি ২১ দফার আন্দোলন, যে আন্দোলন নিয়ে ৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হয় । যে আন্দোলনের পরবর্তী ধাপ সেক্যুলার শিক্ষা আন্দোলন, তারপরে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন, তারপর ছ'দফার আন্দোলন এবং এই ছ'দফার আন্দোলনেরই শেষ পরিণতি এফদফায় আন্দোলন বা পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রাম যা '৭১ -এ এসে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়"।[৭৮]

পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্ররা ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বৈষম্যমূলক জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবীতে আন্দোলন শুরু করে । এ আন্দোলন পরবর্তী পর্যায়ে সহিংস রূপ নেয় । সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ তারিখে পূর্ব পাকিস্তানে প্রচণ্ড বিক্ষোভ হয় । পুলিশ অনেক ছাত্র নেতাকে গ্রেফতার করে এবং ছাত্রদের উপর গুলি চালায় । এ আন্দোলন সম্পর্কে তৎকালীন ছাত্রনেতা ও সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেননের মন্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

> "বাবট্টির ছাত্র আন্দোলন আমাদের দেশের নব প্রজন্মের যে নতুন ধারাবাহিকতা সেটা কালমিনেট করেছে এসে মুক্তিযুদ্ধে। তারা সৃষ্টি করে '৬২ এর আন্দোলন প্র্যাকটিক্যালি । উনিশ'শ আটান্ন পর্যন্ত যে ধারাবাহিকতা ছিল সেটা ছিল পাকিস্তানের ধারাবাহিকতা ।

Dhaka University Institutional Repository

আটান্ন পর্যন্ত রাজনীতিতে মূলতঃ পাকিস্তানের সামগ্রিক কাঠামোর মধ্যে রাজনীতি করার দিকে একটা প্রধান ধারা হিসেবে ছিল । আয়ুবের সামরিক শাসনের চার বছর বা তিন বছরের মাথায় এ দেশবাসী যখন বুঝতে পারল এবং সেটা ছাত্রদের মধ্যে দিয়েই এর বহিঃপ্রকাশ ঘটল যে প্র্যাকটিক্যালি পাকিস্তানে তাদের আর কোন ভবিষ্যৎ নেই । এটা প্রথমতঃ ছাত্রদের কাছে অনেক বেশী করে প্রতিভাত হল আয়ুবের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের মধ্য দিয়ে, সে শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে দেখা গেল যে, এই শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট যেভাবে তৈরী হয়েছে তাতে কেবলমাত্র যাদের হাতে পয়সা আছে এদের ছাড়া লেখাপড়ার জায়গা আর থাকলনা।

মূলতঃভাবে ধারণা ছিল ছাত্রদের মধ্যে এই যে, ছাত্ররা আজকে একটা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে এক -দুই হচ্ছে এ সময়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনটা খুব প্রবল ছিল । ষাটের দশকেই রবীন্দ্রনাথের গানের ওপরে আক্রমণটা আসল এবং মিলিটারী রুলটা প্রমাণ করে দিল যে, এইখানে আর বাংলাদেশের মানুষের কোন ভবিষ্যৎ নেই ।

আমি সেই প্রসংগে বলব যে, বাংলাদেশে '৬২-র ছাত্র আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, এটা আইসব্রেকিং এবং এ নিউ জেনারেশন মুভমেন্ট এবং প্র্যাকটিক্যালি '৬২-র ছাত্র আন্দোলন এখনকার রাজনীতিতে নতুন একটা ধারাবাহিকতার সৃষ্টি করল" ।[৭৯]

এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ৬২ সালেই রাজনীতিবিদ ও ছাত্রদের এক অংশ স্বাধীনতার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ।

১৯৬৩ সালেও পাকিস্তানে চলছিল একদিকে সামরিক বাহিনী বিরোধী আন্দোলন আর অন্যদিকে সরকারের নিপীড়ন। ১৯৬৪ সালের ঘটনাও স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। সে সময় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের জন্য নির্বাচনের প্রচারনায় পূর্ব পাকিস্তানে আয়ুব বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয় । তখন ছাত্রদের মধ্যে জঙ্গী গোষ্ঠীর নেতারা একটি বিপ্লবী পরিষদ ও তার একটি 'নিউক্লিয়াস' গঠন করেন । অন্যতম সদস্য আবদুর রাজ্জাক বলেন,

"শ্লোগানের মাধ্যমে, মিছিলের মাধ্যমে দেশের কিছু হবেনা । সেই সময় আমরা চিন্তা করি যে, সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি নিতে হবে এবং যারই প্রেক্ষিতে এই চিন্তা কিন্তু আমাদের ৬২ সালের, কিন্তু ৬৪ সালে এসে আমরা তার একটা রূপ দেই । স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ গঠন করি, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য, বাঙ্গালীর জাতীয় সত্তার স্বীকৃতির জন্য ।সেই স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদে সিরাজুল আলম খান এবং কাজী আরিফ ছিলেন । আমরা তিনজনই ছিলাম মূলত ঃ হাই কমান্ডে । বিশেষ করে ছাত্ররাই ছিল । ছাত্রলীগের কর্মীরাই ছিল এর মূল শক্তি । আমরা প্রতি থানায় থানায় এর সেল করেছিলাম"।[৮০]

এরপর ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় । এ সময় পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিল । এ সম্পর্কে কে. জি. মুস্তাফা বলেন ঃ

"পয়ষট্টি সালের সেপ্টেম্বর যখন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হল, সেই যুদ্ধের সময় একটা নতুন অবস্থার সৃষ্টি হল । অবস্থাটা হচ্ছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে তার প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা কোন সময়ই ছিলনা । এক ডিভিশনের একটা গ্যারিসন ছিল এবং এক স্কোয়াড্রণের মত বিমান। নৌবাহিনীর নাম করার মত কিছুই এখানে ছিলনা। এটা নিয়ে এই প্রদেশে সব সময় বলা হয়েছে যে, এখানে স্বয়ং সম্পূর্ণ একটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে না তুললে প্রয়োজনের সময় বিপদে পড়তে হবে । কারণ পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে তফাৎ বারশ মাইল এবং মাঝখানে ভারত । পাকিস্তানী সরকারের তরফ থেকে সব সময় বলা হয়েছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিরক্ষা করা হবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে । এটা যে কত বড় ধাপ্পা সেটা প্রকাশ পেল ৬৫ সালের যুদ্ধের সময়, যখন দেখা গেল যে, পাকিস্তান সরকার তার পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানকে কোনভাবেই সাহায্য করতে পারছেনা।"[৮১]

১৯৬৫ সালের যুদ্ধই পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানে আঞ্চলিক স্বায়ত্তসাশনের দাবিতে প্রাণ সঞ্চার করে। এরই প্রেক্ষিতে ছয় দফার জন্ম হল । এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায় তরুণ সম্প্রদায় । তারা হামদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধেও ছিল সোচ্চার । ১৯৬৬ সালের ৭ জুন ঢাকার ছাত্রদের উদ্যোগে ছয় দফার জন্য হলো গণবিক্ষোভ । আফসান চৌধুরীর মতে, "ছয় দফা আসার পরে এটাই প্রধান রাজনৈতিক বা জাতীয়তাবাদী ধারায় পরিণত হয় "।[৮২] ছয় দফা যতই জনপ্রিয় হতে লাগলো ততই ছাত্র , জনতা, শ্রমিক পুলিশি নিপীড়নের শিকার হতে লাগল । প্রায় ৪১ জন মৃত্যুবরণ করে এবং সারাদেশে প্রায় একহাজার ব্যক্তি গ্রেফতার হয়। ছয়দফা আন্দোলনকে সরকার বানচাল করতে চেয়েছিল । কিন্তু সরকারের নিপীড়ন বাড়ার সাথে সাথে জনগণও ক্ষুব্দ হয়ে উঠে । এ ব্যাপারে কে জি মুস্তফা বলেন, "শেখ মুজিব তার কর্মক্ষেত্র পূর্ব পাকিস্তানে জোরদার করার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন শহরে তিনি সভা-সমিতি করতে থাকেন। সব জায়গাতেই তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং মামলা দেয়া হয় । এরই জের হিসেবে আরও কতগুলো ঘটনা ঘটে ।

Dhaka University Institutional Repository

তার মধ্যে একটি হচ্ছে ১৯৬৮ সালে কিছু সামরিক বাহিনীর লোকজন এবং কিছু কেন্দ্রীয় শীর্ষস্থানীয় বাঙ্গালী সিভিল অফিসার, কিছু রাজনৈতিক কর্মী, এদেরকে গ্রেফতার করা হ'ল এবং বলা হল যে, তিনি এই আন্দোলনের নেতা । ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রস্থল আগরতলা"।[৮৩] ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল আগরতলা মামলায় বন্দীদের মুক্ত করতে এবং ছয়দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে ।

মওদুদ আহমেদের ভাষায় ঃ "১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী অবধি পাকিস্তানে এক নজিরবিহীন গণআন্দোলনের সূচনা ঘটে । পূর্ব পাকিস্তানে এই আন্দোলন বিপ্লবের পর্যায়ে পৌছে । সরকারের প্রশাসনযন্ত্র পুরোপুরি অচল হয়ে পড়ে এবং তা মূলতঃ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজসমূহের তরুণ ছাত্রদের হাতে চলে যায়। ডিসেম্বরের প্রথমদিকে প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি (স্যাক) গঠন করেন। এই কমিটির প্রধান ছিলেন ২৬ বছর বয়সের অনলবর্ষী ভাষণদানকারী তোফায়েল আহমেদ যিনি পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানে এই ঐতিহাসিক আন্দোলনের অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেন। সংগ্রাম কমিটি ক্রমান্বয়ে একটি ১১ দফা দাবীনামা ঘোষণা করে । এই দাবী শুধু ছাত্রদেরই নয়, দেশের আপামর জনগণের মধ্যে প্রেরণার সঞ্চার ঘটায় । গোটা পূর্ব পাকিস্তানে এই কর্মসূচী ব্যাপক সমর্থন অর্জন করে । পরবর্তী তিনমাসে বিভিন্ন রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হাজার হাজার জনসভা ও বৈঠকে এর উপর অনুমোদন দেয়া হয়"।[৮৪] উনসত্তরে ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদ বলেন ঃ "তখন আমরা প্রিয় নেতা শেখ মুজিবের মুক্তিসহ বাংলার গণমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি; রাজনৈতিক মুক্তি এবং স্বাধিকারের প্রশ্নে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ঐতিহাসিক ১১ দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করি । যার মধ্যে ছয়দফা সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল । এই ছয়দফার আন্দোলনই পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক ১ দফার আন্দোলন হিসেবে খ্যাতি লাভ করে এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসাবে ফাঁসির মঞ্চ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে আমরা মুক্ত করতে সমর্থ হই ।

১৯৬৯ সালের সতেরই জানুয়ারী আমাদের এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল। সেইদিন লাঠিচার্জ করা হয় । আঠার তারিখ তার প্রতিবাদে আমরা আবার মিলিত হই । সেদিনও লাঠিচার্জ করা হয় । উনিশ তারিখে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলি করা হয় । বিশ তারিখে তার প্রতিবাদে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমায়েত হই । মিছিলের মধ্যে গুলি করে আসাদুজ্জামানকে হত্যা করা হয় । একুশ তারিখে আমরা হরতাল পালন করি ।

Dhaka University Institutional Repository

তারপর ২২ তারিখে আমরা কালো পতাকা উত্তোলন, ২৩ তারিখ মশাল মিছিল, ২৪ তারিখ দুটো পর্যন্ত আমরা হরতাল দেই এবং সেই ২৪ তারিখ মতিয়ুর , রুস্তম এবং মাহবুবসহ চারজনকে হত্যা করা হয়। তার পরবর্তীকালে প্রেস ট্রাস্ট্রের পত্রিকা মর্ণিং নিউজ, দৈনিক পাকিস্তানে অগ্নিসংযোগ করে সেই বাংলার মানুষ, যখন সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করা হয়, ১৮ তারিখ যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে জোহাকে হত্যা করা হয় । আবার ১৮ তারিখ থেকে ঢাকায় সান্ধ্য আইন থাকে । উনিশ তারিখ সেই সান্ধ্য আইন, ২০ তারিখে সান্ধ্য আইনের মধ্যে আমরা লক্ষ লক্ষ লোকের মশাল মিছিল করি ।

একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন করি । বাইশে ফেব্রুয়ারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হয় এবং ২৩ তারিখে আমরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রিয়নেতা শেখ মুজিবকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা জানাই । সেই দিন বাংলার মানুষ কৃতজ্ঞচিত্তে বাংলার প্রিয়নেতা শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করে। এইভাবে ছয়দফার আন্দোলন ১১ দফার চূড়ান্ত আন্দোলনে রূপ নেয় এবং সেই ১১ দফার আন্দোলনও স্বাধিকার আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়"।[৮৫] স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল শ্লোগানও উঠে আসে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় ।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তেজনা থামাতে না পেরে ১৯৬৯ সালের পঁচিশে মার্চ জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা ছেড়ে দেন এবং সামরিক শাসন জারি করেন । জেনারেল ইয়াহিয়া খান ৩১শে মার্চ প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৭০ সালের সাতই ডিসেম্বর দেশে নির্বাচনের ঘোষণা দেন যাতে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় ।

১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছাসে পূর্ব পাকিস্তানের কোটি কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হয় এবং প্রায় ১০ লক্ষ লোক মারা যান । অথচ পাকিস্তানী শাসকেরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি । এতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে প্রচণ্ড ক্ষোভের জন্ম হয় এবং এই অবহেলার জবাব দেন নির্বাচনের রায়ের মাধ্যমে ।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে ১৬৭ টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে । কিন্তু বাঙ্গালীদের ক্ষমতা না দেয়ার চক্রান্ত করা হয় এবং ৩রা মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করা হয় । পয়লা মার্চ বেতার ভাষণের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এই ঘোষণা দেন। কিন্তু বাঙ্গালী শিক্ষিত, সচেতন তরুণ সমাজ এসব অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করেন । ঢাকার জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে লাঠি, লোহার শিকল, পোষ্টার ইত্যাদি হাতে নিয়ে এবং পাকিস্তান বিরোধী ও বাংলাদেশের পক্ষে শ্লোগান দিয়ে মিছিল করে পল্টনের দিকে আসে । ঐদিন পাকিস্তানের অসংখ্য পতাকা পোড়ানো

Dhaka University Institutional Repository

হয় । অন্যান্য জেলায়ও এই ঘটনা ঘটে । শেখ মুজিবর রহমান মার্চের ২ ও ৩ তারিখে পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল ঘোষণা করেন । ছাত্ররা শেখ মুজিবের অনুমোদনক্রমে স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে । মার্চের ২ তারিখে সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল হয় । ছাত্রনেতারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় এক জনসভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং জনসাধারণের সামনে প্রথম বাংলাদেশের পতাকা ওড়ানো হয় । পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী মার্চের ৩ তারিখে সারাদেশে হরতাল পালিত হয় । ঢাকায় বড় ধরনের মিছিল হয় । ঐদিন পল্টনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা করা হয় ছাত্রদের ডাকা এক জনসভায়। শেখ মুজিব তেসরা মার্চ সব অফিস আদালত বন্ধের নির্দেশ দেন । বাংলাদেশের প্রশাসন সেদিন তার নির্দেশে চলতে থাকে । পল্টনের জনসভায় উপস্থিত হয়ে তিনি ঘোষণা করেন যে, তাঁর যা কিছু বলার তা তিনি ৭ই মার্চ রেসকোর্সের জনসভায় বলবেন । ৭ই মার্চ রেসকোর্সের ঐতিহাসিক ভাষণে শেখ মুজিব অসহযোগ আন্দোলনের আরও বিস্তারিত কর্মসূচী ঘোষণা করেন ।

তখনকার অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে ডঃ কামাল হোসেন বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ"অসহযোগ আন্দোলন অসাধারণভাবে এগিয়ে গেল। সকলেই এসে তখন আনুগত্য স্বীকার করলেন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষে। সিভিল সার্ভিস এসোসিয়েশন প্রস্তাব নিয়ে আসল যে, আমরা এখন ইসলামাবাদ সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী চলবনা, এই নির্বাচিত প্রতিনিধি, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যারা আছেন তাদের নির্দেশে চলব ।

কলকারখানা সব বন্ধ হল। অফিস আদালত সব বন্ধ হল এবং এই নির্দেশগুলো আমাদের কন্ট্রোল রুম থেকে যেতে লাগল এবং সেই নির্দেশ অনুযায়ী তখন পাকিস্তানের পূর্ব অঞ্চল অথবা বাংলাদেশ যেটাকে নিয়ে হল সেখানে সেই নির্দেশ অনুযায়ী দেশ শাসন হতে লাগল" ।[৮৬]

৭ই মার্চের পর প্রায় প্রতিদিনই বাংলাদেশের কোন না কোন অঞ্চলে পাকিস্তানী সৈন্যদের গোলাগুলীতে জনগণ মারা যাচ্ছিলেন। টঙ্গী ও জয়দেবপুরে জনগণের সঙ্গে সৈন্যদের বড় ধরনের লুটো সংঘর্ষ হয়। ২৩শে মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস। অথচ সেইদিন সারা বাংলাদেশ জুড়ে উড়ছিল বাংলাদেশের পতাকা শুধুমাত্র ঢাকার কুর্মিটোলার সেনাছাউনি ছাড়া। অতঃপর ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানী সৈন্যরা বাংলাদেশের জনগণের উপর আক্রমণ চালায় সর্বশক্তি দিয়ে। বাঙ্গালীরাও তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছিল। শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ এরপর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয় ।

রেহমান সোবহান বলেন, " তারা আন্দোলনের গণভিত্তি বুঝতে পারেনি এবং ১৯৬৯-৭১ সালের একটানা বিক্ষোভ সমাবেশের ফলে জনগণের সচেতনতা কী পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল তাও উপলব্ধি করতে

Dhaka University Institutional Repository

পারেনি । এটাই মনে হয় তাদের ভ্রান্ত হিসাবের খতিয়ান । বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল । পাকিস্তান রাষ্ট্র যে তার রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের দাবিগুলোকে জায়গা করে দিতে পারেনি তার চূড়ান্ত স্বীকৃতি হল বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যা অভিযান"।[৮৭] আবুল মাল আব্দুল মুহিত বলেন, "পাকিস্তানের ঐক্য ও সমৃদ্ধির জন্য বাঙালিকেই শুধু ত্যাগ স্বীকার করতে হয় । পশ্চিমের মুসলমানদের পাকিস্তানের প্রতি, মুসলিম একটি আবাসভূমির প্রতি অঙ্গীকারের অভাবই তাদের পাকিস্তানের জন্য কোনরকম ত্যাগ স্বীকারে নিরস্ত্র করে । তারা শুধু সুবিধা ভোগেই ছিল ব্যস্ত । পাকিস্তানকে তাদের পক্ষে ভেঙ্গে দেয়াতে তাই আশ্চর্যের কিছু ছিলনা"।[৮৮] আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, অধিকার আদায়ের জন্য জনগণ, ছাত্ররা যখন সভা-সমিতি ও আন্দোলন করে তখন রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয় । একটি দেশের ছাত্ররা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আধুনিক চিন্তা চেতনার অধিকারী হয়। তাই তারাই নেতৃত্ব দেয়। অধিকার আদায়ের জন্য তারা যখন সচেষ্ট হয় তখন তা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার রূপ পরিগ্রহ করে ।

পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া ঃ

মওদুদ আহমেদ এর ভাষায় -

"এয়ার মার্শাল (অবঃ) আসগর খান ছয়দফা কর্মসূচীর বিরোধিতা করা সত্ত্বেও করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য পেশকালে শেখ মুজিবের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানান । তিনি বলেন, ২৩ বছরে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । কাজেই এখন যদি পূর্ব পাকিস্তানকে তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে পাকিস্তানকে শাসন করতে দেয়া হয় তাহলে পশ্চিম পাকিস্তান ক্ষতিগ্রস্থ হলেও তা স্বীকার করে নেয়া উচিত । তিনি দেশের গণতন্ত্র বিনষ্ট করায় আমলা, কায়েমী স্বার্থবাদী মহল, ব্যবসায়ী ও কতিপয় রাজনীতিবিদকে সম্মিলিতভাবে দায়ী করেন ।

গণহত্যার প্রশ্নে এয়ার মার্শাল পূর্ব পাকিস্তানে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে সশস্ত্র বিরোধিতার তীব্র বিরোধিতা করেন এবং বলেন, "আমাদের পূর্ব পাকিস্তানী ভাইরা বুলেটে নিহত হলে আমাদের হৃদয়ে রক্ত ক্ষরণ হয়।" জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতকরণ এবং পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর গণহত্যা নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানেও তুমুল সমালোচনা হয়।[৮৯]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. উইলিয়াম ডাবলিউ হান্টার ঃ *The Indian Mussalmans*, কমরেড প্রকাশনী, কলকাতা,১৯৪৫,পৃ.১৫০,১৫৭

২. পাকিস্তান ইতিহাস সমিতি ঃ *History of Frfeedom Movement, Vol. III* জামিলুদ্দিন আহমেদের প্রবন্ধ 'Foundation of All India Muslim League' ,পৃ. ৩৫-৩৮

৩. নবাব আব্দুল লতিফ ১৮২৮ সালে ফরিদপুর জেলার রাজাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । কলকাতা মাদ্রাসায় তিনি লেখাপড়া করেন এবং ১৮৪৯ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন । ১৮৮৫ সালে তিনি অবসরগ্রহণ করেন। ১৮৬২ সালে আব্দুল লতিফ বিধানসভায় প্রথম মুসলমান সদস্য হন । উল্লেখ্য ১৮৬১ সালে সর্বপ্রথম ভারতীয়দের বিধানসভায় মনোনয়ন দানের ব্যবস্থা হয় । তাঁকে ১৮৮০ সালে নবাবের খেতাব দেয়া হয় । তিনি ১৮৮৩ সালে সিআই ই হন এবং ১৮৮৭ সালে নবাব বাহাদুরের খেতাবে ভূষিত হন ।

৪. স্যার সৈয়দ আহম্মদ খান ১৮১৭ সালে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন । ১৮৩৮ সালে তিনি মুনসিফ হন এবং ১৮৫৭ সালে তিনি বৃটিশের অনুগত ছিলেন। ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন এবং লেখক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন । তিনি ১৮৬৯ সালে বিলেতে যান এবং সেখান থেকে এসে পশ্চিমি শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ নেন । তিনি ১৮৬৪ সালে আলিগড় সাইন্টিফিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন । তাহজিবাল আখলাক নামে একটি সাময়িকী ১৮৭০ সালে প্রকাশ করেন । ১৮৭৭ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত এ্যাংলো ওরিয়েন্টেল কলেজ বিশ বছর পর আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেসে তিনি মুসলমানদের যোগ না দেয়ার পরামর্শ দেন এবং ১৮৮৬ সালে বার্ষিক মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স গড়ে তুলেন । ১৮৯৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৫. সৈয়দ আমির আলীর জন্ম ১৮৪৪ সালে হুগলি জেলায় । হুগলি কলেজ থেকে ১৮৬৭ সালে বি.এ. পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম.এ.এবং আইন পাস করেন। তিনি ১৮৭৩ সালে বিলেতে ব্যারিস্টারি পাস করেন। ১৮৭৮ সালে কলকাতা মোহামেডান এসোশিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেন । ১৮৭৮ সালে তিনি বাংলার বিধান কাউন্সিলে মনোনীত হন এবং ভারতীয় কাউন্সিলে ১৮৮৩ সালে মনোনীত হন । তিনি ১৮৯০ সালে কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি নিযুক্ত হন । ১৯০৯ সালে বৃটিশ প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হন । তিনি ১৮৮৯ সালে হিস্ট্রি অব সারাসিন্স্ এবং ১৮৯১ সালে স্পিরিট অব ইসলাম রচনা করেন।

৬. উইলিয়াম কান্টওয়েল স্মিথ ঃ *Modern Islam in India*, শেখ মোহাম্মদ আশরাফ, লাহোর, ১৯৬৩, পৃ. ৩-৮, ৪৬-৪৭, ৫০-৫১

৭. পাকিস্তান ইতিহাস সমিতি ঃ *History of the Freedom Movement*, Vol. III
আই এইচ কোরেশির প্রবন্ধে 'Hindu communal Movements', পৃ ২৫৫-২৭৫। আই এইচ কোরেসি The Muslim Community of the Indo-Pak subcontinent; দ্য হ্যাগ, ১৯৬২, পৃ. ২৭৯-২৮২

৮. ইশতিয়াক হোসেন কোয়েশি ঃ *The Struggle for Pakistan*, করাচি ইউনিভার্সিটি প্রেস, করাচি, ১৯৬৫, পৃ. ৩৩

৯. সৈয়দ শরিফুদ্দিন পীরজাদা, *Evolution of Pakistan*, অল পাকিস্তান লিগ্যাল ডিসিশন্স্, লাহোর, ১৯৬৩, পৃ. ২৪

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৫

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪

১৩. চৌধুরী মুহাম্মদ আলী ঃ *The Emergence of Pakistan*, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউইয়র্ক, ১৯৬৭, পৃ. ৪৮

১৪. আই এইচ কোরেশি ঃ *The Struggle for Pakistan*, পৃ. ২৭৫

১৫. আই এইচ কোরেশির বইয়ে উদ্ধৃত, পৃ. ২৭৫

১৬. ইয়ান স্টিফেনস ঃ Pakistan ফ্রেডারিক এ প্রেগার, নিউইয়র্ক ১৯৬৩, পৃ. ১০৯

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৭-১১৯

Dhaka University Institutional Repository

১৮. সৈয়দ শরিফুদ্দিন পীরজাদা ঃ পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯-২৫৬

১৯. আতিউর রহমান ও সৈয়দ হাশেমী ঃ *ভাষা আন্দোলন ঃ অংশগ্রহণকারীদের শ্রেণী অবস্থান*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা , ১৯৯০ , পৃ. ১৬

২০. মুনতাসীর মামুন, *পরাজিত পাকিস্তানী জেনারেলদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ* , সময় প্রকাশন, বাংলাবাজার, ঢাকা, জুন ১৯৯৯, পৃ. ১০

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ.১৮

৩০. ডঃ রহমান ফজলুর ঃ *তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব (১৯৪৭-৭১)* । পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ ,কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ ১৯৮৮, পৃ. ১৫৩

৩১. আবুল মাল আব্দুল মুহিত, *বাংলাদেশঃ জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব* , সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, তৃতীয় অধ্যায়, ফেব্রুয়ারী ২০০০, পৃ. ৯৩

৩২. মুনতাসীর মামুন, পূর্বোক্ত, পৃ.১৩

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ.১৩

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ.১৪

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ.১৪

৩৬ আবুল মাল আবদুল মুহিত, পূর্বোক্ত, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ. ৯৪

৩৭. কিথ কালার্ড ঃ *Pakistan : Political Study*, জর্জ এলেন অ্যাণ্ড আনউইন, লণ্ডন, ১৯৫৭, পৃ. ১৭৩

৩৮. এফ বি আরলনড, ১৯৫৫, *Economics and Commercial Conditions in Pakistan*, p. ১৪৪

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ.১২৬

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২

৪১. পূর্বোক্ত, পৃ.১৪২

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ.১৪৬

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ.২৪২

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ.২৪২

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ.২৫৯

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ.২৬০

৪৭. আতিউর রহমান, *লেনিন আজাদঃ ভাষা আন্দোলন অর্থনৈতিক পটভূমি*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১২১

৪৮. আরণলড, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩১

৫০. আতিউর রহমান, লেনিন আজাদ, ১৯৮৭, *ভাষা আন্দোলনের অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত*, সৈনিকের পাতা থেকে, তথ্যান নং ২৩, পৃ. ১৯

৫১. এফ বি আরলনড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫

৫২. Reports of the Economists on the Fourth Five year Plan, Government of Pakistan, (Comments of W.P. member).

Dhaka University Institutional Repository

৫৩. Haq, *Strategy of Economic Planning*

৫৪. Akhlaqur Rahman, *Partition, Economic Growth and Interregional Trade*, (Karachi, 1963)

৫৫. World Bank Bangladesh Development

৫৬. World Bank Bangladesh Development

৫৭. Pakistan Statistical year Book (PSYB), 1968

৫৮. T. Hexner, *EPIDC-A Conglomerate in East pakistan*, (Harvard Institute of International Development, 1969)

৫৯. Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmed, Public Enterprise

৬০. Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmed, Public Enterprise

৬১. H. Papnek, 'Entrepreneus in East Pakistan', South Asian Series Research Paper No.-16, Published by Asian Studies Centre, Michigan Statge University 1969

৬২. Computed from Estimates of Value added in manufacture in West Pakistan Reported in Pakistan Economic Survey, 1971 and Estimates of Interwing trade, Reported in World Bank, Bangladesh Development.

৬৩. মুনতাসীর মামুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৬৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৬৭. চৌধুরী হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী, *ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় বাঙালীর বাংলাদেশ*, চৌধুরী প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২,

৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮

৭০. চৌধুরী হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

৭১. আতিকুস সামাদ, *মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, (বিবিসি থেকে প্রচারিত) জাগৃতি প্রকাশনী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫, পৃ. ১৩

৭২. দৈনিক আজাদ, ১.২.১৯৫২ এবং নওবেলাল ৭.২.১৯৫২

৭৩. ঢাকা ডাইজেস্ট, এপ্রিল ১৯৭৮, পৃ. ১৮

৭৪. হাবিবুর রহমান শেলী, একুশের সংকলন, '৮০, পৃ. ৫৭-৫৮

৭৫. এম. আর. আখতার মুকুল, *ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা*, শিখা প্রকাশনী, ডিসেম্বর ১৯৯৯ইং, পৃ. ১২৬

৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮

৭৭. আতিকুস সামাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

৭৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

৭৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫-২৬

৮০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

৮১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

৮২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

৮৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

৮৪. মওদুদ আহমেদ, *বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ইনডার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৬ইং, পৃ.১১১

৮৫. আতিকুস সামাদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪

৮৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯

৮৭. রেহমান সোবহান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় : একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য*, মাওলা ব্রাদার্স, জুন ১৯৯৮, পৃ. ৭২

৮৮. আবুল মাল আব্দুল মুহিত, *বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব দ্বিতীয় অধ্যায়*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০ইং, পৃ. ৬৪

৮৯. মওদুদ আহমেদ, *বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা* ।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ৪

পার্বত্য চট্টগ্রামে আধুনিকীকরণের প্রভাব ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

ভৌগোলিক ও জনগোষ্ঠীর বিবরণ ঃ

ভৌগোলিক পরিচয়

অবস্থান ঃ বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন) বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে ২১°২৫' থেকে ২৩°৪৫' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯১°৫৪' থেকে ৯২°৫০' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে বিস্তৃত পর্বতমালা জুড়ে অবস্থিত ।

সীমানা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, উত্তর ও উত্তর-পূর্বে ভারতের মিজোরাম রাজ্য; দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমারের (বার্মার) আরাকান প্রদেশ এবং পশ্চিমে বাংলাদেশের সমতল উপকূলীয় জেলা, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা অবস্থিত ।

আয়তন ঃ Chittagong Hill Tracts বা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার মোট আয়তন ৫,০৯৩ বর্গমাইল বা ১৩,১৮৪ বর্গকিলোমিটার । বাংলাদেশের প্রায় এক দশমাংশ।

নিম্নে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনজেলা সম্পর্কে কিছু তথ্য দেয়া হল।

(ক) খাগড়াছড়ি ঃ ১৯৮৩ সালে একে জেলায় উপনীত করা হয় । এই জেলার মোট আয়তন ২ হাজার ৬৯৯ দশমিক ৫৫ কিলোমিটার । এর মধ্যে ১ হাজার ৪৯২ দশমিক ১২ বর্গকিলোমিটার জায়গা অরণ্য পরিবেষ্টিত । ২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ৫,২৪,৯৬৯ জন। বসবাসকারী উপজাতীয় সংখ্যা ৩টি (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা)। থানার সংখ্যা ৮টি ।

(খ) রাঙ্গামাটি ঃ ১৯৮৩ সালে এই মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করা হয় । আয়তন ৬,১১,৬১৩ বর্গকিলোমিটার । এর মধ্যে ৫,৩৫৪ বর্গকিলোমিটার এলাকা নদীবিধৌত এবং ৪,৮২,৪৬৩ বর্গকিলোমিটার এলাকা অরণ্য পরিবেষ্টিত । এই জেলায় মোট ১০টি থানা। মোট জনসংখ্যা ৫,০৭,১৮০ জন । (২০০১ সালের আদমশুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী)। এখানে বসবাসকারী উপজাতীয় সংখ্যা ১১টি (চাকমা, মারমা, তংচংগ্যা, ত্রিপুরা, পাংখো, লুসাই, বোম, খিয়াং, মুরং, চাক, খুমি)।

Dhaka University Institutional Repository

(গ) বান্দরবন ঃ একে জেলায় উন্নীত করা হয় ১৯৮১ সালে । আয়তন ৪,৫০২ বর্গকিলোমিটার । এর মধ্যে ৩১৬ বর্গকিলোমিটার এলাকা নদীবিধৌত এবং বাকী এলাকা অরণ্য পরিবেষ্টিত। বান্দরবনে থানার সংখ্যা ৭টি, মোট জনসংখ্যা ২,৯২,৯০০ জন (২০০১ সনের আদমশুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী)। বসবাসকারী উপ-জাতীয় সংখ্যা ১২টি (মারমা, মুরুং, ত্রিপুরা, তংচংগ্যা, বোম, চাকমা, খুমী, খিয়াং, চাক, উসাই, লুসাই, পাংখো)।

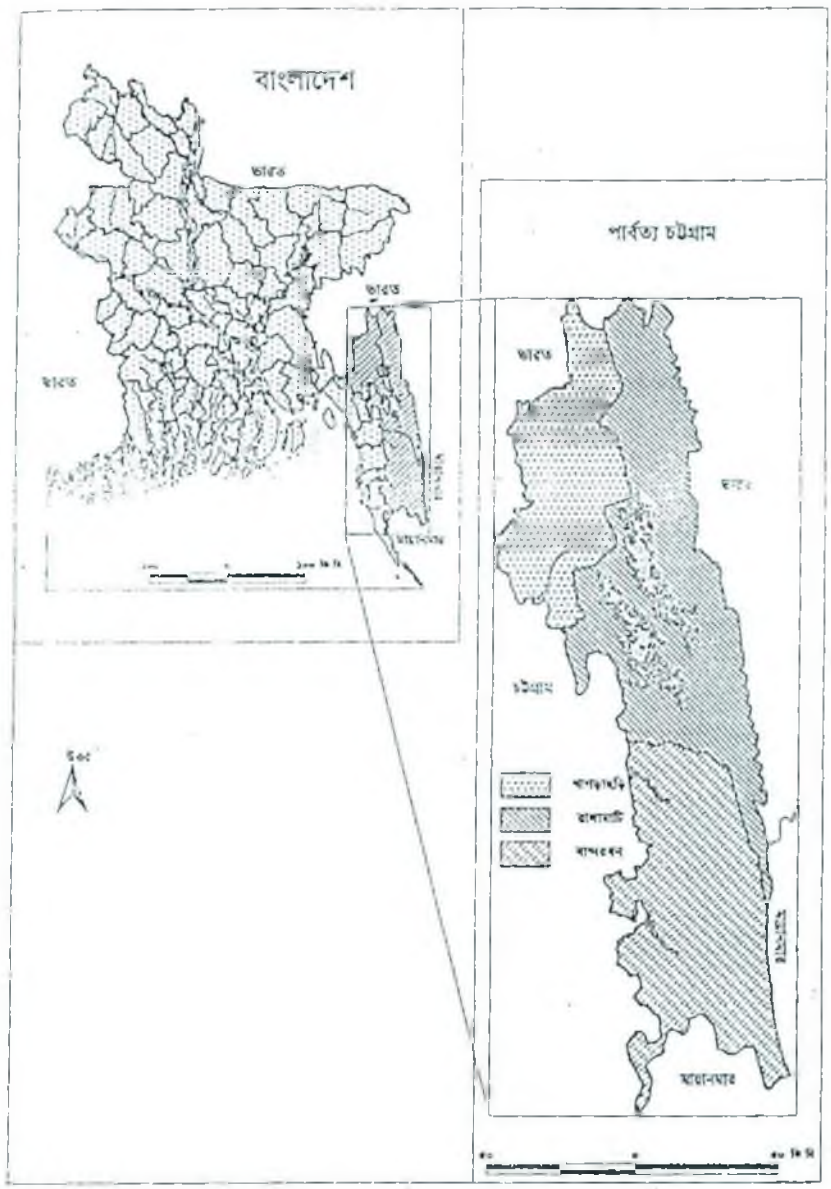

পার্বত্য চট্টগ্রাম, বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থান।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিরূপ ঃ

মূলতঃ ভারত, মায়ানমার এবং বাংলাদেশে বিস্তৃত সুবিশাল আরাকান ইয়োমা পর্বতমালার একটি ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিরূপ গঠিত। ফেণী, কর্ণফুলি, সাঙ্গু, মাতামুহুরী এবং এদের শাখা-নদী ও উপনদীর উপত্যকা দ্বারা সুস্পষ্ট ৪ ভাগে বিভক্ত হয়েছে সমগ্র পার্বত্য এলাকাটি । উপত্যকাগুলো হল চেঙ্গী উপত্যকা, কাসালং উপত্যক্যা, রাইনখিয়াং উপত্যকা এবং সাঙ্গু উপত্যকা। সমুদ্রপৃষ্ট থেকে সমতল ভূমির গড় উচ্চতা ১২০ ফুট থেকে ১৩০ ফুট । আর পাহাড়-পর্বতের গড় উচ্চতা প্রায় ২ হাজার ফুট । পাহাড়ি জমির প্রায় ৮০ শতাংশই আধুনিক কৃষির অনুপযোগী । সমগ্র পার্বত্য এলাকায় রয়েছে বিস্তীর্ণ বনভূমি, পর্বতমালা ও সংকীর্ণ উপত্যকাময় সমতলভূমি । পার্বত্য চট্টগ্রামের তাজিংডং (সরকারি নাম বিজয়) হচ্ছে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ । তাজিংডং এর উচ্চতা ৩,১৮৫ ফুট । উচ্চতা পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পর্বতচূড়ো বান্দরবন জেলার রুমা থানায় অবস্থিত। ১৯০৯ সালে বৃটিশ আমলের একজন পুলিশ কর্মকর্তা R.H. Sned Hutchinson পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিরূপের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, a mass of hill, ravine and cliff covered with dense bamboo, trees and creeper jungle. The mountains are steep and difficult to ascent..... the valleys are covered for the most part with dense virgin forest, interspered with small water courses and swamps of all sizes and description.... They are slowly yielding to the advance of civilization and by clearance and drainage is being converted into rich arable land capable of producing food and other grain in abundance.

নদ-নদী : প্রধান নদী সাতটি। কর্ণফুলি, মাতামুহুরি, সাংগু,কাসালং, চেংগি, মায়ানি, রাইনখিয়াং। নদীগুলো উপত্যকার মধ্য দিয়ে উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে পশ্চিমে বাঁক নিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এখানকার নদ-নদীগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলো অত্যন্ত খরস্রোতা ।

হ্রদ : প্রাকৃতিক হ্রদ হচ্ছে রাইনখিয়াং, কাইন ও বোগাকাইন । বৃহত্তম হ্রদ কাপ্তাই হচ্ছে একটি কৃত্রিম হ্রদ। ১৯৬০ সালে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ (দৈর্ঘ্য ১,৮০০ ফুট, উচ্চতা ১৫৩ ফুট) দেয়ার ফলে একটি প্রকাণ্ড কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হয় যার আয়তন প্রায় ৩০০ বর্গমাইল । এর পানিতে ডুবে গেছে পুরনো রাঙ্গামাটি শহর ।

জলবায়ু : জলবায়ুগত বিভাজনে ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল চিরহরিৎ উদ্ভিজ্জ মণ্ডলীর উষ্ণতা প্রধান অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম, এখানকার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত প্রায় ২৫০ সে.মি. । গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন

Dhaka University Institutional Repository

বার্ষিক গড় তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩০° সেলসিয়াস ও ২০° সেলসিয়াস । গ্রীষ্মকালে ও শীতকালে তাপমাত্রা যথাক্রমে ৪০°/৪২° এবং ৪°/৫° সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠানামা করে ।

উদ্ভিজ্জ ও প্রাণী : পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমির মোট পরিমাণ প্রায় ৭,০৪৬ বর্গকিলোমিটার । এর অর্ধেকেরও বেশী ভূমি পাহাড়ী বনাচ্ছাদিত। এখানে সেগুণ, তূণ, তেলসূর, গর্জন , জারুল, গামার, চাপালিস, কড়ই ইত্যাদি মূল্যবান বৃক্ষ এবং প্রচুর বাঁশ ও বেত জন্মে । এখানকার বনভূমি একাধারে চিরসবুজ, বর্ণমোচী বৃক্ষ এবং ঘন ঝোপঝাড়ের সমন্বয়ে গঠিত । বন্যপ্রাণীদের মধ্যে হাতী, বানর, বনগরু এবং নানা প্রজাতির দুষ্প্রাপ্য পাখি রয়েছে বনভূমিতে । তবে বাঘ বর্তমানে দুস্প্রাপ্য ।

অর্থনীতি : পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। জলবায়ু ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে কৃষি নির্ভর হতে বাধ্য হয়েছে। এখানকার খুব কম সংখ্যক মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারী চাকুরী কিংবা অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত। উপজাতীয়রা তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে খাদ্যের জন্য কৃষিকাজ ছাড়া অন্যান্য উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি খাদ্যঘাটতি এলাকা হিসেবে চিহ্নিত ।

মাহফুজ পারভেজ লিখেছেন, "পাহাড়ে জুম পদ্ধতিতে আর উপত্যকায় কৃষি পদ্ধতিতে চাষাবাদই উপজাতীয়দের প্রধান উপজীবিকা । জুমই চাষের প্রধান পদ্ধতি । পাহাড় পুড়িয়ে তগল বা দা দিয়ে গর্ত খুঁড়ে একই গর্তে বোনা হয় ধান, কার্পাস, তুষ্টা, শস্য প্রভৃতির বীজ । সমতল ভূমিতে উৎপাদন করা হয় ধান সরষে, তামাক, মরিচ, বেগুন প্রভৃতি।

আদিবাসীদের এমন গোষ্ঠী আছে যারা লাঙ্গল দিয়ে চাষ করার পদ্ধতি এখনও গ্রহণ করেনি । জঙ্গলের একটা অংশ আগুন লাগিয়ে ভস্মীভূত করে, তারপর সেই ভস্মাচ্ছাদিত জমির ওপর অলগোছে শস্যের বীজ ছড়িয়ে দেয়া হয় । এই হলো জুম চাষ। বিশেষজ্ঞদের মতে জুম চাষ হলো আদিবাসীদের ধর্মগত সংস্কার। আদিবাসীরা ধরিত্রী মাতার বুক লাঙ্গল দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করতে চায়না । লাঙ্গল প্রথা তাদের কাছে ভয়ানক একটা নিষ্ঠুর ব্যাপার"।[১] তবে নগরায়ণ, শিল্পায়ন, অর্থনৈতিক জীবনের পরিবর্তন ও আধুনিকতার প্রভাবে উপজাতীয়দের মধ্যে কৃষি ভিত্তিক ধারা লুপ্ত হচ্ছে, পেশার পরিবর্তন আসছে ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের নৃ-তাত্ত্বিক গঠন ও সংস্কৃতিতে সমভূমি অঞ্চলের লোকদের সাথে যথেষ্ট অমিল রয়েছে । তাছাড়া জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বন্টনের দিক থেকে

Dhaka University Institutional Repository

সমভূমি অঞ্চলের সাথে রয়েছে বৈশাদৃশ্য । আমরা বলতে পারি নৃ-তাত্ত্বিক এবং জনসংখ্যাতাত্ত্বিক উভয়দিক থেকেই এই অঞ্চল দেশের মধ্যে একটি বিশেষ বৈচিত্রের অধিকারী ।

জনসংখ্যাতত্ত্ব (Demograph) : পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যন্ত কম। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র ১৯০ জন বাস করে (১৯৯১ সালের আদমশুমারীর প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী) অথচ বাংলাদেশের অন্যান্য অংশে জনসংখ্যার গড় ঘনত্ব ৮৩৪ জন। (১৭৬০-১৮৯২) সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা স্থিতিশীল ছিল । অভিগমন আইনের কড়াকড়ি এবং উচ্চ মৃত্যুহার এসব কারণে তখন জনসংখ্যা স্থিতিশীল ছিল ।

নীচের সারণীতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ঘনত্বের একটি চিত্র তুলে ধরা হল ঃ

সারণী - ৪.১

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ঘনত্ব

সন	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯৯	২০০১
মোট জনসংখ্যা	২,৯০,০০০	৩,৮৫,০০০	৫,০৮,০০০	৭,০৮,৪৫২	৯,৬৭,৪২০	১৩,২৫,০০০
ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.)	৫৭ জন	৭৫ জন	১০০ জন	১৪৭ জন	১৯০ জন	--

সূত্র ঃ Statistical Year Book of Bangladesh, 1982
Preliminary Report of Population Census, 1997,
Preliminary Report of Population Census, 2001

সারণী ৪.২ ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামে ২০০১ সালের পৌরসভার জনসংখ্যা

ক্রমিক নং	পৌরসভা	ওয়ার্ড	মহল্লা	পরিবার	মোট	পুরুষ	মহিলা	লিঙ্গ অনুপাত পু/ম	পরিবারের আকার
১.	বান্দরবন	১০	৬২	৬৪৫৭	৩১৮০৬	১৯১৫২	১২৬৫৪	১৫১.৩	৪.৯
২.	খাগড়াছড়ি	৯	৬১	৮২৯১	৩৯৬৫৪	২২৬৮৪	১৬৯৭০	১৩৩.৬	৪.৭
৩.	রাঙ্গামাটি	৯	৩৫	১৩৪৪০	৬৫২৯৪	৩৬০৭৪	২৯২২০	১২৩.৪	৪.৮

Preliminary Report on Population Census, 2001

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.৩

পার্বত্য চট্টগ্রামে ২০০১ সালের জেলাওয়ারি জনসংখ্যা

জিলা							জনসংখ্যা				
ক্রমিক নং	নাম	উপজেলা/ থানা	ইউনিয়ন	গ্রাম	পৌরসভা	পরিবার	মোট	পুরুষ	মহিলা	লিঙ্গ অনুপাত পু/ম	আয়তনের আকার
১.	বান্দরবন	৭	৩২	১৪৮২	১	৫৯৩৪৫	২৯২৯০০	১৫৬৩৭৭	১৩৬৫২৩	১১৪.৫	৪.৯
২.	খাগড়াছড়ি	৮	৩৪	১৫৮১	১	১০৯৭১৮	৫২৪৯৬১	২৭৫০০৯	২৪৯৯৫২	১১০.০	৪.৭
৩.	রাঙামাটি	১০	৫০	১৩৪৭	১	১০৩৯৭৪	৫০৭১৮০	২৭১৮১৩	২৩৫৩৬৭	১১৫.৪	৪.৮

Preliminary Report on Population Census. 2001

সারণী ৪.৪

পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৯১ সালের জেলাওয়ারি জনসংখ্যা ও শিক্ষার হার (অসমন্বিত)

জিলা			জনসংখ্যা			১৯৯১		
ক্রমিক নং	নাম	পরিবার	পুরুষ	মহিলা	মোট	পরিবারের আকার	শিক্ষার হার (সকল বয়সী)	লিঙ্গ অনুপাত পু/ম
১	খাগড়াছড়ি	৭১.২৪৯	১৭৯৭৩৭	১৬০৩৫৮	৩৪০০৯৫	৪.৭৬	২০.০০	১১২.১
২	রাঙ্গামাটি	৭৮.০০৮	২১৭৩৮৩	১৮০৩৩০	৩৯৭৭১৩	৫.০৬	২৮.৭২	১২০.৫
৩	বান্দরবন	৪৫.৯৪৪	১২৫০৬৪	১০৪৫৬৬	২২৯৬১২	৪.৯৭	১৯.৬১	১১৯.৬

তথ্যসূত্র ঃ আদমশুমারি, জুলাই ১৯৯১, বিবিএস

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.৫

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বন্টন ও শতকরা হার দেখানো হলো ঃ

জনগোষ্ঠীর নাম	মোট জনসংখ্যা (পূর্ণ সংখ্যায়) (প্রায়)	শতকরা হার
বাঙালী	৫,০০,০০০	৫০%
চাকমা	২,৪০,০০০	২৪%
মারমা	১,৪৩,০০০	১৪%
ত্রিপুরা	৬১,০০০	৬%
মুরং	২২,০০০	২.২%
তঞ্চংগ্যা	১৯,০০০	১.৯%
ব্যোম	৭,০০০	০.৭%
পাংখো	৪,৫০০	০.৩৫%
চাক	২,০০০	০.২০%
খ্যাং	২,০০০	০.২০%
খুমী	১,২০০	০.১২%
লুসাই	৬৬২	NA
কুকি (ম্রো)	৫,০০০	NA

উৎস ঃ Preliminary Report on Population Census. 1991

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.৬

১৯৯১ ও ১৯৮১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী তিন পার্বত্য জেলার উপজাতীয় খানা ও জনসংখ্যার বিন্যাস।

জেলা	খানা					
	আদমশুমারি ১৯৯১			আদমশুমারি ১৯৮১		
	উপজাতীয়	অ-উপজাতীয়	মোট	উপজাতীয়	অ-উপজাতীয়	মোট
বান্দরবন	২১,৫১৭	২৪,৪২৭	৪৫,৯৪৪	১৫,৯৮১	১৫,০৭৪	৩১,০৫৫
খাগড়াছড়ি	৩৩,৩৬৯	৩৭,৮৮০	৭১,২৪৯	২৯,৭৫৩	১৭,৮২১	৭১,২৪৯
রাঙ্গামাটি	৩২,২৭১	৩৫,৭৩৭	৭৮০০৮	২৯,২৮০	২২,৭৫০	৫২,০৭০
মোট	৯৬,৮৫৭	৯৮,৩৪৪	১,৯৫২০১	৭৫,০১৪	৫৫,৬৮৫	১,৩০,৬৯৯
জেলা	জনসংখ্যা					
	আদমশুমারি ১৯৯১			আদমশুমারি ১৯৮১		
	উপজাতীয়	অ-উপজাতীয়	মোট	উপজাতীয়	অ-উপজাতীয়	মোট
বান্দরবন	১,১০,৩৩৩	১,১৯,২৭৯	২,২৯,৬১২	৮৯,৫০৩	৭২,৪৮৪	১,৬১,৯৮৭
খাগড়াছড়ি	১,৬৭,৫১৯	১,৭২,৫৭৬	৩,৪০,০৯৫	১,৭২,৮৮০	৯২,৭১০	২,৬৫,৫৯০
রাঙ্গামাটি	২,২৩,২৯২	১,৭৪,৪২১	৩,৯৭,৭১৩	১,৭৭,০৭৫	১,০৩,৭০৪	২,৮০,৮৭৯
মোট	৪,৯৮,১৩৪	৪,৬৬,২৭৬	৯,৬৪,৪১০	৪,৩৯,৪৫৮	২,৬৮,৯৯৮	৭,০৮,৪৫৬

তথ্যসূত্র ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, (বি. বি.এস.)

Dhaka University Institutional Repository

নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস ঃ

নৃ-তাত্ত্বিক ও জাতি-তাত্ত্বিক গবেষণা থেকে বুঝা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীরা এখানকার মূল আদিবাসী নয় । এখানকার উপজাতীয়রা ত্রিপুরা, আরাকান প্রভৃতি অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিবাসিত হয়েছে যেমন বাঙালীরা সমতল থেকে এখানে আগমন করেছে । এখানকার উপজাতীয়রা প্রকৃতির সাথে কঠোর সংগ্রাম করে জীবন ধারণ করে । বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ এবং বৃটিশ প্রশাসক Caplain T.H. Lewin এর মতে,

"A great portion of the hill tribes, at present living in the Chittagong hills, undoubtedly came about two generations ago from Arakan. This is asserted both by their own traditions and by records in the Chittagong Collectorate" Lewin, 1869:p.28. CHT. Gazetteers. 1971.

উপজাতি পরিচিতি

পার্বত্য চট্টগ্রামে দশ ভাষাভাষী ১৩টি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী এবং বাঙালির বসবাস । ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী হচ্ছে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং (ম্রো), বোম বা বনযোগী, খুমী, খ্যাং (খিয়াং), চাক, তঞ্চংগা, লুসাই বা কুকি, রিয়াং ও উসুই এবং পাংখো ।

দৈহিক গঠনের দিক থেকে বাংলাদেশের সমতলবাসীদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের রয়েছে অনেক তফাৎ । সমতলের অধিবাসীরা মিশ্র পেট্রো-অষ্ট্রালয়েড এবং ককেশীয় গোষ্ঠীভূক্ত। নৃ-তত্ত্ববিদদের মতে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতিসত্ত্বাই তিব্বত থেকে ইন্দোচীন পর্যন্ত সুবিস্তৃত 'মঙ্গোলয়েড' গোষ্ঠীরই একটি অংশ । এদের দেহ খর্বকায়, চুল কালো, চোখ ছোট আর গালের হাড় উঁচু । মুখমণ্ডল গোলাকার ও প্রশস্ত । চ্যাপ্টা নাসারন্ধ্র, ক্ষুদ্রাকৃতি অক্ষিকোটর, চোখের মণি কালো এবং দাঁড়ি গোঁফ কম ।

নিম্নে কয়েকটি উপজাতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হল

চাকমা : রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়িতে প্রধানত চাকমাদের বাস । এসব জেলার প্রধান অধিবাসী হিসেবেও তারা পরিচিত । এছাড়াও কক্সবাজারে তারা বসবাস করে থাকে । ১৯৯১ এর আদমশুমারী অনুযায়ী চাকমাদের সংখ্যা ২,৪০,০০ ।

Dhaka University Institutional Repository

চাকমাদের জাতিগত উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মতভেদ প্রচলিত । স্যার রিজলির মতে, ব্রহ্ম ভাষায় 'সাক' বা 'সেক' জাতি থেকে চাকমাদের উৎপত্তি । ক্যাপ্টেন লুইনের অভিমত, ... the name Chakma is given to this tribe in general by the inhabitants of the Chittagong District and the largest and dominant section of the tribe recognises this is its rightful appellation. It is also sometimes spelt Tsakama or Tsak, or as it is called in Burmese Tbck.[১]

চাকমারা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত । পিতৃকুল নিয়ে এদের গোছা। এক কথায় এরা জ্ঞাতিসম্পর্ক সম্প্রদায়ভুক্ত । চাকমা সমাজে এরকম ২১টি গোছা রয়েছে এবং গোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ১৫০। চাকমারা বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠান করে থাকে। এসবের মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে 'বিজু', 'ওয়াছু, 'ওয়াগ্যা' এবং 'মাঘীপূর্ণীমা' ইত্যাদি । চাকমারা প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী । তাদের ২৮টি প্রধান ধর্মগ্রন্থ আছে । চাকমাদের ভাষা বাংলাও নয়, আরাকানিও নয় । হাচিনসন এই ভাষা সম্পর্কে বলেন, "The Chakma language is a dialect to Bengali written in corrupt Burmese character."[২]

চাকমাদের নিজস্ব বর্ণমালা আছে । এদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি খুবই সমৃদ্ধ । এদের সমাজে সম্পত্তির ক্ষেত্রে পিতার মৃত্যুর পর পুত্রই উত্তরাধিকারসূত্রে মালিক হয়, তবে পুত্রসন্তান না থাকলে কন্যা সন্তা-নই পিতার মৃত্যুর পর পৈত্রিক সম্পত্তির মালিক হয় । চাকমাদের মৃতদেহ পোড়ানো হয় । চাকমা সমাজে গোষ্ঠী ও গোছাভেদে অন্তর্বিবাহ ও বহির্বিবাহ উভয়ই অনুমোদিত । বিয়ের পরে মেয়েদের ক্ষেত্রে স্বামীর গোষ্ঠীই তার পরিচয়ের একমাত্র সাক্ষ্য ।

চাকমারা জুমচাষের উপর নির্ভরশীল। লবণ ছাড়া বাইরে থেকে তারা কিছু কেনেনা । বর্তমানে শিক্ষার হার এদের সমাজে বাড়ছে । এদের ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে । বর্তমানে তাদের শিক্ষিতের হার বাঙালিদের চাইতে কম নয় ।

মারমা : পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবন জেলায় মারমারা বাস করে । তাছাড়াও কক্সবাজার ও পটুয়াখালী জেলার খেপুপাড়া অঞ্চলেও বর্তমানে এরা বাস করে থাকে । তাদের চীফ 'বোমাং রাজ' হিসেবে খ্যাত । ১৯০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে মারমা সংখ্যা ছিল ৩১,৯০০ জন, ১৯৫১ সালে এ সংখ্যা ৬৫,৮৮০ -তে উন্নীত হয় এবং বর্তমানে এ অঞ্চলে প্রায় ১,৪৩,০০০ জন মারমা সদস্য রয়েছে । ১৭৮৪ সালে আরাকান রাজা

Dhaka University Institutional Repository

বর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হলে মারমারা আরাকান থেকে পালিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে ও বসতি গড়ে তোলে । (CHT Gazetteers 1971)

মারমাদের চেহারাগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এইচ.এইচ.রিজলি তাঁর ট্রাইব্স অ্যান্ড কাস্টেস অব বেঙ্গল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে এদের ৮৪.৫ জনের মধ্যে মঙ্গোলীয় আকৃতি পরিদৃষ্ট ।

মারমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং এদের অধিকাংশ পূজা, পার্বণ ও আনন্দ অনুষ্ঠান পূর্ণিমার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় । তাদের ধর্মগ্রন্থের নাম 'যাদুডুয়া' । মারমারা ১৫টি গোত্রে বিভক্ত। এরা পিতৃপ্রধান গোষ্ঠীর অন্ত--র্ভুক্ত । গোত্রের বাইরে ও ভিতরে সাধারণত বর ঠিক করা হয়ে থাকে।

মারমারা জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। জুম চাষ ছাড়াও তারা কাপড় বোনা ও চুরুট তৈরীর কাজে সিদ্ধহস্ত । মৃত্যুর পর তাদের মৃতদেহ পোড়ানো হয় । মারমাদের ভাষা 'মগী'- নামে পরিচিত যা আরাকানি ভাষারই সংমিশ্রিত রূপ ।

ত্রিপুরা বা টিপরা : ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য হতে পার্বত্য চট্টগ্রামে এদের আগমন হয়েছে । রামগড়েই এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী । ষোড়শ শতাব্দীর পরে এদের আগমন ঘটে পার্বত্য চট্টগ্রামে । ১৯০১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে ত্রিপুরা সংখ্যা ছিল ২৩,৩৩১ জন এবং ১৯৫১ সালে তা ৩৭,২৪৬ জনে উন্নীত হয়। ১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে ত্রিপুরা জনসংখ্যা প্রায় ৬১,০০০।

টিপরারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলেও এদের মধ্যে বিভিন্ন প্রাচীন রীতিনীতি ও সংস্কার এখনো বিদ্যমান। স্যার রিজলির মতে টিপরাদের মধ্যে আদি মঙ্গোলীয় রক্তের ধারাই বেশী । ক্যাপ্টেন হার্বার্ট লুইসের অভিমতও তাই । টিপরাদের গোত্র পিতৃপ্রধান । এদের সমাজে একই গোত্রে বিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । এরা জুম চাষের উপর নির্ভরশীল । নারী, পুরুষ উভয়েই এ কাজ করে থাকে । পুরুষরা মাথায় খবং ও ধুতি এবং মেয়েরা চাকমাদের মত খাদি কাপড় ব্যবহার করে । এদের মৃতদেহ নদীর ধারে পোড়ানো হয় । তাদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে । এ ভাষার নাম হাল্লমী। এটি মৌখিক ভাষা, এদের সাহিত্য খুবই সমৃদ্ধ ।

মুরং : কয়েক শতাব্দী আগে আরাকান অঞ্চল হতে আগত মুরংরা প্রধানত বান্দরবন জেলায় বাস করে । কারো কারো মতে অন্যান্য উপজাতিদের তুলনায় মুরংরা পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাচীনতম অধিবাসী। মুরংরা জড়বাদী। জড়োপসনাই তাদের ধর্মের মূলমন্ত্র। মুরংরা ইহকালে বিশ্বাসী। স্যার রিজলি, ডক্টর গ্রিয়ারসন এবং হাটন প্রমুখ নৃ-তত্ত্ববিদের মতে এদের রক্তধারায় নিগ্রোবুট মানবগোষ্ঠীর লক্ষণ বিদ্যমান। বিয়ের ক্ষেত্রে পণপ্রথা প্রচলিত এই সমাজে তবে এই টাকা খরচ করা হয় বিয়ের উৎসব নৃত্য-গীত ও আনন্দ উপভোগরত

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠানে। বস্ত্রশিল্প এদের ঘরে ঘরে বিদ্যমান । পুরুষরা সাদা ধুতি ও নিজেদের বানানো পাগড়ি মাথায় পরে । মেয়েরা ওয়াংলাই নামে এক ধরণের বস্ত্র পরে । দাঁত কালো করা এদের অন্যতম প্রসাধন প্রথা । অল্প বয়সের ছেলেরা কোমরে পুঁতির মালা পরে এবং যৌবনে নাকড়ি পড়ে । মেয়েরা নীল রঙের ছোট ছোট ঘাগরা পরে যেটা হাটু পর্যন্ত লম্বা । মৃত্যুর পর মুরংদের মৃতদেহ সাতদিন পর্যন্ত ঘরের মধ্যে রাখা হয় । মৃতদেহ পোড়ানোর আগ পর্যন্ত নৃত্য-গীতের অনুষ্ঠান চলে । তারা তাদের ঐতিহ্য ও রীতিনীতি বংশপরম্পরায় ধরে রাখতে চায় । এজন্য এরা অন্যান্য উপজাতীদের তুলনায় কিছুটা রক্ষণশীল বলে অভিহিত । তাদের ভাষা মৌখিক, কোন লিখিত রূপ নেই ।

সেন্দুজ : সেন্দুজ উপজাতিরাই সবচেয়ে বেশী আদিম বৈশিষ্টের অধিকারী । অন্যান্য কয়েকটি উপজাতি আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করে সভ্য হলেও সেন্দুজরা এর ব্যতিক্রম । তারা গহিন অরণ্যে আদিম অবস্থায় থাকতে ভালবাসে । সেন্দুজরা বিশ্বাস করে আদিম মানব মানবীর উৎপত্তি পাথর থেকেই । এছাড়াও ভাবে পাথরের যাদুগুণ রয়েছে, রয়েছে জৈবসারও । কেউ মারা গেলে শোক প্রকাশের পরিবর্তে নৃত্যের মাধ্যমে আনন্দানুষ্ঠানই করতে দেখা যায় ।

লুসাই : লুসাই পাহাড়ে (বর্তমান মিজোরাম) বসবাসকারী উপজাতিরাই প্রধানতঃ লুসাই নামে পরিচিত । যদিও লুসাই পাহাড়ে অন্যান্য নামের উপজাতিও বাস করে । সুতরাং লুসাইদের মূল বসবাস ভারতের মিজোরাম রাজ্যের লুসাই পাহাড়ে ।[৩] তারা প্রায় ১৫০ বছর আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসেছিল।[৪]

লুসাইরা আদি মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এরা ১২টি প্রধান গোত্রে বিভক্ত। এসব গোত্রের আরও ৭০টিরও বেশী উপগোত্র রয়েছে । লুসাইরা পিতৃ সমাজভুক্ত । উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তির মালিক হয় ছেলেরা । প্রয়োজনীয় সবধরণের কাপড় চোপড়ই তারা নিজেরা তৈরী করে । তাদের আহার্য ও পানীয়ের মধ্যে ভাত ও মদই প্রধান। লুসাইদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে । এই ভাষা লুসাই বা দুলেন নামে পরিচিত ।

এখন বহু লুসাই তাদের সনাতন সংস্কার ও ধর্মীয় আচার আচরণগত রীতিনীতি ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে খৃষ্টান মিশনারিদের প্রচেষ্টায়। তবে এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক হিন্দু উপজাতীয় ধর্মাবলম্বী আছে। জনসংখ্যার দিক থেকে এরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র । অন্যান্য প্রধান উপজাতীয়দের মতোই বর্তমানে এদের অনেকেই আধুনিক জীবনধারার অনুসারী ।

খুমি : খুমিরা প্রধানত বান্দরবনের মুদ, থানচি, রুমা ও লামা ইত্যাদি জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় বসবাসকরে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে খুমিরা পার্বত্য চট্টগ্রামে আসার আগে মায়ানমারের আরাকান অঞ্চলে বসবাস করত।[৫] Captain Lewin এর দেয়া তথ্য উদ্ধৃত করে সুগত চাকমা জানান যে, আরাকানে খুমি ও

Dhaka University Institutional Repository

ম্রোদের মধ্যে একটি প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছিল । ঐ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জয়ী হয়ে খুমীরা ম্রোদেরকে এদিকে (অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে) বিতাড়িত করে দেয় এবং পরে সম্ভবত তারাও অন্যদের চাপে পড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলে আসে ।[৬]

খুমীরা সর্বাত্মকবাদী ধর্মে বিশ্বাসী। এরা সংখ্যায় অতি অল্প । একটি অনগ্রসর সমাজ। খুমীরাও পিতৃপ্রধান গোষ্ঠীর অন্তর্গত । এদের সমাজরীতি অনুযায়ী বড়ছেলে সম্পত্তির মালিক হয়ে থাকে । খুমীদের মৃতদেহ মুরংদের মতো পোড়ানো হয় । এরা গহীণ অরণ্যের উঁচুস্থানে ঘরবাড়ী নির্মাণ করে । গাছের উপরেও ঘর তৈরী করে এদের বসবাস করতে দেখা যায় । পোশাকের মধ্যে পুরুষরা লেংটি পরে আর মেয়েরা মুরংদের মত ওয়াংলাই ব্যবহার করে । তাছাড়া নারী পুরুষ উভয়েই বিচিত্র ধরণের রূপোর অলঙ্কার ও পুতির মালা ব্যবহার করে । ভাত ও মদ এদের প্রধান খাদ্য । মাংস খাওয়ার ব্যাপারে এদের মধ্যে কোনো সংস্কারগত বাধানিষেধ নেই । খুমিদের ভাষা মৌখিক তবে লিখিত রূপ নেই ।

কুকি : প্রখ্যাত নৃ-তত্ত্ববিদ টি.সি. হডসন এর মতে, কুকিরা আসামের নাগা ও মণিপুরীদের অন্তর্ভুক্ত জাতি। এদের অবস্থান একদা পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকলেও বর্তমানে এরা এখন গভীর অরণ্যের দিকে চলে গেছে । ১৯৩১ সালের এক গণনায় দেখা যায় এদের মধ্যে ৬০৮ জন খৃষ্টান ও ২,১১৭ জন পাকৃতিক ধর্মাবলম্বী । এদের ঘর মাচন পদ্ধতিতে তৈরী, এরা পিতৃপ্রধান গোষ্ঠী সমর্থন করে । এদের সমাজে মেয়েকে বিয়ে করার সময় বরপক্ষের কাছ থেকে প্রচুর উপঢৌকন আদায় করা হয় । এরা নানা ধরণের সংস্কারাচ্ছন। এরা মৃতদেহকে কবর দেয় এবং কবরের উপরে ১টি ঘর তৈরী করে ।

এদের সমাজে বড় ও ছোট ছেলে সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হয় এবং অন্য ভাইরা তাদের কৃপার পাত্র হয় । কুকী নারী ও পুরুষ উভয়েই লম্বা চুল রাখার পক্ষপাতী । পুরুষরা সাধারণত নেংটি এবং মেয়েরা মুরংদের চাইতে উন্নত ধরণের বস্ত্র পরিধান করে, তারা পরপুরুষের সামনে ওড়না গায়ে দিয়ে বের হয় । পাহাড়ের শীর্ষদেশে এরা ঘড়বাড়ী তৈরী করে । এদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে তবে বর্ণমালা আছে কিনা তা এখনও আবিস্কার হয়নি ।

বোম : বোমরা প্রধানত ঃ বান্দরবন জেলার রুমা অঞ্চলে বাস করে । সুগত চাকমার মতে বোমরা ১৮৩৮-৩৯ সালের দিকে লিয়ানুকং নামক সর্দারের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে প্রবেশ করে তৎকালীন বোমাং রাজার বিনা অনুমতিতে বান্দরবন জেলায় থেকে যায় ।

Dhaka University Institutional Repository

খিয়াং : খিয়াংরা প্রধানতঃ রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই চন্দ্রঘোনা অঞ্চলে বসবাস করে । অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে খিয়াংরা আরাকানের উমাতানাং পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাস করত।[৭] তারা কবে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছিল তা স্পষ্ট নয়। এই উপজাতি গোষ্ঠী ধর্মে বৌদ্ধ, ধূতি পরিধান করে ও ঘরগুলো মাচান পদ্ধতিতে তৈরী ।

পাঙ্খো ও বনযোগী : একই জাতির অন্তর্ভুক্ত দুটি শাখা মাত্র । নৃ-তত্ত্ববিদ জে. শেকস্পিয়ার উল্লেখ করেন যে, এরা আদি মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত । এরা নিজেদের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বলে স্বীকার করলেও তাদের পূজা-পার্বণ ও সামাজিক রীতিনীতির ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্মের সাথে যথেষ্ট অমিল লক্ষ করা যায় । লুসাইদের মতে পাঙ্খো বনযোগীরা মোরগকে খুবই পবিত্র জ্ঞান করে । পাঙ্খো মেয়ে পুরুষ উভয়েই লম্বা চুল রাখে । বিয়ের ব্যাপারে পিতামাতা বা অভিভাবকের মতামতই চূড়ান্ত। এদের মৃতদেহ কবর দেয়া হয় এবং পরলোকে মৃতব্যক্তির সাহচর্যের জন্য জীব হত্যা করে সঙ্গে দেয়ার রীতিও এদের মধ্যে প্রচলিত । মেয়েরা জুম চাষ ছাড়া কাঠ কাটা ও আহরণে পুরুষদের সাহায্য করে থাকে । এদের মধ্যে ত্রিশ-পয়ত্রিশ বছর মেয়ের সঙ্গে বিশ-পঁচিশ বছরের ছেলের বিয়ে দেয়া হয় । পুরুষরা ধুতির মত সংক্ষিপ্ত কাপড় পরে আর মেয়েরা চাকমাদের মত পিঁধন পরিধান করে এবং আলাদা বাড়তি কাপড় দিয়ে বুক আবৃত করে রাখে । এদের কাপড় নিজেরাই তৈরী করে । এরা যাদুমন্ত্র বা ম্যাজিকে বিশ্বাসী । এদের ভাষা মৌখিক। কোন লিখিত রূপ নেই ।

তংচঙ্গা : এরা হল চাকমাদেরই একটি উপশাখা । কিন্তু চাকমারা তাদেরকে পৃথক উপজাতি বলে স্বীকৃতি দেয়না । তবে তংচঙ্গারা মনে করে তারা একটি পৃথক জাতিসত্ত্বার অধিকারী । ভাত ও মদ এদের খাদ্য তালিকায় প্রাধান্য পায় । মদ ছাড়া সাংসারিক ও ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠানই সম্পন্ন হয়না । খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বারা অনেক উপজাতি ধর্মান্তরিত হলেও তঞ্চঙ্গ্যারা এক্ষেত্রে কিছুটা রক্ষণশীল রয়ে গেছে । এদের আদি নিবাস ছিল আরাকান । এদের কথাবার্তায় আরাকানি ও মগী শব্দের প্রচলন বেশী । শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত হওয়ায় বর্তমানে এরা বাংলা ভাষাতেও কথা বলে । এদের মৃতদেহ পোড়ানো হয় ।

নূহ-উল-আলম লেনিন বলেন,

"প্রতিটি উপজাতিরই রয়েছে নিজস্ব বিচার পদ্ধতি । বস্তুত পাহাড়িদের প্রাক-সামন্ততান্ত্রিক (প্রি-ফিউজাল) সমাজ সম্পর্ক ও জীবন-পদ্ধতি আধুনিক বিশ্ব সভ্যতার সাধারণ ধারা থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে । অধুনা বিশেষ করে চাকমাদের মধ্যে শিক্ষার উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেছে । ফলে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বৈততার ভেতর দিয়ে অগ্রসরমান পাহাড়িরা সমন্বিত অথচ নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত জীবনধারা গড়ে তোলার চেষ্টায় ব্যাপৃত"।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

উপজাতীয় লোকদের পার্বত্য অঞ্চলে আগমন ঘটে পাঁচশ বছরেরও কিছু আগে । একটি সূত্রানুযায়ী, ১৪১৮ সালে চাকমারা প্রথম আসে। ব্রহ্মদেশ থেকে চাকমা রাজা মোআন তসনি তাড়া খেয়ে আশ্রয় নেন রামু ও টেকনাফ এলাকায় । এই অঞ্চলে এসে আগমনকারী চাকমারা আদিবাসী কুকিদের বিতাড়ন করে । এরপর পালাক্রমে চাকমা, মারমা প্রভৃতি উপজাতি আসতে থাকে এবং সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন শুরু করে।

বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন ঃ

বৃটিশ আমলে পার্বত্য অঞ্চলে কোন মহাবিদ্যালয়, কারিগরি বিদ্যালয় ছিলনা । হাইস্কুল ছিল মাত্র একটি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ২০টি । শিক্ষিতের হার ছিল ২% থেকে ৩% । এখানে কোন বৃহদায়তন, ভারী কিংবা মাঝারি শিল্প ছিলনা। এমনকি সরকারী উদ্যোগে কুটির শিল্প-কারখানা পর্যন্ত গড়ে তোলা হয়নি। কোন হাসপাতাল, চিত্তবিনোদন কেন্দ্র ছিলনা, কোথাও কোন পাকা সড়ক ছিলনা । বিদ্যুৎ ও টেলিফোন পার্বত্য চট্টগ্রামে তখনো পৌছেনি। অর্থাৎ তখন উপজাতীয়দের প্রাচীন যুগেই রেখে দেয়া হয় । তারা তখন ভূমির মালিকও ছিলনা । রাজাদের কেবল খাজনা আদায়কারীর ভূমিকায় রাখা হয় । রাজাদের কোন ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি । রাজারা জেলা প্রশাসকদের দ্বারা মনোনীত হতেন, যাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল বৃটিশদের স্বার্থের পক্ষে কাজ করা ।

পাকিস্তান আমলেও উপজাতীয়দের সমাজ ব্যবস্থা ছিল পশ্চাদপদ ও আদিম। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে জেনারেল ইব্রাহিমের মন্তব্য হল ঃ " উপজাতীয়দের সমাজ ব্যবস্থা কোন কালেই কোন রকম কঠিন গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা । উপজাতীয়দের সমাজ ব্যবস্থা কোন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা নয়, এটা ক্রমপ্রবর্তিত সমাজ ব্যবস্থা । পার্বত্য চট্টগ্রামের সামাজিক ব্যবস্থা স্থান-কাল পরিবেশ পরিস্থিতিভেদেই প্রবর্তিত হয়েছে" ।[৯]

জুমচাষ, বনজদ্রব্য আহরণ ও পশু শিকার ছিল উপজাতীয়দের জীবিকার মাধ্যম । বহিরাগত বাঙালীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল ব্যবসা বাণিজ্য। বলা যায় তাদের অর্থনীতি ছিল স্ব-প্রয়োজনীয় পর্যায়ের । ১৯৫১ সালের আদমশুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী তখনকার পার্বত্য অঞ্চলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে বিবরণ দেয়া হয়েছিল তা নিম্নরূপ ঃ

"The economic condition of this district is very unsatisfactory. Trade is entirely in the hands of outsiders. There are 66 bazars in this district and only a few shops in them

Dhaka University Institutional Repository

belong to men of this district. The itinerant traders also are practically all Bangalees from Chittagong district."(CHT Gazetters 197 : p. 118)

পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরক্ষরতা ব্যাপক ছিল । এই শতাব্দীর পাঁচ এর দশক থেকেই এ অঞ্চলে উপজাতীয়দের মধ্যে বিশেষ করে চাকমাদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটতে শুরু করে । ঐতিহ্য ও নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি প্রচণ্ড রক্ষণশীলতার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষায় আলোকিত একটি মধ্য শ্রেণীও তাদের মধ্যে গড়ে উঠে । পরবর্তীকালে চাকমা সমাজে এই মধ্য শ্রেণীটি প্রভাবশালী সামাজিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় । এদের অনেকেই শিক্ষার প্রসারের জন্য দুর্গম ও পশ্চাৎপদ এলাকাগুলোতে শিক্ষকতা পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করেন । ফলে শিক্ষিতের হার সমতল বাঙালিদের তুলনায় চাকমা ও অন্য কয়েকটি উপজাতিদের মধ্যে বেশী দেখা যায় । কিছু সংখ্যক উপজাতি উচ্চ শিক্ষিত হয়ে সরকারী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকুরী লাভ করেছিলেন । এই ক্ষুদ্র শ্রেণীটিই তাদের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলিকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে সচেতন করে তুলতে প্রচেষ্টা চালান ।

পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে বেশ কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প স্থাপন করা হয় । এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান ঐ অঞ্চলের জনগণের কর্মসংস্থান এবং জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে ও পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল । উল্লেখযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে । কর্ণফুলি বহুমুখী প্রকল্প, কাপ্তাই (সরকারী ১৯৬০); কর্ণফুলী পেপার মিল, চন্দ্রঘোনা (বেসরকারী ১৯৫২); কর্ণফুলী রেয়ন এণ্ড কেমিক্যালস লিঃ , চন্দ্রঘোনা (বেসরকারী ১৯৬৬); ইষ্টার্ণ পাকিস্তান টিম্বার এণ্ড প্লাইউড ইন্ডাস্ট্রিজ কোঃ লিঃ চন্দ্রঘোনা প্রভৃতি ।

পাকিস্তান আমলে সরকার শিক্ষাখাতে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছিল । ১৯৪৭-৪৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪৪ টি, ১৯৫৮ সালের শিক্ষা অধিদপ্তরের জরিপ অনুযায়ী তখন এই অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬১টিতে । ১৯৬৯ সালের জুন নাগাদ মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯১টিতে । (CHT District Gazetters 1971)

রাজনৈতিক তৎপরতা

বৃটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ তেমন রাজনৈতিক সচেতন ছিলনা । তখন এর প্রধান কারণ ছিল শিক্ষার অভাব, দুর্গমতা বিক্ষিপ্ত জনবসতি প্রভৃতি । তারপরেও শিক্ষিত দু'একজন পাহাড়ী জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে এগিয়ে আসেন । ১৯১৫ সালে রাজমোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে 'চাকমা

Dhaka University Institutional Repository

যুবক সমিতি' এবং ১৯২৮ সালে ঘনশ্যাম দেওয়ানের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল চাকমা যুবক সংঘ' । তবে এই সংগঠন দুটির কার্যক্রম খুবই সংক্ষিপ্ত ও সীমিত ছিল । ১৯২০ সালে গঠিত 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি' সর্ব প্রথম রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সংগঠিত হয়ে ধাপে ধাপে বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে । জনসমিতি ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে জোর তৎপরতা চালায় ।

১৯৪৭ সালে চাকমা সার্কেলে শিক্ষিতের হার বেশী হওয়ায় রাজনৈতিক সচেতনতা ও উদ্বিগ্নতা এই এলাকায় জনগণের মধ্যে বেশী দেখা যায় । রাজনৈতিক পদক্ষেপগুলো প্রথম এই সার্কেল থেকে নেয়া হয়। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের আগে চাকমা সার্কেলে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন রাজা ভুবন মোহন রায়, জনসমিতির সভাপতি কামিনি মোহন দেওয়ান; জনসমিতির সাধারণ সম্পাদক স্নেহকুমার চাকমা ।

উপজাতীয় ছাত্রদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ১৯৫৬ সালে গঠিত হয় হিল স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন'। ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বরে অনন্ত বিহারী খীসা এবং জে.বি. লারমার নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় কল্যাণ সমিতি'। এই সমিতির তৎপরতার ফলেই স্বতন্ত্র প্রার্থী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন । পাকিস্তান সরকারের কাছে ১৯৭০ সালে এই সংগঠনই সর্বপ্রথম 'নিজস্ব আইন পরিষদ' ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ ১৬ দফা সংবলিত দাবিনামা উত্থাপন করেছিল ।

রাঙ্গামাটিতে, ১৯৭২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী এম.এন. লারমার উদ্যোগে 'জনসমিতি' 'পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহিতি সমিতি' নাম ধারণ করে আত্মপ্রকাশ করে । পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসনের দাবি এই জনসংহিতি সমিতিই উত্থাপন করেছিল। নূহ-উল-আলম লেনিনের মতে, "বাঙালি জাতীয়তাবাদ পাহাড়িদের অস্তিত্ব বিপন্ন করবে - এই ধারণা থেকে এম.এন. লারমা ১৩টি উপজাতিকে 'জুম্ম জাতীয়তাবাদ' এর নতুন এক জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করার আওয়াজ তোলেন।"[১০]

১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারি জনসংহিতি সমিতির সামরিক শাখা শান্তিবাহিনী গঠন করা হয় । ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই শান্তিবাহিনী তাদের সুদৃঢ় অবস্থান গড়ে তোলে পার্বত্য চট্টগ্রামে । ১৯৭৬ সাল থেকে শান্তিবাহিনী শুরু করে তাদের সামরিক তৎপরতা । ১৯৮২ সালে 'জনসংহিতি সমিতি' ও শান্তি বাহিনী বিভক্ত হয়ে পড়ে দু'টি গ্রুপে - জাতীয়তাবাদী 'প্রীতি গ্রুপ' হল প্রীতিকুমার চাকমার নেতৃত্বে এবং মার্কসবাদী 'লারমা গ্রুপ হল মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে । দু'টি গ্রুপই সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং এর পরিণতিতে ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর প্রীতি গ্রুপের হামলায় এম .এন. লারমা নিহত হন ৮ সহযোগীসহ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৫ সালের ১৯ এপ্রিল সরকারের সাথে এক চুক্তির মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসায় বিলুপ্তি ঘটে 'প্রীতি গ্রুপ' এর। অন্যদিকে 'লারমা গ্রুপ'কে ঢেলে সাজানো ও পুনর্গঠিত করা হয় ১৯৮৫ সালের মে মাসে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার নেতৃত্বে । শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র তৎপরতা জোরদার করা হয়। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি অশান্ত হয়ে উঠে ।

পার্বত্য অঞ্চলে আধুনিকীকরণের প্রভাব ঃ

পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলো ছিল সনাতনধর্মী । অতীতে এরা অগতিশীল ছিল । কিন্তু পর্যায়ক্রমে শিক্ষার প্রসার ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড গ্রহণ ইত্যাদি নানা কারণে আধুনিকতার ছোঁয়ায় এ অঞ্চলের সনাতনপন্থী সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে ধীরে ধীরে প্রগতিশীলতার দিকে এগিয়ে যায় । এরই প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলি ক্রমান্বয়ে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার সাথে পরিচিত হতে থাকে । এর ফলে সনাতন জীবনধারায় ব্যাপক পরিবর্তনের কারণে যাযাবর জীবন পরিহার করে এরা স্থায়ী বসতি স্থাপনে অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে । আধুনিক পোশাকের প্রতি তারা আকৃষ্ট হচ্ছে । জুম চাষের পরিবর্তে আধুনিক কৃষিকাজ আয়ত্ব করছে । চাকরী, ব্যবসাসহ নানা পেশায় আসতে শুরু করেছে এবং এ উপলক্ষে ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরাঞ্চলে অবস্থান করছে । অনেকেই বিভিন্ন শহরে স্থায়ী বাসগৃহও গড়ে তুলছে । যা তাদেরকে আধুনিকমনস্ক ও সচেতন করে তুলতে সাহায্য করে । তাদের চিন্তা চেতনা প্রসারিত হতে থাকে এবং বোধশক্তি হয় তীক্ষ্ণ । নিজস্ব অস্তিত্বের প্রশ্নে তারা উদগ্রীব হয়ে উঠে । আধুনিকীকরণের ছোঁয়া তাদের ব্যক্তিস্বত্বাকে জাগ্রত করে । আমরা বলতে পারি চেতনা জাগ্রত হয় আধুনিকতাবোধ থেকেই । আর চেতনা, সচেতনতা, তীক্ষ্ণ বোধশক্তি থেকেই মানসিক চাপ, ক্ষোভ ও দ্বন্দ্বের জন্ম হয়। সমাজে যখন ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তখনই অস্থিতিশীলতা দেখা দেয় ।

ক্ষোভ, দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

পাহাড়িদের প্রতি শতাব্দীর পর শতাব্দী যে বঞ্চনা, শোষণ ও নীপিড়ন করা হয়েছিল তারই স্বাভাবিক পরিণতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন সময়ে বিদ্রোহ দেখা দেয় যা ক্ষোভ ও ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ । শোষণ সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে নীতি নির্ধারক মহল থেকেও করা হয়েছে । অনগ্রসর ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে তাদের সরলতার সুযোগে নানাভাবে হেয়-প্রতিপন্ন করা হয় । যেমন, কৌশলে তাদেব সম্পত্তি দখল করে নেয়া, ব্যবসা বাণিজ্যে ঠকানো, জিনিস কেনার সময় ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা, টাকা ধার দিয়ে চড়া সুদে আদায় করে সর্বস্বান্ত করা ইত্যাদি । ফলে বাঙ্গালিদের প্রতি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মনে বিদ্বেষী মনোভাব

Dhaka University Institutional Repository

জন্ম নিয়েছে । প্রবঞ্চনার কারণে তাদের মনে জাগ্রত হয়েছে হিংসা ও ঘৃণা । যা পার্বত্য অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে ।

আহমদ ছফার ভাষায় - "পার্বত্য উপজাতিদের প্রতি যে শোষণ তা শুরু হয়েছে অনেক অনেক আগে । শান্তিবাহিনী গঠিত হওয়ার আগে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে, ভারত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে, কাপ্তাই বাঁধ চালু হওয়ার আগে, ভারতে বৃটিশ শাসন চালু হওয়ার আগে, নওয়াবেরা বাংলার মসনদে আসীন হওয়ার আগে, মুঘলেরা জঙ্গল মহাল হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে কার্পাস মহল বলে চিহ্নিত করার আগে, কতো আগে আমি বলতে পারবোনা । যে ঐতিহাসিক ধারাক্রম অনুসারে রণরক্ত সফলতার মধ্য দিয়ে শক্তিমাণ জনগোষ্ঠীর কাছে মার খেয়ে দুর্বল মানবগোষ্ঠী একটেরে পালিয়ে গিয়ে কোনরকমে আত্মরক্ষা করেছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিসমূহের ভাগ্যও তার চাইতে বিচ্ছিন্ন নয়" ।[১১] বার বার শোষণের ফলে তাদের মধ্যে ক্ষোভ ও দ্বন্দ্ব দেখা দেয় । ক্ষোভের একপর্যায়ে উপজাতিয়দের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যাপারে সচেতনতা জাগ্রত হয় ।

পর্যায়ক্রমে ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠীগুলি উন্নয়নের ছোঁয়ায় ক্রমশ আধুনিক হয়ে উঠে । তারা যতই আধুনিক ও শিক্ষিত হতে লাগল ততই তাদের মনে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় । আর এ সচেতনতা থেকেই তারা এত বছরের শোষণের ব্যাপারে প্রতিবাদী হয়ে উঠে। আর এই প্রতিবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় শিক্ষিত, সচেতন, পাহাড়ী জনগোষ্ঠী । তাদের এই শোষণের প্রতিবাদ এক পর্যায়ে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার রূপ পরিগ্রহ করে এবং জাতীয় রাজনীতিকে উত্তপ্ত করে তোলে । নিম্নে বিভিন্ন সময়ের শোষণ এবং এর ফলে যে অস্থিতিশীলতার সৃষ্টির হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হল ।

বৃটিশ শাসনামল ঃ ১৭৬০ সাল থেকে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ও তাদের অনুচরগণ এ অঞ্চলের উপজাতীয়দের শোষণ আরম্ভ করে । মোঘল শাসনামলের মত বৃটিশ শাসকগণকেও উপজাতীয়রা কার্পাসের মাধ্যমে রাজস্ব দিত । কিন্তু কার্পাসের পরিমাণ একেক বছর একেক রকম হওয়ার ফলে ইংরেজদের মনে অবিশ্বাস জন্মায়। এর ফলে কার্পাস মহল ইজারা দিয়ে রাজস্বের পরিমাণ নিশ্চিত রাখা হয়। ইজারাদারগণ নানারকম উৎপীড়ন দ্বারা পাহাড়িয়াদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কার্পাস আদায় করত । এর ফলে ইজারাদারগণ ইংরেজদের অংশ দিয়ে বাকিটা আত্মসাৎ করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতো । এভাবে শোষণের ফলে উপজাতীয়দের জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন ও জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে । এরই পরিপ্রেক্ষিতে উপজাতীয়রা বিদ্রোহের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয় । এ অঞ্চলে রাজস্ব আদায়ের জন্য যতদিন ইজারা প্রথা বলবৎ ছিল ততদিন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৭৮৬-৮৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উপজাতীয় বিদ্রোহ চলেছে ।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি ১৯০০ প্রবর্তিত হওয়ার ফলে প্রকৃত ক্ষমতা জেলা প্রশাসকের হাতে চলে যায় । খাজনা আদায় ও ছোটখাট বিবাদ মিটিয়ে ফেলার শালিসী দায়িত্ব ছাড়া আর কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব উপজাতি প্রধানরা পায়নি । এ বিধি বলে বৃটিশদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে পার্বত্য চট্টগ্রামের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব । এ প্রসঙ্গে এস মাহমুদ আলী মন্তব্য করেন ঃ

"With this Act the British arrogated arbitrary power over CHT. its people and land."[১২]
(এ আইনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম এর জনগণ ও ভূমির উপর বৃটিশদের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়)

মাহমুদ আলী আরো বলেন,

"The regulation did not specifically bar Bengali immigration or land rights, but gave the British the authority to impose restrictions when it considered it."[১৩] অনুবাদ ঃ এ বিধি পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালীদের অভিভাসন কিংবা ভূমি ক্রয়ের অধিকার রহিত করেনি । বরং এ বিধি বৃটিশদের এ কর্তৃত্ব প্রদান করে যে, যখন তারা চাইবে তখন যেন তারা বাধা প্রদান করতে পারে ।

এ শাসনবিধি উপজাতীয়দের ভূমিদাসে পরিণত করেছে। তাদেরকে মর্যাদাহীন ও অধিকার হারা করেছে। এই আইন বলে কিছু লোক কারবারী, হেডম্যান, দেওয়ান, রাজা ইত্যাদিতে পরিণত হলেও তাদের কোন নির্বাহী ক্ষমতা ছিলনা। এমনকি রাজাও ছিলেন নির্বাহী ক্ষমতাবিহীন। এ বিধিবলে উপজাতীয়রা জেলা প্রশাসকের আজ্ঞাবহ ও সেবাদাসে পরিণত হয়। রাজাও তার মাধ্যমে মনোনয়ন পেতেন। ভূমি বন্দোবস্তী ও ইজারা ছাড়াও কৃষিকাজ পশুপালন কোন কিছুই ছিলনা করমুক্ত । মূলতঃ ইহা ছিল কর আদায়ের মাধ্যমে উপজাতিদের শোষণ করার সাম্রাজ্যবাদী কৌশল ।

কর আদায়ের জন্য উপজাতীয় লোকদের নিয়োগ করা হত । তখন বাঙ্গালীরা বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে জড়িত ছিল । তাই আন্দোলন যাতে পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য তাদের গমনাগমন নিয়ন্ত্রণ ও সীমিত করার লক্ষ্যে এ ধরণের বিধি প্রবর্তন করা হয় ।

বৃটিশ সরকার ১৯০০ সনের বিধিকে ১৯২০, ১৯২৫, ১৯৩৩ ও ১৯৩৫ সনে বিভিন্ন ধারা, বিধি, আইন ও নোটিশের মাধ্যমে সংশোধন করেছিল তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ রক্ষার জন্য । পার্বত্য চট্টগ্রামকে ১৯২০ সনের সংশোধনীতে 'পশ্চাদপদ' এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা সত্ত্বেও বৃটিশ শাসনামলে এ অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি । এ বিধি উপজাতীয়দের ভাগ্য উন্নয়নে কোন ভূমিকা না রেখে তাদেরকে অধিকারহীন করেছে ।

Dhaka University Institutional Repository

উপজাতি ও সমতলের জনগণের মধ্যে যাতে কখনোই ঐক্য ও বন্ধুত্ব গড়ে না উঠে সেজন্য বৃটিশ সরকার এ বিধির মাধ্যমে বাঙালী ও উপজাতীয়দের মধ্যে অবৈধ বৈষম্যের অবতারণা করে । পার্বত্য অঞ্চলে বাঙ্গালিদের অনুপ্রবেশ ও ভূমির মালিক হবার অধিকার জেলা প্রশাসকের ইচ্ছাধীন করা হলেও উপজাতীয়দের সমতলভূমিতে যাতায়াতে ও ভূমির মালিক হবার ক্ষেত্রে কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়নি ।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬০ সালে বাংলার নবাব মীর কাশেম খাঁর কাছ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনের ভার নেয়ায় উপজাতীয়রা তা মেনে নিতে পারেনি । ফলে ২৫ বছর গেরিলা যুদ্ধ চলে । পার্বত্য চট্টগ্রামকে ১৮৬০ সালে চট্টগ্রাম থেকে পৃথক করে ভিন্ন জেলায় পরিণত করে শাসনের জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ককে নিয়োগ দেয়া হয় । বৃটিশরা যথারীতি ডিভাইড এণ্ড রুল নীতির মাধ্যমে উপজাতি ও অ-উপজাতির মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি করে । ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রামে নতুন একটি আইনের ফলে পার্বত্যে এলিট শ্রেণী ও রাজন্যদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং জাতিগত বৈরিতার ক্ষেত্র আরও মজবুত হয়। ঐ সময় পার্বত্য চট্টগ্রামকে 'অশাসিত বা অনিয়ন্ত্রিত এলাকা' (নন- রেগুলেটেড এরিয়া) ঘোষণা করা হয় । এ-আইনের মাধ্যমে বহিরাগতদের আগমন ও স্থায়ী বসবাস বন্ধ করা ছাড়াও পার্বত্য এলাকাকে তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করে রাজা, হেডম্যান ও কারবারিদের সাহায্যে সামন্তবাদি সমাজ ব্যবস্থা চালু করা হয় । পার্বত্য চট্টগ্রামকে ১৯২০ সালে 'একান্ত এলাকা' (এক্সক্লুসিভ এরিয়া) ঘোষণা করা হয় । ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসন অবসানের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসিরা এ ব্যবস্থা প্রথমে মেনে নেয়নি । রাঙ্গামাটিতে ভারতীয় আর বান্দরবনে ব্রহ্মদেশের পতাকা উড়ানো হয় । সামরিক অভিযান চালিয়ে পাকিস্তানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ সালে 'একান্ত এলাকা'র বদলে উপজাতি এলাকা এবং ১৯৬৪ সালে আবার 'উপজাতীয় এলাকা' বিলোপ করে ১৯০০ সালের বিধি গৃহিত হয় । ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পার্বত্য রাজারা পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করে । দেশ স্বাধীন হবার পর মুক্তিযোদ্ধারা উপজাতীয়দের সন্দেহ করে । ফলে স্বাধীন বাংলাদেশে পার্বত্য অঞ্চলে শুরু হয় অস্থিতিশীলতা ।

পাকিস্তান শাসনামল

পাকিস্তানীরা তাদের শাসনামলে বাঙ্গালিদের উপর জুলুম করেই ক্ষান্ত হয়নি বৃটিশদের মত ডিভাইড এণ্ড রুলনীতি প্রয়োগ করে পাহাড়ি বাঙ্গালি সংঘাত জিইয়ে রাখে । যেমন কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কথা ধরা যাক । তারা বাঙ্গালীর স্বার্থে এটি করতে যেয়ে পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়েছিল বিদ্বেষের বীজ । কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্পের মাধ্যমে উপজাতীয়দেব মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্ষোভের জন্ম নেয় পাকিস্তান আমলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের জাতিসত্ত্বার চেতনা শুধু যে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক তা নয়। পাকিস্তান সরকার

Dhaka University Institutional Repository

কর্তৃক কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কাপ্তাইয়ের নিকট কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি করা হয় । এতে ১২৫টি মৌজার প্রায় ৫৪,০০০ একর জমি প্লাবিত হওয়ায় এক লক্ষেরও অধিক লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[১৪] স্থানচ্যুত জনগণের জন্য পুর্নবাসনের ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হয় অদক্ষ পরিচালনার কারণে। সরকারের ক্ষতিপূরণের মাত্রা ধার্য করা হয়েছিল ৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু বাস্তবে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় মাত্র ২.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ।[১৫] যেটুকু ক্ষতিপূরণ বরাদ্দ করা হয়, সে ব্যাপারেও অভিযোগ উঠেছিল । কারণ বন্টনের সময় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের বঞ্চিত করা হয় । তাছাড়াও ছিল সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি। এতে সরকারের প্রতি উপজাতীয়দের ক্ষোভ ও ঘৃণা পুঞ্জীভূত হতে থাকে। তাছাড়াও কাপ্তাই প্রকল্পের কাজের জন্য বাঙালিদের আগমনকে উপজাতীয়রা মেনে নিতে পারেনি।

ক্ষতিগ্রস্ত ৫,৬০৩টি পরিবারকে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের তিন একর জমি প্রদান করা হয় । যা ছিল তাদের হারানো সম্পত্তির অর্ধেক। পূনর্বাসন প্রক্রিয়ায় দেড়হাজার জুম্ম পরিবার বাদ পড়ে যায় । বেকার উপজাতিদের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের সরকারী উদ্যোগও সফল হয়নি । ফলে এই প্রকল্পের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উপজাতীয়দের আর্থ-সামাজিক জীবনে নেমে আসে বিরাট বিপর্যয় । কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে অনেক উপজাতি উদ্বাস্তু হয় । ফলে সৃষ্টি হয়েছিল ব্যাপক সামাজিক ক্ষোভ । পাকিস্তান আমলে তারা তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারেনি । ষাটের দশকে উপজাতীয়রা রাজনৈতিকভাবে প্রতিবাদ করতে না পারলেও সেই দুঃসহ স্মৃতি তারা কখনই ভুলতে পারেনি । তাই ১৯৮৪ সালের শেষের দিকে উজাতীয়দের কণ্ঠে শোনা যায়: I have not been able to construct a house like the one built by my ancestors and which is now under the water of the kapti lake . I now live in a makeshift thatched house. [১৬]

১৯৭৬ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যখন পার্বত্য অঞ্চলে যান তখনও তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন ঃ The vast expence of water captured by the Dam provides a scene which impresses every visitor with its beauty. But could anybody have thought that this immense body of water is to some extent filled with the tears of the local people ? Through the cables of the electric line not only current flows but also the nights of grief.[১৭]

১৯৫৩ সালে এশিয়ার সর্ববৃহৎ কাগজকল কর্ণফুলী পেপার মিল তৈরী করার ফলে মারমা জনগোষ্ঠী উদ্বাস্তু হয়, যেমনটি হয়েছিল চাকমারা কাপ্তাই বাঁধ তৈরীর ফলে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঁশ, নরম কাঠ ও

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য বনজ সম্পদ ছিল কর্ণফুলী কাগজ কলের প্রধান কাঁচামাল । এই মিলে তখন শুরু হয় পার্বত্য সম্পদের ব্যাপক ও একচেটিয়া ব্যবহার । কিন্তু পাহাড়িদের মাত্র শতকরা ১ ভাগকে চাকুরী দেয়া হয় সেই পেপার মিলে । তাছাড়া সেখানকার আদিবাসীদের সরিয়ে দেয়া হয় অন্যত্র । বর্তমানে যারা মিলের আশেপাশে বাস করছেন তাদের সকলেই অভিবাসী বাঙ্গালি । ফলে এসব কারণে উপজাতিদের মনে ক্ষোভ সঞ্চারিত হয় । জেনারেল ইব্রাহিমের মতে, "পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় গৃহীত শিল্পায়ন প্রক্রিয়া উপজাতীয়দের উৎসাহিত করার পরিবর্তে তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ারই জন্ম দিয়েছিল । ১৯৫২ সালে চন্দ্রঘোনায় বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কাগজকলকে উপজাতীয়রা মিশ্র দৃষ্টিতে দেখেছিল । প্রতিষ্ঠানটি বেসরকারী হওয়ার কারণে কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিকভাবেই অভিজ্ঞ শ্রমিক ও কর্মচারী নিয়োগ করতে চাইলেন, যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই অগ্রাধিকার পেল সমতলের লোকেরা । প্রকৃত সত্য ছিল এই যে, সে সময় উপজাতীয়দের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষিত লোক ও দক্ষ শ্রমিক পাওয়া ছিল খুবই দুষ্কর। উপজাতীয় শ্রমিকরা গভীর অরণ্য থেকে বাঁশ কাটার কাজ পেয়েছিল। সেক্ষেত্রেও মধ্যস্বত্বভোগী ছিল সমতলের অধিবাসীরা। তবে পাকিস্তান আমলে উপজাতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্ষোভের জন্ম দেয় কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প।"[১৮]

বস্তুত, পাকিস্তানি আমলে কাপ্তাই বাঁধ ও কর্ণফুলী কাগজকল যথাক্রমে চাকমা ও মায়নাদের উদ্বাস্তুতে পরিণত করেছিল । এ অঞ্চলের বনজ সম্পদের উপর উপজাতীয়দের একাধিপত্য ক্ষুন্ন করা হয়। ১৯৬৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম তার ' উপজাতীয় এলাকার' সাংবিধানিক মর্যাদা হারানোর ফলে উপজাতীয় সচেতন অগ্রসর শ্রেণী, ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় । আইয়ুব সরকারের এই সিদ্ধান্তকে তারা তাদের প্রতি চরম অবমাননাকর ও নিপীড়নমূলক ঘটনা বলে মনে করেন । ঐ সময়ে সৃষ্ট অসন্তোষের ফলে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন হাজার হাজার উপজাতি। সরকারীভাবে তখন বাঙ্গালি বসতি স্থাপন ও তাদেরকে সুবিধা প্রদান করা হয় । ১৯৪৭ সালে উপজাতি ও অ-উপজাতি জনসংখ্যার অনুপাত ছিল যেখানে ৯৭% ও অনুর্ধ্ব ৩ শতাংশ, সেখানে ১৯৭০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৮৫ ও ১৫ শতাংশে । ক্রমবর্ধমান অভিবাসন উপজাতীয়দের মনে শঙ্কার সৃষ্টি করেছিল । পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ ও শোষণ নির্যাতন মাত্রাতিরিক্ত হওয়ার ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তসহ সাধারণ উপজাতীয়দের মনে ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হতে থাকে । যার পরিণতি পরবর্তীকালে লক্ষ্য করা যায়। জেনারেল ইব্রাহিমের মতে, "পার্বত্য জনগণের বিদ্রোহের কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল, সেটি হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চলে অ-উপজাতি লোকদের অনুপ্রবেশ । বৃটিশ আমলে পার্বত্য

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রামে অ-উপজাতি তথা সমতলের বাঙালীদের অনুপ্রবেশ রোধে কতিপয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল, কিন্তু দেশ বিভাগের পর এতদঞ্চলে পর্যায়ক্রমে আধুনিকীকরণ তথা শিল্পায়ন প্রক্রিয়া শুরু হলে বাঙ্গালীদের অনুপ্রবেশ এ প্রক্রিয়ারই একটি অনুষঙ্গী ঘটনা হিসেবে দাঁড়ায় । চন্দ্রঘোনা কাগজকল, কাপ্তাই প্রকল্প, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, অফিস আদালত, স্কুল কলেজ প্রভৃতি নির্মাণ কাজ সমতলবাসীদের পার্বত্য অঞ্চলে নিয়ে আসে, সেই সাথে আগমন করে ছোট খাট ব্যবসায়ী, কৃষক প্রভৃতি শ্রেণীর লোকজন। পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে এবং ১৯৬৬ সালে দু'দফায় পাকিস্তান সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালীদের বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করে । ক্রমবর্ধিষ্ণু বাঙালী জনগণ উপজাতীয় সমাজ ও জীবন ধারায় ধীরে ধীরে প্রভাব ফেলতে থাকে । সবচেয়ে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াটি ছিল ভূমি সংক্রান্ত ইস্যুতে । কোন কোন ক্ষেত্রে অ-উপজাতীয়রা সরকারী বরাদ্দের চেয়ে অধিক জমি নিজেদের দখলে নিয়ে নেয় । জালিয়াতির মাধ্যমে সরকারী খাস জমি দখল করে নেয় এবং নামমাত্র মূল্যে উপজাতীয়দের জমিজমা কিনে নেয়। পার্বত্য অঞ্চলে চাষযোগ্য জমির সংকট, আবার উপজাতীয়রা সম্পূর্ণভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল, সেক্ষেত্রে জমি নিয়ে বিবাদ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পাহাড়ীরাও সাথে সাথে শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠতে থাকে" ।[১৯]

নানাভাবে নির্যাতিত পার্বত্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলি ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে এবং তাদের মনে পার্বত্য জাতীয়তাবাদের ধারণা জন্ম নেয় । কঠোর সামরিক শাসনের কারণে ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠীগুলি আন্দোলন করতে পারেনি । তাছাড়া ঐ সময় বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের দাবী এতই প্রবল ছিল যে অন্য দাবি বিকশিত হতে পারেনি ।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী কাল

শেখ মুজিব, জিয়া ও এরশাদ সরকারের শাসনামলে কিছু নীতি ও কার্য সচেতন শিক্ষিত পাহাড়ী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে আরো ক্ষুব্ধ করে তুলে । নিম্নে এসব সরকারের কিছু নীতি সম্বন্ধে আলোচিত হল যা অস্থিতিশীলতাকে আরও বেগবান ও প্রকট করে তুলে ।

'৬০-এর দশকে উপজাতীয়রা সংগঠিত না থাকায় বিভিন্ন দাবি দাওয়া ও সংগ্রাম সম্পর্কে তারা কোন সঠিক দিক নির্দেশনা পায়নি । উপজাতীয় ছাত্র যুবক নেতাদের অধিকাংশই উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে জড়িত ছিলেন । পার্বত্য রাজারা রাজ প্রাসাদে অবস্থান করছিলেন ।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ যখন সংসদ এবং অন্যান্য ফোরামে অতীতের শোষণ ও নির্যাতন সম্বন্ধে বক্তব্য রাখছিলেন এবং নিজেদেরকে স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বা হিসেবে বিকশিত করতে

Dhaka University Institutional Repository

চাচ্ছিলেন তখনই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সবার নজরে আসে । তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব তাদেরকে 'বাঙালি হয়ে যাবার পরামর্শ' দেয়ায় এবং বিভিন্ন দাবি প্রত্যাখান করায় তারা ক্রমেই আত্মসচেতন হয়ে উঠছিলেন । এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে চাকমা রাজা পাকিস্তানের সহযোগিতা করেছিলেন । পাকিস্তান সরকারের সাথে সম্পর্ক ভাল থাকায় রাজা ত্রিদিব রায় সাধারণ উপজাতীয়দের রাজাকার বাহিনীতে যোগদানের পরামর্শ দিয়েছিলেন । পাকিস্তান সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য মৌজার সব যুবকেরা যাতে রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেয়, এই নির্দেশ তিনি হেডম্যানকে দিয়েছিলেন। ফলে রাজাকার বাহিনীতে কয়েক হাজার চাকমা যুবক যোগ দেয় ।[২০] তাই স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতার পর উপজাতীয়রা মুক্তিবাহিনীর রোষাণলে পড়ায় নেয়া হয় নানা প্রতিশোধ । ফলে সেই সময়টিতে তারা স্বাধীনতা উচ্ছ্বাসের সাথে উপভোগ করতে পারেনি । ১৯৭১ সালের ৫ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ১৬ জন উপজাতীয়কে হত্যা করে । অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল দীঘিনালা ও বরকলে । ১৯৭১ এর পুরো ডিসেম্বর মাস জুড়েই বিভিন্ন প্রতিশোধমূলক ঘটনা ঘটতে থাকে । উপজাতীয়দের উপর হামলা ঠেকাতে তৎকালীন সরকার ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারেনি । এমনকি সরকার মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী উপজাতীয়দের স্বীকৃতিও দেয়নি যেমন ঃ বনবিক্রম ত্রিপুরা ও অশোকমিত্র কারবারি নামে দু'জন উপজাতি বীর মুক্তিযোদ্ধাকে বীরত্বসূচক জাতীয় পদক দেয়া হয়নি ।[২১]

১৯৭২ সালের ২৯ জানুয়ারি চারু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি শেখ মুজিবের সাথে দেখা করে যুদ্ধপরবর্তীকালে উপজাতীয়দের উপর আক্রমণ বন্ধ করার জন্য তাঁর হস্তক্ষেপ কামনা করেছিলেন । কিন্তু শেখ মুজিব তার আবেদনকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে বলেছিলেন যুদ্ধের পর এমন ঘটনা খুবই স্বাভাবিক।[২২] উপজাতীয়রা তাদের উপর নেয়া প্রতিশোধকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে মেনে না নিয়ে এর প্রতিকারের জন্য নিজেরাই উদ্যোগ গ্রহণ করে । পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর জঙ্গলে ফেলে যাওয়া অস্ত্র দিয়ে তারা বাঙ্গালিদের প্রতিরোধ করেছিলেন এবং বিকল্প প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । গ্রামে গ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়ার জন্যই তাদের নাম হয়ে যায় শান্তিবাহিনী । অশীষ নন্দী এই ঘটনার দুটি দিক তুলে ধরেছেন। যেমন ঃ উপজাতীয়দের অস্ত্র গ্রহণের উদ্যোগ প্রমাণ করে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের ব্যর্থতা এবং শান্তিবাহিনী গঠন প্রক্রিয়ায় উপজাতীয়দের মধ্যে একাত্মতা জন্মায় ।[২৩]

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উপজাতীয় প্রতিনিধিদল যে দাবীনামা পেশ করেছিলেন তার প্রেক্ষিতে শেখ মুজিব যুক্তি দেখান যে তাদের দাবী মেনে নিলে জাতিগত অনুভূতি বৃদ্ধি পাবে এবং অখণ্ড জাতীয় সংহতির প্রয়োজনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির অস্তিত্ববোধ না থাকাকেই তিনি শ্রেয় মনে করেন। তাছাড়া তিনি

Dhaka University Institutional Repository

তাদেরকে বাঙালী জাতীয়তাবাদের আদর্শে নিজেদের অস্তিত্ব বিকাশ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন । দাবী মেনে না নেয়ার চেয়েও প্রতিনিধিরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তাদেরকে জাতিগত অস্তিত্ব বিলোপ করতে বলায় ।

১৯৭৩ সালে শেখ মুজিব রাঙামাটি সফরকালে এক জনসভায় বলেছিলেন ঃ "From this day onward the tribles are being promoted into Bengalies."[২৪] শেখ মুজিবের এই বক্তব্য উপজাতীয়দের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল । তারা অনুধাবন করেছিল যে তাদের অস্তিত্ব বিলোপ করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে । তাই উপজাতীয় ছাত্র সমিতি এই ভাবণকে পুঁজি করে জনগণকে মুক্তি সংগ্রামে একত্রিত হওয়ার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বত্র প্রচারণা চালাতে থাকে ।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও যখন উপজাতীয়দের উপর থেকে নিপীড়ন নির্যাতন বন্ধ হয়নি তখন তারা বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাদের দাবিগুলো সরকারের দৃষ্টিগোচর করার জন্য । প্রথমেই তারা বিদ্রোহের পথ বেছে নিয়েছিলেন একথা বলা যায়না । বাঙালি রাষ্ট্রকাঠামো এবং নিজস্ব সংস্কৃতি ও জাতীয়তা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার তারা চেয়েছিলেন । কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে বাঙালি হয়ে যাবার পরামর্শ দেয়ায় তাদের মধ্যে ক্ষোভ ও দ্বন্দ্ব দেখা দেয় ।

আধুনিক চেতনামনস্ক সচেতন শিক্ষিত শ্রেণীই সব সময় নেতৃত্ব দেয় । পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রেও আমরা তাই দেখতে পাই । পাহাড়ি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে যারা শিক্ষিত হয়েছিলেন পরবর্তীতে তারাই ক্ষোভ প্রকাশ করতে নেতৃত্বদানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন । যেমন ঃ সংসদ সদস্য ও উপজাতীয় নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা খসড়া সংবিধান সম্বন্ধে আলোচনার সময় ক্রুদ্ধস্বরেই বলেছিলেনঃ " আমি একজন চাকমা। একজন মারমা কখনও চাকমা হতে পারেনা, একজন চাকমা কখনো ম্রো হতে পারে না এবং একজন চাকমা কখনো বাঙ্গালি হতে পারে না। আমি চাকমা। আমি বাঙ্গালী নই । আমি বাংলাদেশের একজন নাগরিক, বাংলাদেশী। আপনারাও বাংলাদেশী, তবে জাতি হিসেবে আপনারা বাঙ্গালী । উপজাতীয়রা কখনও বাঙ্গালী হতে পারে না " ।[২৫]

জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে ১৯৭৩ সালে তিনি আরো বলেছিলেন ঃ

"I come from an economically backward region of Bangladesh...... During the British and Pakistan period we were treated like object of 200 ... in the new state of Bangladesh we had expected a change in our fate ... but to our utter dismay this budget has made no provision for our development .... I don't forsee any change in our fate'.[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীন বাংলাদেশে ' উপজাতীয়রা বৃটিশ ও পাকিস্তানি শোষণের অবসান এবং পরিবর্তন আশা করেছিলেন । কিন্তু তৎকালীন সরকারের কার্যক্রমে তাদের সে আশা ব্যর্থ হয়। জাতীয় সংসদে তারা এ হতাশার কথা উল্লেখ করে গেছেন। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশে পার্বত্য জনগণ তাদের দাবী দাওয়ার ব্যাপারে সরকারকে যথেষ্ট সাহায্যকারী ও আগ্রহী হিসেবে না পাওয়ায় তারা মনে করেন যুদ্ধ পরবর্তী সরকার তাদেরকে কোণঠাসা করে রেখেছিল প্রবল বাঙালি জাতীয়তাবাদের আদর্শের রাষ্ট্রীয় চর্চার মাধ্যমে[২৭]। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় যে যুদ্ধ বিধ্বস্ত স্বাধীন দেশ পুনর্গঠনে অধিক মনোযোগী হওয়ায় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর আশা আকাংখা ও নানা সমস্যার প্রতি যথোচিত নজর দেয়া শেখ মুজিবের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

পার্বত্য এলাকায় জিয়াউর রহমান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙ্গালি বহিরাগতদের পুনর্বাসন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় । এরশাদ সরকারের সময়ে উপজাতি ও বহিরাগত বাঙ্গালি লোকসংখ্যার অনুপাত ৫০ঃ৫০ এসে দাঁড়ায় (CHT Report 1991) । শুরু হয় হত্যা-প্রতিহত্যা, আক্রমণ প্রতি আক্রমণ; লুণ্ঠন নির্যাতন সন্ত্রাস ইত্যাদি । ফলে পার্বত্য এলাকা অশান্ত হয়ে উঠে । লেনিনের মতে, ' বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আড়ালে সেই পুরনো পাকিস্তানি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এবং এইভাবে বাঙালি অভিবাসনের মাধ্যমে জনসংখ্যানুপাতকে অনুকূলে আনার প্রচেষ্টা তীব্রতর করে তোলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে । পার্বত্য ভূমিতে বাঙ্গালি অভিবাসন প্রক্রিয়া আগুনে ঘৃতাহুতি ছাড়া আর কিছুই ছিলনা।[২৮]

হারুন-উর রশীদের মতে, 'পার্বত্য সমস্যা মোকাবেলায় জিয়াউর রহমান অনুসরণ করেছিলেন 'carrot and stick' নীতি। এ নীতির অংশ হিসেবে একদিকে তিনি ঐ অঞ্চলের সেনাবাহিনীর 'জিওসি' চেয়ারম্যান করে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড' (CHTDB) গঠন বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতি ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষণ, ট্রাইবাল কালচারাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, উপজাতীয়দের মধ্য থেকে (বিনিতা রায়, সুবিমল দেওয়ান, অংশু প্রু চৌধুরী) সরকারের উপদেষ্টা/মন্ত্রী নিয়োগ, রাজা ত্রিদিব রায়ের ছেলে দেবাশীষ রায়কে চাকমাদের রাজা হিসেবে অধিষ্ঠিত করা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। অপরদিকে প্রতিরোধক/প্রতিশোধক ব্যবস্থা হিসেবে উপজাতীয়দের গুচ্ছগ্রামে বসতি, সামরিক বাহিনীসহ অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি জোরদার, প্রচুর সংখ্যক সেনাছাউনি বা অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন, পরিকল্পিতভাবে নতুন বাঙ্গালি বসতি স্থাপন ও উদ্যোগ এবং উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে নানা উপায়ে বিভেদ ও ভাঙ্গণ সৃষ্টি - এ সবের আশ্রয় নেন'।[২৯]

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে জিয়াউর রহমানের নীতি ছিল অর্থনৈতিক কূটনৈতিক, সামরিক ও প্রশাসনিক উদ্যোগের সমন্বয় - কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান হয়নি । এরশাদ সরকারের সময় পার্বত্য

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম নীতি পরিবর্তিত না হলেও হুবহু তাঁর মডেল অনুসৃত হয়নি । এরশাদ শান্তিবাহিনীতে ভাঙ্গণ, উপদলীয় কোন্দল সৃষ্টি, ভীতি ও ক্ষমার দ্বৈত চর্চা প্রভৃতি নীতি নিয়েছিলেন । জিয়া সরকারের নীতি জাতীয় স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে হলেও তা ছিল অমানবিক।

উপজাতীয়রা যাতে বিদ্রোহ না করে সেজন্য জেনারেল জিয়া উপজাতি সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে না দেখে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন । ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন । কিন্তু আন্দোলনরত উপজাতীয়রা সরকারের এ উদ্যোগ সমর্থন না করায় পার্বত্য অঞ্চলে অশান্তি নেমে আসে ।

লেনিনের ভাষায়, "বাংলাদেশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে সর্বপ্রথম রক্তাক্ত সংঘাতের দিকে ঠেলে দেন জেনারেল জিয়া । তিনিই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা না করে ১৯৭৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপকভাবে বাঙালি অভিবাসন প্রক্রিয়া শুরু করেন । তাঁরই সভাপতিত্বে ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত এক গোপন বৈঠকে ৩০ হাজার বাঙালি পরিবারকে পার্বত্য অঞ্চলে পুনর্বাসিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং এর জন্য বরাদ্দ করা হয় ৬৫ কোটি টাকাও । ১ লক্ষ বাঙালি পরিবারের প্রতিটিকে ১৯৮১ সালে ৫ একর জমি ও নগদ ৩ হাজার ৬ শত টাকা দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত বাঙালির সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লক্ষেরও বেশী । নদী ভাঙ্গনের শিকার, ঘর-জমি ভিটে-মাটি হারা দুই লক্ষাধিক প্রান্তিক মেহনতি মানুষকে 'গুচ্ছগ্রামে' পুনর্বাসনের নামে ঠেলে দেয়া হয় তোপের মুখে । এক সরকারি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ১৯৭৪ সালে পাহাড়ি বাঙ্গালি জনসংখ্যার অনুপাত যেখানে শতকরা ৭৩ এবং ২৪ ভাগ ছিল, ১৯৮১ সালে সেখানে সেই অনুপাত এসে দাঁড়ায় শতকরা ৬০ এবং ৪০ ভাগে । জেনারেল জিয়ার এই নীতি পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে সংখ্যাগত ভারসাম্য আনতে সক্ষম হলেও পাহাড়িদের সশস্ত্র আন্দোলন বা ইনসার্জেন্সি বন্ধে পালন করতে পারেনি সামান্যতম ভূমিকাও । বরং তাকে করে তোলে আরও ব্যাপক ও তীব্রতর"।[৩০]

এরশাদ সরকারের সময়েও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই সরকারের সময়েও বিদ্যুৎ যোগাযোগ ব্যবস্থা, টেলিযোগাযোগ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি খাতে বিপুল বরাদ্দ ও উন্নয়ন সাধন করা হয়। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের বরাদ্দের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া হয় । তবে এসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে উপজাতীয়দের চেয়ে বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালীরা লাভবান হয়েছিল কারণ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা প্রভাব বিস্তার করে তাদের পক্ষে নিয়েছিল । তাই উপজাতীয়রা মনে করেন প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হলেও তাদের উপকারে আসেনি আর পথঘাট যা করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে, তা উপজাতীয়দের জন্যে নয়, সামরিক বাহিনীর জন্য। বিভিন্ন সময়ে শোষণের ফলে উপজাতীয়দের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল নানাভাবে । জেনারেল ইব্রাহিমের ভাষায়, পার্বত্য ভূমির অনুকূল অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে শান্তিবাহিনী গেরিলা তৎপরতার কৌশল গ্রহণ করে।[৩১] সাধারণভাবে তৎপরতা ছিল নিম্নরূপ ঃ (ক) জলে ও স্থলে নিরাপত্তা বাহিনীর উপর ঝটিকা আক্রমণ (খ) বাঙ্গালী গ্রাম ও নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্পসমূহে আক্রমণ ও আগুন দেয়া। (গ) অ-উপজাতীয় সদস্য এবং শান্তিবাহিনী বিরোধী উপজাতীয়দের হত্যা। (ঘ) সরকারী কর্মকর্তা ও গুরুত্বপূর্ণ উপজাতীয় নাগরিকদের মুক্তিপণ আদায়ের লক্ষ্যে হত্যা (ঙ) নাশকতামূলক কার্যক্রম যেমন- বৈদ্যুতিক স্থাপনা ধ্বংস, ব্রীজ, কালভার্ট, রাস্তাঘাট, বনজসম্পদ আহরণের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ধ্বংস (চ) জল ও স্থলের যানবাহনে অগ্নিসংযোগ (ছ) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে ব্যাপকহারে উপজাতীয় শরণার্থী ভারতে প্রেরণ ।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ঃ

বাংলাদেশে স্বাধীন হবার পর বিভিন্ন সরকারের কিছু নীতির কারণে পার্বত্য অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়।

নিম্নে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার উদাহরণ তুলে ধরা হল -

সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল জুড়েই শান্তিবাহিনীর গোপন নেটওয়ার্ক বিস্তার লাভ করেছিল। ১৯৭৪ সালে প্রথম শান্তিবাহিনী একদল পুলিশের উপর আক্রমণ চালালে বেশ কজন পুলিশ আহত হয়। ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শান্তিবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীণ অরণ্যে সামরিক বাহিনীর বিচ্ছিন্ন ক্যাম্পে আক্রমণ করলে সেনা সদস্যরা আক্রান্ত হয় । ১৯৭৭ সালে রাতে হামলা চালিয়ে সেনা প্রকৌশল বিভাগের সদস্যদের হত্যা করা হয়। (এই ঘটনার পর পার্বত্য অঞ্চলে সেনা মোতায়েনের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানিয়েছিল।) তাছাড়া নির্মাণ সামগ্রী ধ্বংস ও অস্ত্র-গোলাবারুদ ইত্যাদি লুট করে নিয়ে যায় । শান্তিবাহিনী সরকারী স্থাপনা ও বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের গ্রামগুলোর উপর আক্রমণ চালাতে থাকে । গভীর জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক বাঙ্গালী অভিবাসী প্রাণ হারায়। ১৯৮০ সালের ২৫ মার্চ রাঙ্গামাটির কালামপানি গ্রামে নৃশংস হামলা চালিয়ে কমপক্ষে ১০০ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করে । তৎকালীন সংসদ সদস্য শাজাহান সিরাজ, রাশেদ খান মেনন ও উপেন্দ্রলাল চাকমা সরেজমিনে দেখে এসে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন।[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

৮০'-র দশকে শান্তিবাহিনীর বিদ্রোহী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় জেনারেল জিয়াউর রহমান শান্তিবাহিনীকে কঠোরভাবে দমন করার জন্য প্রায় একলাখ সৈন্য মোতায়েন করেছিলেন এবং সেনা মোতায়েনকে জাতিগঠনের কার্যক্রম বলে উল্লেখ করা হয় । এর ফলে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দের পাশাপাশি সেনাব্যয়ও বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল । শান্তিবাহিনীর বর্বরতা ও নৃশংসতার ভয়াল আক্রমণের শিকার হন সেনাবাহিনীর সহযোগী অবাঙ্গালিরাও । তারা অপহরণ করেছিল বাঙ্গালি সরকারি কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের। ১৯ জানুয়ারি, ১৯৮৪ সালে শেল তেল কোম্পানীর ৫ জন বিশেষজ্ঞকে অপহরণ করলে বিপুল পরিমাণ মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে ছাড়িয়ে আনতে হয়। ১৯৯৭ সালের মে মাসে অপহরণ করেছিল থানচির থানা নির্বাহীকে । ১৯৮০-৮১ সালে তারা ৯৫২ জন বাঙ্গালি ও ১৮৮ জন পাহাড়িকে হত্যা করে, ৬২৬ জন বাঙ্গালি ও ১৫২ জন অবাঙালিকে জখম এবং ৪১১ জন বাঙ্গালি ও ২০৫ জন অবাঙ্গালিকে অপহরণ করেছিল।

তাছাড়া শান্তিবাহিনী সেতু ধ্বংস, বিদ্যুতের তার বিচ্ছিন্ন করা ছাড়াও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে উপজাতীয়দের শরণার্থীরূপে ভারতে যেতে বাধ্য করেছিল ।[৩৩]

পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৯৭ সালের মে মাস পর্যন্ত মারা যায় ১৭ জন সৈনিক, ৯৬ জন বিডিআর আর ৪১ জন পুলিশ এবং আহত হয় ৩৭৩ জন। অসামরিকদের মধ্যে বাঙ্গালী ১০৫৪ জন, উপজাতীয় ২৩৭ জন মারা যায় এবং আহত হয় ৫৮৭ জন বাঙ্গালি, ১৮১ জন উপজাতীয়; অপহৃত হয়েছিল ৪৬১জন বাঙ্গালি আর ২৮০ জন উপজাতীয় ।[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮০-১৯৯১ সাল পর্যন্ত শান্তিবাহিনীর হাতে অসামরিক উপজাতি ও বাঙালি যারা হতাহত এবং অপহৃত হয়েছে তাদের একটি তালিকা নিম্নের সারণীতে তুলে ধরা হল ।

সারনী ৪.৭ ঃ অপহৃত ও হতাহত অসামরিক উপজাতি ও বাঙালির তালিকা

	নিহত		আহত		অপহরণ	
সময়	বাঙালি	উপজাতীয়	বাঙালি	উপজাতীয়	বাঙালি	উপজাতীয়
১৯৮০	৮৭	৮	৭৫	৫	৫৭	৭
১৯৮১	৪২	২	২৮	২	৩	১২
১৯৮২	১৬	৭	২০	-	৫১	১৮
১৯৮৩	৮	-	৮	৩	১৫	১
১৯৮৪	১০৮	৭	৪৫	৮	১৮	২৭
১৯৮৫	১১	১৪	১৯	৮	২৫	১৯
১৯৮৬	২৪৮	৩৩	১১৮	১৬	৩৩	৪
১৯৮৭	১১৭	১৯	৬৭	৯	১৭	৮
১৯৮৮	১২৮	১৬	৬৫	১৪	১৩১	২৭
১৯৮৯	৭২	৪৭	১৩৮	৫৭	২২	২৮
১৯৯০	৪৭	২০	৩৮	১২	১৮	২২
১৯৯১	৬৮	১৫	৩৬	১৮	২১	৩২
মোট	৯৫২	১৮৮	৬৫৬	১৫১	৪১১	২০৫

উৎস ঃ নূহ-উল আলম লেনিন, *পার্বত্য চট্টগ্রাম সমুখে শান্তি পারাবার*, ঢাকা : হাক্কানী প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.৮

নিরাপত্তা বাহিনীর অপারেশনে নিহত, আহত এবং গ্রেফতারকৃত শান্তিবাহিনীর তালিকা।

বৎসর	নিহত	আহত	গ্রেপ্তারকৃত
১৯৭৯ পর্যন্ত	৫২	০৪	-
১৯৮০	২৩	১৫	-
১৯৮১	০৮	০৫	-
১৯৮২	০৮	০৭	-
১৯৮৩	০৩	-	-
১৯৮৪	২১	১০	-
১৯৮৫	১১	০৫	-
১৯৮৬	০৫	০২	২৯৯
১৯৮৭	১০	০৮	২৫৪
১৯৮৮	০৯	০২	৩০১
১৯৮৯	২৯	০৫	৩৯০
১৯৯০	৪০	০৮	৩৫৫
১৯৯১ (৩০ নভেম্বর পর্যন্ত)	১৭	১৩	২৯৩
মোট	২৩৬	৮৪	১৮৯২

সূত্র ঃ সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, *পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতির মূল্যায়ন*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১, পৃ. ১২৯

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৪.৯

শান্তিবাহিনীর নিকট থেকে বিভিন্ন সময়ে উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদের তালিকা ঃ

বৎসর	এলএমজি	এসএমজি	মাইক্রো	পিরুল	এসবিবিএল/ সিভিল বন্দুক	গ্রেনেড	মর্টার	অ্যামুনিশন	মাইন
১৯৭৮	০১	০৪	৩৭	০৪	০৬	০৪	-	১৯৯৯	-
১৯৭৯	০২	০৪	০৮	-	১১	০৬	-	৮৯৮	-
১৯৮০	-	০৬	২১	০৪	২৪	১১	-	২৮০৮	-
১৯৮১	০৩	০২	২৪	-	১৩	০৩	-	২৫২০	-
১৯৮২	-	০৬	১৭	০১	১১	০২	-	১৮৩৮	-
১৯৮৩	-	০৫	২৪	-	২৮	০৬	-	১৬২৬২৩	-
১৯৮৪	০৫	৩০	৪৩	০২	২৩	১৬	০১	৩৩২১১	-
১৯৮৫	২০	৪২	১৩৪	০৩	৮৫	৯৯	০২	১৪৮১৮	-
১৯৮৬	-	০৫	০৫	০১	৩৭	৫৭	-	৩৯১২৭	-
১৯৮৭	-	০৯	০৮	-	১৯	০৪	-	১৭০৫	-
১৯৮৮	০১	১১	০৪	-	২৬	১০	-	১৯৫৮	-
১৯৮৯	০২	১৪	২১	১০	৬৫	১৪	০৭	২৯১৩৬	-
১৯৯০	-	১১	২৭	০৭	৯৮	১৭	-	৩৪৩৫	০২
১৯৯১ নভেম্বর পর্যন্ত	-	১৬	১৯	০৫	৬২	৪৯	৫৪	৩০৩০	০১
মোট	৩৪	১৬৫	৩৯২	৩৭	৫০৮	২৯৮	৬৪	২৯৯১০৬	০৩

সূত্র ঃ সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, *পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতির মূল্যায়ন*, ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০১, পৃ. ১২৯

জেনারেল জিয়ার আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালি অভিবাসন প্রক্রিয়া ও সেনাবাহিনীর সক্রিয় তৎপরতা উপজাতীয় জনগণের বিপুল অংশকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল । ফলে তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ জন্মায় যা তাদের সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতি আকৃষ্ট করে । উল্লেখ্য এ সময় উপজাতীয়দের এক বিপুল অংশ দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেয় । পরবর্তীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ একটি জটিল জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নূহ-উল আলম লেনিনের ভাষায়, "১৯৭৬ সাল থেকে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র বিদ্রোহ বা ইনসার্জেন্সি সূচনা হয়। গোড়ার দিকে শান্তিবাহিনীর তৎপরতা সীমিত ছিল থানা আক্রমণ করে, অস্ত্রশস্ত্র লুট, পুল কালভার্ট ও সরকারি সম্পত্তির ক্ষতিসাধন এবং বিত্তশালী লোকজন ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করার ভেতরই।

ইনসার্জেন্সি দমনে জেনারেল জিয়াউর রহমান গ্রহণ করেন সামরিক পন্থা। ফলে পরিস্থিতি ধারণ করে আরও জটিলরূপ। সমগ্র দেশের এক দশমাংশ এলাকা জুড়ে সৃষ্টি হয় যুদ্ধাবস্থার। একদিকে যেমন বিদ্রোহীদের ক্রমবর্ধমান গেরিলা হামলা, অন্যদিকে তেমনি বিদ্রোহ দমনে সামরিক অভিযান। পরিণতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্ত জনপদ হত্যা, ধ্বংস, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ এবং স্বামী সন্তানহারা মা-বোনসহ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার ক্রন্দন আর আহাজারিতে ভারি হয়ে উঠে এবং এটাতো স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার যে, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা কোন নৈতিকতা মানেনা। ফৌজি শাসক জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে নিছক একটি অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবেই বিবেচনা করেন। তাঁর ও তার উত্তরসুরি জেনারেল এরশাদ উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পাকিস্তানি শাসকদের মতোই সাম্প্রদায়িকতা ও বৃহৎ জাতিসুলভ মনোভাবে আচ্ছন্ন। অন্যদিকে জনসংহতি সমিতি ও শান্তিবাহিনীর নেতৃবৃন্দ বিশেষত মানবেন্দ্রনারায়ণ লারমার ১৩টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতি সমন্বয়ে 'জুম্ম জাতীয়তাবাদ' এর ধারণাও ছিল হটকারি এবং দেশের বাস্তবতার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ"।[৩৫]

পার্বত্য চট্টগ্রামের অভিবাসিত বাঙ্গালিরা শান্তিবাহিনী কর্তৃক নিগৃহীত,অপহৃত এবং আহত, নিহত হওয়া সত্ত্বেও উপজাতীয়দের বিচ্ছিন্নতাবোধকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত থেকেছে । যাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্নকরণের পথে কার্যকর বাধা হিসেবে দেখা যায়।

উপরের সামগ্রিক আলোচনা পর্যালোচনা করে ক্ষোভ, দ্বন্দ্ব, বিদ্রোহ ও অস্থিতিশীলতার উৎস হিসেবে নিম্নলিখিত কারণগুলোকে অভিহিত করা যেতে পারে ।

(১) পাকিস্তান আমলে কাপ্তাই বাঁধ ও কর্ণফুলী কাগজকল স্থাপনের ফলে যথাক্রমে চাকমা ও মারমাদের উদ্বাস্তু হওয়া এবং উদ্বাস্তুদের যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পূণর্বাসনের ব্যবস্থা না করে বাঙ্গালি অভিবাসন বৃদ্ধির ফলে পাহাড়ীদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ বৃদ্ধি পায় ।

(২) অভিবাসীদের শোষণ, প্রবঞ্চনা ও হঠকারিতায় পাহাড়িদের মনে অবিশ্বাসের বীজ জন্ম নেয় এবং ক্রমান্বয়ে তা প্রকট হতে থাকে । যা পরবর্তীতে সশস্ত্র রূপ নেয় ।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি নিধনের ফলে তাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হয় এবং শেখ মুজিবের পাহাড়িদের বাঙ্গালি হয়ে যাবার পরামর্শ দানের ফলে তাদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করেছিল ।

(৪) সংবিধানে পার্বত্য বিষয়ক নীরবতায় পাহাড়ীদের মনে বঞ্চিত হবার ধারণা জন্মনেয় এবং সাংবিধানিক পথে উত্থাপিত পাহাড়িদের দাবীকে গুরুত্ব না দেয়ার ফলে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে ।

(৫) পার্বত্য অঞ্চলে তিনটি সেনানিবাস স্থাপনের ফলে পাহাড়িদের মধ্যে আত্মরক্ষার ভাবনা জন্ম নেয় ।

আর উপরোক্ত কারণের ফলে পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন, স্থিতিশীলতা এবং জাতীয়সংহতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, এক পর্যায়ে পাহাড়ীদের মধ্যেও কোন্দলের সৃষ্টি হয়েছিল । দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ক্ষোভের পরিণামে পার্বত্য অঞ্চল পরিস্থিতি কত জটিল রূপ ধারণ করেছিল তা উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে অনুধাবন করা যায় ।

আধুনিকীকরণ যে নতুন গোষ্ঠীচেতনা জাগ্রত করে এবং অধিকার আদায় ও অবস্থার পরিবর্তনের জন্য প্রতিবাদী করে তুলে তা এ অধ্যায়ের আলোচনা থেকে অনুধাবন করা যায় ।

400909

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ :

১. মাহফুজ পারভেজ, *বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি*, ঢাকা: সন্দেশ প্রকাশনা,১৯৯৯, পৃ. ২৫-২৬

২. নূহ-উল-আলম লেনিন, *পার্বত্য চট্টগ্রাম সমুখে শান্তি পারাবার*, ঢাকা : হাক্কানী প্রকাশনী, অক্টোবর, ১৯৯৯, পৃ. ২৬

৩. সুগত চাকমা, *পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি*, পৃ. ৪৬

৪. Mizanur Rahman Shelly, *The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh*, Centre for Development Research, Bangladesh 1992, p. 57

৫. Ibid. p. 58

৬. সুগত চাকমা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১

৭. Shelly, op. cit., p. 62

৮. নূহ-উল আলম লেনিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

৯. মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীর প্রতীক, *পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ-পরিস্থিতির মূল্যায়ন*, ঢাকা : প্রকাশক মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারি, ২০০১, পৃ. ২৮

১০. নূহ-উল-আলম লেনিন ঃ পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯

১১. আহমদ ছফা ঃ ১৯৯৮ *শান্তিচুক্তি ও নির্বাচিত নিবন্ধ*, ইনফো পাবলিকেশন্স, ঢাকা ।

১২. S. Mahmud Ali : *The Fearful State*, p. 174

১৩. Ibid. p. 174

১৪. তেভিত সোফার 'পপুলেশন ডিজলোকেশন ইন দ্য হিল ট্র্যাক্টস', *দি জিওগ্রাফিক্যাল রিভিউ*, ৫৩, (১৯৬৪), পৃ. ৩৩৭-৩৬২

১৫. *ফার ইষ্টার্ণ ইকোনমিক রিভিউ*, ১০ এপ্রিল, ১৯৮১

১৬. Syed Anwar Hossian, "Religion and Etnniety in Bangladesh Politics," BIISS Journal, 1991, (Vol 12, No. 4): Dhaka

১৭. মোঃ নুরুল আমিন ও অন্যান্য, 'পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সমস্যার একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা* ১৯৯২, (সংখ্যা ৪২), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা : পৃ.১৪০

১৮. জেনারেল ইবরাহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২

১৯. জেনারেল ইবরাহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪-৮৫

২০ ইবরাহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

২১. সিদ্ধার্থ চাকমা, *প্রসঙ্গ পাবত্য চট্টগ্রাম*, নাথ ব্রাদার্স, ১৯৮৬, কলকাতা : পৃ. ৪৭

২২. Amena Mohsin, *The Politics of Nationalism: The case of Chittagong Hill Tracts*, Bangladesh, UPL Dhaka, 1997, p. 105

২৩. Asish Nandy : *The Intimate Enemy : Lossand Recovery of Self Hunder Colonialism*, Oxford University Press, 1983, Delhi, p. XV

২৪. সিদ্ধার্থ চাকমা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

২৫. হুমায়ুন আজাদ, *পার্বত্য চট্টগ্রাম ঃ সবুজ পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হিংসার ঝরণাধারা*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ১৮-১৯

২৬. Parliament Debate 1973, 662-663

২৭. Mohsin, op. cit., p.

২৮. নূহ-উল-আলম লেনিন , পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

২৯. হারুন-অর-রশীদ,'জাতীয় সংহতির প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপ', দৈনিক জনকণ্ঠ (১৭-২০ জুলাই)

৩০. নূহ-উল আলম লেনিন , পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২-৭৩

৩১. জেনারেল ইবরাহিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮

৩২. Obserber, 23 April, 1980

৩৩. Shelly ,op. cit., p. 124

৩৪. হুমায়ুন আজাদ, ১৯৯৭, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

৩৫. লেনিন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় ৫

কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকীকরণ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

"ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট"

ভূমিকা ঃ বর্তমান প্রেক্ষাপটে কৃষকদের প্রতিবাদি ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও অতীতে বিভিন্ন শোষণের ক্ষেত্রে কৃষকরা জোর আন্দোলন তৎপরতা চালিয়েছিল। বাঙলায় বহুযুগধরে বিভিন্ন আমলে কৃষিক্ষেত্রে শোষণ হয়েছে। এসব নানাধরনের শোষণ ও নির্যাতনের ফলে কৃষক সমাজ দারিদ্র শ্রেণীতে পরিণত হয়। ক্রমাগত দারিদ্র, হতাশা থেকেই কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। এর ফলে পরবর্তীতে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং বিদ্রোহ দেখা দেয়। কৃষকরা বিদ্রোহী ভূমিকা পালন করায় তৎকালীন বাংলার পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে উঠে। নিম্নে বিভিন্ন আমলেব কৃষকদেব উপর যে অত্যাচাব, অন্যায় নির্যাতন, শোষণ হয় এবং তার ফলে কৃষকরা বিদ্রোহী হয়ে যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তা নিয়ে আলোচনা করা হল -

এই অঞ্চলের চৌদ্দ'শ বছরেব ইতিহাস হল স্বাধীন সামন্ততান্ত্রিক বাংলার ইতিহাস। তখন বাংলার শাসন ক্ষমতায় ছিলেন সামন্ত প্রভুরা। তখন গ্রামগুলোর উৎপাদন ছিল সামন্তপ্রভুদের ভোগের জন্য উৎপাদিত। তখনকার গ্রামগুলো ছিল অনাড়ম্বর, স্পন্দনহীন এবং অনড়। সমাজের সৃজনশীল অংশ কৃষকদের অবস্থা ছিল জীবনমৃত, তাদের জীবন ছিল দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র, বেকার ও ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ে বিপর্যস্ত । তখনকার দিনে গ্রামের একমাত্র অর্থনৈতিক সম্পদ ছিল কৃষকদের পরিশ্রমে উৎপাদিত খাদ্য ও কৃষিজাত দ্রব্য । কৃষকের জমির ওপর কোন মালিকানা স্বত্ব ছিলনা । কৃষকদের দায়িত্ব ছিল দুটি - (১) জমি চাষ করা ও (২) রাজাকে ফসলের অংশবিশেষ দেয়া । উৎপাদিত ফসলের একটা অংশ দিতে হত রাজাকে কারন তিনি প্রজাদের প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন ।

কৃষক ও কারিগরদের ওপর তৎকালীন সামন্তপ্রভু ও জমিদাররা অকথ্য শোষণ ও নির্যাতন চালাত। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের একটা বড় অংশ জমিদারদের গোলায় তুলে দিয়ে আসত । গ্রামের মোড়লরাও অত্যাচাব করত কৃষকদের উপর।কৃষকদের ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল না। রাষ্ট্রীয় আইনানুযায়ী সামন্তপ্রভুরা কৃষকদের মস্তক কাটার অধিকার পেয়েছিল । যারা খাজনা দিতে পারতোনা তাদেরকে জমি থেকে উৎখাত করা হত এবং তাদের স্ত্রী পুত্র ও কন্যাদের ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করা হত ।

তৎকালীন রাজা জমিদার জায়গীরদারদের উৎপাদনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকলেও খাজনা আদায় করে তাঁরা অপর্যাপ্ত ধনসম্পদের মালিক হয়েছিল । তারা ঐশ্বর্যের মধ্যে দিন কাটাত আর সাধারণ

Dhaka University Institutional Repository

প্রজাকে চরম দারিদ্রের মধ্যে জীবন কাটাতে হত । টমাসরো এসব শোষণ ও অত্যাচার সম্পর্কে লিখেছেন, "ভারতের জনসাধারণ বাস করে ঠিক যেভাবে মাছ সমুদ্রে বাস করে থাকে । অর্থাৎ বড় সবসময় ছোটকে গ্রাস করছে । প্রথমে বড় কৃষক ছোট কৃষককে শোষণ করে । তারপরে অভিজাতেরা বড় কৃষকদেরকে শোষণ করে; বড় ছোটকে শোষণ করে, রাজা শোষণ করে সকলকে" ।[১]

কৃষকদের উপর নির্যাতন বেড়ে গেলে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তা মোকাবেলা করত । খাজনা আদায় নিয়েই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটত । পাল রাজবংশের আমলে রাজা দ্বিতীয় মহিপালের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রজাগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল । এই বিদ্রোহকে কৈবর্ত বিদ্রোহ বলা হয় । একবার কেদার রাজ্যের নওয়াপাড়ার জমিদার তার এলাকার ৭৫০টি কৃষক পরিবারের সদস্যদের ধরে এনে নির্যাতন করে ক্রীতদাসে পরিণত করেছিলেন । এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রজারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল ।

আকবরের শাসনামলে কৃষকদেরকে ফসলের এক তৃতীয়াংশ দিতে না পারলে তাদের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালানো হত । তখন কৃষকরা নিরুপায় হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করত । নানাবিধ যুদ্ধ ও গোলযোগের কারণে মোঘল আমলে বাঙলার কৃষকদের জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছিল। তাছাড়া পত্তনিদার, খাজনা আদায়কারী, মধ্যস্বত্বভোগীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে কৃষকরা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। কৃষকরা রাঙ্গামাটির দূর্গ দখল করার পর বিস্তৃত এক ভূখণ্ড নিজেদের দখলে এনেছিল। মোঘল আমলে বহুদিন ধরে বিদ্রোহীদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ চলছিল। দোয়াবে ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে কৃষক অভ্যুত্থান ঘটেছিল। তৎকালীন কৃষকদের প্রতিরোধের ফলে উৎপাদনের পথে যে বড় বড় বাধা ছিল তার অপসারণ ঘটলেও উৎপাদন পদ্ধতির মৌলিক কোন পরিবর্তন হয়নি কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর চেতনা নিম্নস্তরে থাকার কারণে । সামন্তপ্রভুরা তখনকার কৃষক বিদ্রোহগুলোকে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থে ও রাজনৈতিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়ে ছিল । সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে কৃষকদের উপর অবিচার নির্যাতন চালিয়ে জবরদস্তিমূলক অর্থ আদায় করা হত । কৃষকদের উপর কর আদায়ের জন্য চাপ প্রয়োগ করার ফলে কৃষকরা অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছিল । অতঃপর পালিয়ে যাওয়া চাষীদের বাকী খাজনা গ্রামের অবশিষ্ট চাষীদের কাছ থেকে আদায়ের সিদ্ধান্ত সরকারের পক্ষ থেকে নেয়া হয় । ১৭০২ -১৭০৪ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তার কারণ ছিলো চাষীদের উপর অতিরিক্ত শোষণ । ২০ লক্ষেরও বেশী লোক সেই দুর্ভিক্ষে মারা গিয়েছিল । তবুও সামরিক ব্যয় নির্বাহের জন্য মোঘল সরকার এভাবে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছিলেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই বাঙলা সম্পূর্ণ পৃথক একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

কোম্পানী আমলে বাঙলার কৃষক ঃ

কোম্পানীর মূল লক্ষ্য ছিল বাঙলা থেকে অধিক টাকা শুষে নেয়া । তাদের নতুন রাজস্ব ব্যবস্থায় জমিদাররা ছাড়াও কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। তহসিলদাররা কৃষকদের সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে যেত । ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কৃষকরা ভাল করে ফসল উৎপাদন করতে না পারায় মন্বন্তর দেখা দিলে বাঙলায় লাখ লাখ লোক অনাহারে মৃত্যুবরণ করে । খাদ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেলেও বেনিয়া সরকার খাজনা কমায়নি । অধিকহারে খাজনা পরিশোধ করা কৃষকদের জন্য ছিল কষ্টকর ব্যাপার । অভাবের জন্য গ্রামবাসীরা নিজেদের ছেলে-মেয়েদের বিক্রি করে দিত । কিন্তু পরবর্তীতে ছেলেমেয়ে কেনারও লোক মেলেনি । খাদ্যের অভাবে গাছের পাতা, মৃত জীবজন্তু খেতে তারা বাধ্য হয়েছিল ।

১৭৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে বড় ধরনের দুর্ভিক্ষ হওয়া সত্বেও কোম্পানী কৃষকদের কাছ থেকে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বেশী খাজনা আদায় করেছিল। তাঁর পরবর্তী বছর ১৩ লক্ষ টাকা বেশী খাজনা আদায় করেছিল। খাজনা আদায় করতে গিয়ে কৃষকদের উপর পশুসুলভ নির্যাতন চালান হত।

কৃষকদের কাছ থেকে ভূমি রাজস্ব আদায় ছিল ঔপনিবেশিক আয়ের প্রধান উৎস । শক্তি প্রয়োগ করে সর্বাধিক পরিমাণ ভূমিরাজস্ব আদায় করা হত । স্থায়ী খাজনা প্রবর্তিত হলে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ধার্যকৃত পুরো খাজনা আদায় করা হত ।

কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনটি প্রবর্তন করলে জমি জমিদারের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিগণিত হয় । এ আইন কৃষককে তার সামন্ততান্ত্রিক অধিকার থেকে উৎখাত করেছিল । জমিদারির মালিকানা স্বত্ব বিক্রি হওয়ার সাথে সাথে আগের জমিদারের সাথে কৃষকদের জমির আয়তন, খাজনা আদায় ইত্যাদি সংক্রান্ত চুক্তিগুলোও বাতিল হয়ে যেতো এবং নতুন জমিদার ইচ্ছামত খাজনা বাড়াতে পারতো । জমিদাররা বংশপরম্পরায় কৃষকদের কাছ থেকে মোটা অংকের খাজনা আদায় করে তা অনুৎপাদিত খাতে ব্যয় করত । তারা ভোগ-বিলাস ও বাবুগিরি করেই টাকা উড়াতো । জমিদারি লাটে উঠলে প্রভাবশালী ধনীব্যক্তি ও আদালতের কর্মচারীরা সস্তায় জমি কিনে সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে শোষণ চালাত । এই প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস লিখেছেন : "এই বন্দোবস্তের ফল হলো - প্রথমত রায়তদের গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি লুণ্ঠনের ফল; (এদের উপর চাপিয়ে দেয়া) জমিদারদের বিরুদ্ধে রায়তদের ধারাবাহিক অভ্যুত্থান কোন কোন ক্ষেত্রে জমিদারদের বহিস্কার এবং এদেশের স্থলে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী অনুপ্রবেশ; অন্যত্র, জমিদারদের দারিদ্র্য এবং বকেয়া খাজনা ও ব্যক্তিগত ঋণ শোধের জন্য বাধ্য হয়ে কিংবা স্বেচ্ছায় জমিদারি বিক্রি ।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে, দেশের জমির বৃহত্তম অংশটি দ্রুত শহুরে পুঁজিপতিদের কুক্ষিগত হয়, যাদের বাড়তি পুঁজি ছিলো তা জমিতে সরাসরি লগ্নি করেছিল"।[২]

বাঙলার কৃষকদের ওপর দিনদিন অন্যায়ভাবে নির্যাতন ও শোষণ করায় তারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিদ্রোহী হয়ে উঠে । কোন কোন ক্ষেত্রে ইংরেজ কর্তৃক উচ্ছেদকৃত জমিদাররা এসব বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয় । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে পানচোটের জমিদার কৃষক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়ে নিজের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য নতুন জমিদারের নিকট থেকে জমি কেড়ে নেন । ১৭৯৮ এবং ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে রায়পুরে ও বালাসুরে এরকম ঘটনা ঘটেছিল । নতুন ভূমি রাজস্ব প্রবর্তনের প্রতিবাদে ১৭৯৯-১৮০০ খৃষ্টাব্দে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে । কৃষকরা বেশ কিছু গ্রাম ও শহর দখল করে মেদিনীপুর আক্রমনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে । এর ফলে সরকার নতুন ভূমিরাজস্ব প্রত্যাহার করে দিতে বাধ্য হয় । লর্ড কর্ণওয়ালিসের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে বাঙলার কৃষকরা সবচেয়ে বেশী সংকটে পড়েছিল ।

বিভিন্ন আমলের কৃষক প্রতিরোধ

মুগল আমলে উৎপাদকগোষ্ঠী হিসেবে রায়তদেরকে নিপীড়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ এবং অভাব-অনটন থেকে নিস্তার লাভের জন্য বিশেষ কিছু সুবিধা ভোগের অনুমতি দেয়া হত । তবে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত কৃষি উদ্বৃত্তের প্রায় সবটুকুই করের আকারে আদায় করা হতো । ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র দুঃসময়ে খাজনা মওকুফ এবং তাকতী ঋণের মতো কোন সুবিধা প্রদান ছাড়াই সকল কৃষকের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত আদায় করত । তৎকালীন সরকারের ভূমিনীতি প্রজাদেরকে ভূস্বামীদের শোষণের শিকারে পরিণত করে । তাছাড়া ঐতিহ্যবাহি গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা প্রত্যাহার করে নেয়া হয় । এর ফলে তখন জমিদার, তালুকদার, ইজারাদার, বেনিয়া ব্যবসায়ী, একচেটিয়া কারবারি, আমলা প্রভৃতির শোষণের শিকারে পরিণত হয় বিচ্ছিন্ন গ্রাম সমাজ । এসব কারণে কৃষক সমাজ বিভিন্ন সময়ে এদের বিরুদ্ধে এবং বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে । নিম্নে বিভিন্ন সময়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষক বিদ্রোহ সম্বন্ধে আলোচনা করা হল ।

ময়মনসিংহের কৃষক বিদ্রোহ

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার উৎপত্তি হয়েছিল । এই জেলার জমিদাররা কৃষক ও জনগণের ওপর রাজস্ব আদায়ের জন্য নির্যাতন চালাতো । বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হলেও রাজস্ব আদায় থেকে কাউকে রেহাই দেওয়া হতোনা । এমনও দৃষ্টান্ত আছে যে জমিদারদের অত্যাচারে সর্বস্বান্ত কৃষকেরা

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রী পুত্র বিক্রয় করেও খাজনা জোগাতে বাধ্য হয়েছে । জমিদারের শোষণ সম্পর্কে একটি বিবরণীতে দেখা যায় ঃ ময়মনসিংহ পরগণার জমিদার ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে সিংধা পরগণায় প্রবেশ করে ঐ পরগণার বহু গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেন । এই অত্যাচারে বহু সম্পদ ও প্রাণ বিনষ্ট হয় ।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে কালেক্টর অত্যাচারী জমিদার কর্তৃক প্রজাপীড়নের এক লোমহর্ষক তদন্ত রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করেছিলেন । ময়মনসিংহ ও জাফরশাহী পরগণায় ৮০৪৯ জন প্রজার মধ্যে ১০০০ জন বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় । জমিদারি সরকারের খাস দখলে আনার পর প্রজাগণ বাড়িঘরে ফিরে আসে । রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয় আটিয়া (ময়মনসিংহ পরগণা) বার আনার, জমিদার নাবালক হওয়ায় শাসন সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মচারীরা প্রজার খাজনা একবার আদায় করে জমিদারের কাগজ ও নথিপত্র গোপন করেছে । তারা পুনরায় খাজনা আদায় করার ফন্দি আটছে এবং দ্বিতীয়বার রাজস্ব দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে । এদিকে প্রজাগণের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেলে প্রজারা পলায়ন করে গ্রাম রক্ষা করছে । জমিদারির অর্ধেক সংখ্যক মৌজায় প্রজারা বাড়ি করে আছে । তারাই কৃষিকাজ চালাচ্ছে । এসব নানাধরনের নির্যাতনের কারণে তখন কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল । মেদিনীপুর পরগণায় চোয়ার বিদ্রোহেও কৃষকরা কোম্পানীর বাহিনীকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল ।

দেবীসিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

কলকাতার এক রাজস্ব ইজারাদার দেবী সিংহ রাজস্বহার বৃদ্ধি করেন এবং পরিবর্তিত হারে প্রজাদের খাজনা দিতে বাধ্য করেন । অধিকন্তু বিলম্বে কর প্রদানকারী কৃষকদের উপর দেবিনউইলা নামে নতুন কর দিতে নির্দেশ দেন । এছাড়াও হুন্দিয়ান বা অর্থবিনিময় ও প্রেরণ সংক্রান্ত আরেকটি নতুন কর প্রজাদের দিতে হতো । নিজেদের ভোগের জন্য দেবী সিংহের গোমস্তারা প্রজাদেরকে আবওয়াব পরিশোধে বাধ্য করত । এর ফলে ১৭৮৩ সালে রংপুরে রায়ত অসন্তোষ দেখা দিলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে চিন্তিত করে তোলে ।

দেবীসিংহ ও কোম্পানী বাহাদুরের বিরুদ্ধে নির্যাতিত প্রজাদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন তৎকালীন ক্ষুদে স্থানীয় জমিদাররা । তারা বর্ধিত হারে রাজস্ব দিতে নিষেধ করেন এবং এর ফলে সাধারণ প্রজারা দেবীসিংহকে রাজস্ব প্রদান করেনি আর রংপুর ও দিনাজপুরে তাঁকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে ।

বিদ্রোহ শুরু হয় ১৭৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে বামনডাঙ্গা ও তেপাহ পরগণায়, পরে তা অন্যান্য পরগণায় ছড়িয়ে পড়ে । তখন ইজারাদারের অনেক প্রতিনিধি নিহত হন । এ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন ধীরাজ নারায়ন নামে এক ক্ষুদে ভূ-স্বামী এবং পরবর্তীতে নুরুল-আল-দ্বীন ও তার ডেপুটি দয়াশীল নামে আরেকজন

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদে ভূ-স্বামী । তারা দু'জনেই নিহত হন সরকারি বাহিনীর সাথে সামরিক সংঘর্ষে । সৈন্যরা অনেক গ্রাম ভস্মীভূত করে । এর ফলে আতঙ্কিত ও ভীত প্রজারা আত্মসমর্পণ করে এবং সরকারের শর্তাবলী মেনে নেয় । এতে বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে জড়িত প্রজাদেরকে সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করা হয় ।

রোশনাবাদ পরগণার কৃষক বিদ্রোহ

১৭৬৭ সালে সিলেট- ত্রিপুরা জেলার রোশনাবাদ পরগণায় কৃষক বিদ্রোহ ও তাদের উদ্যোগে নিঃস্ব প্রজাদের সমবায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা বাঙালির সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা ।

নীল বিদ্রোহ

শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডে নীলের চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় সে সময় নীলের ব্যবসা লাভজনক হয়ে উঠে । অষ্টাদশ শতাব্দী শেষে এই অঞ্চল থেকে তা বাজারজাত করা হত । ১৮২০ এর দশক থেকে ব্যাপক আকারে নীলচাষ সম্প্রসারিত হয়। নীলকরগণ কৃষকদেরকে অসুবিধাজনক শর্তে নীল চাষে বাধ্য করতেন । ইংরেজদের পাশাপাশি এদেশীয় ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও নীলের ব্যবসা শুরু করেছিলেন। নীল চাষ করে কৃষকদের লাভ হতোনা । ১৮৫৮-৫৯ সালে ২৩,২০০ জন নীল চাষীর মধ্যে মাত্র ২,৪৪৮ জন নীল গাছের দরুণ কিছু অর্থ পেলেও বাকীরা খুবই অল্প পেয়েছিলো ।

কুঠিয়ালরা কৃষকদের উৎকৃষ্ট জমিতে নীল বুনতে বাধ্য করত । অন্য কোন শস্য উৎপাদন করতে দিতনা । দাদনের টাকা নেবার সময় কৃষককে চুক্তিপত্রে টিপসই দিতে হত । চুক্তি অনুযায়ী কাজ না করলে তাদের উপর চালানো হত অকথ্য অত্যাচার নির্যাতন । দেশীয় জমিদার ও রাইয়তদেরকেও মানুষ বলে গণ্য করতনা । উৎপাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত দেশীয় কর্মকর্তারা চাষীদের কাছ থেকে অবৈধভাবে কমিশন আদায় করত । কনসার্ণের পুলিশি দায়িত্বে ছিল পেশাদার লাঠিয়ালরা । তাদের প্রধান অস্ত্রই ছিল লাঠি । গোটা গ্রামের লোককেই লাঠিয়াল হিসেবে ভাড়া করে আনা হত।[৩]

নীলকরদের উদ্দেশ্য ছিল দাদন দিয়ে রায়তকে বশিয়ে রাখা এবং দাদন বাকীর ভয় দেখিয়ে কৃষককে নীলচাষে বাধ্য করা । নীলকরদের লক্ষ্যই ছিল যেকোন উপায়ে প্রচুর নীল গাছ সংগ্রহ করা । নীল চাষ করলে কৃষকদের বিঘাপ্রতি ৭ টাকা ক্ষতি হত।[৪]

কলকাতায় Indigo Planteris Association গঠিত হবার পর কুঠিয়ালরা কৃষকদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়ার ফলে নীলচাষ করা চাষীদের পক্ষে বিপদজ্জনক হয়ে উঠে । ছোট লাট

Dhaka University Institutional Repository

হ্যালিডের আমলে অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেলে প্রজারা নীলচাষ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় । কিন্তু কুঠিয়ালরা কৃষকদের উপর বলপ্রয়োগ করে নীলচাষ করতে বাধ্য করে এবং জোর করে টিপসই নেয় । এব্যাপারে তৎকালীন একজন ইংরেজ লেখক বলেছিলেন - "The cold, hard and sorbid who can plough up grain fields, kidnap recusant ryots, confine them in dark holes, beat and starve them into submission, which thing have some times have done, can give no moral guarantee of his incapability of filing up a blank bond and turning it to his pecuniary profit".[৫]

কৃষকদের উপর নানা ধরনের অত্যাচার নির্যাতন করা হত। অন্য যে কোন ধরনের বাগান তছনছ করে নীল চাষ করতে বাধ্য করা হত । যারা অত্যাচারের ভয়ে নিজ বাসস্থান ছেড়ে চলে যেত তাদের সর্বস্ব লুট করে সেখানে নীলের আবাদ করা হত । বাড়িঘরে আগুণ জ্বালিয়ে দেয়া হত । প্রত্যেক নীলকুঠিতে কয়েদখানা ছিল । সেখানে অবাধ্য প্রজাদেরকে আটকে রাখা হত । কোন কোন গ্রামে নীল চাষ না করলে গুলি করে হত্যা করা হত । তাছাড়াও নারীদের উপর নির্যাতন চালান হতো।

১৮৫৯ সালে নদীয়া ও যশোর জেলায় সবচেয়ে হিংস্র বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল । এতে নেতৃত্ব দেন প্রধানত জমিদার ও ধনী কৃষকগণ । ক্ষমতা কাঠামোতে তারা নীলকরদের প্রতিপক্ষ ছিলেন।[৬] নদীয়ার কৃষকরা মোল্লাহাটির নীলকুঠির ম্যানেজারের উপর হামলা চালালে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান । খাজুরার কুঠিতে কৃষকরা আগুণ দিয়েছিল এবং লোকনাথপুরের কুঠিতে হামলা চালিয়েছিল। চাঁদপুরের গোলদার কুঠির নীলের গোলা ধ্বংস করেছিল । বাসনদি কুঠির আশে পাশের গ্রামের কৃষকরা অস্ত্র জোগাড় করে বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দিয়েছিলো । ফলে নদীয়া জেলা নীল কুঠিয়ালদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় ।

১৮৬০ সালে বণগাঁর জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট এক সাক্ষ্যে বলেন, নীল বুনা নিয়ে কুঠিয়ালদের সাথে কৃষকদের বিবাদ বাঁধলে কৃষকরা উত্তেজিত হয়ে বাগদা থানা আক্রমণ করে । ঝিকরগাছার বেনেয়ালী গ্রামেও এধরনের সশস্ত্র হামলা হয়েছিল । কৃষকদের নেতৃত্বে বহু নীলকুঠি ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিল । কৃষকদের বিদ্রোহের ফলে নীলকরদের মালবহনের যোগাযোগের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় । যে সব জমিতে নীলের গাছ ছিল চাষীরা সেগুলো কেটে নষ্ট করে । কুঠিবের পর কুঠি লুট করে সব ধরনের হিসেবের খাতা আগুনে পুড়িয়ে নষ্ট করে দেয়া হয়। স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারি, সরকারী অফিস প্রভৃতির উপর সশস্ত্র কৃষকরা হামলা চালায় । বর্শা, তরবারি, ঢাল বাঁশের লাঠিকে তারা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করত । ঐ বিদ্রোহে হিন্দু ও মুসলমান কৃষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে যোগ দিয়েছিল।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে ১৮৬০ সালের কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে লর্ড ক্যানিং এর মন্তব্য তুলে ধরা হল ঃ

I assure you that for about a week it caused me more anxiety than I have had since the days of Delhi and from that day I felt that a shot fired in anger or fear by on foolish planter might put every factory in lower Bengal flames''.[৮]

'মুর্শিদাবাদ জেলার আওরঙ্গাবাদ কুঠি থেকে প্রথম বিদ্রোহ শুরু হয়ে তা সকল নীল জেলায় ছড়িয়ে পড়ে । লেফটেন্যান্ট গভর্নরের জন্য প্রস্তুতকৃত এক প্রতিবেদনে বিদ্রোহের সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ প্রকাশ করা হয়েছিল। নিম্নে তা তুলে ধরা হল ঃ

''নীলচাষের বিরুদ্ধে নিয়মিত এক লীগ (league) প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এতে শপথ গ্রহণ করে । ঢোল বাজিয়ে এক গ্রামের রায়তদেরকে অন্য গ্রামের রায়তদের সহায়তা দানের আহ্বান জানানো হয় । বলা হয় যে যদি তারা নীলকরদের ভৃত্য প্রভৃতির দ্বারা উৎপীড়িত হয় এবং তাদেরকে নীলচাষ করতে বাধ্য করা হয়, তবে তারা বিরোধিতা করবে, সংকেত প্রেরিত হয় ও চাঁদা তোলা হয়; ঢোলের আহ্বানে গ্রামবাসীরা বেরিয়ে আসে এবং সশস্ত্র অবস্থায় বড় দলভুক্ত হয়ে হুমকিগ্রস্ত স্থানের দিকে অগ্রসর হয়; প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেব পদ্ধতিতে সবকিছু করে । পুলিশেরা ভীত হয় এবং রায়তদের দ্বারা পরাভূত হয়'' ।[৯]

তৎকালীন বাঙলার কৃষক বিদ্রোহের পূর্বাভাষ বর্ণনা করে ক্যালকাটা রিভিয়্যু পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল: বাঙলার গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা আকস্মিক অত্যাশ্চার্য পরিবর্তন এসে গেছে । এক মুহূর্তে তারা নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে । সে রায়তদের সাথে আমরা ক্রীতদাসের মত অথবা রুশ দেশের ভূমিদাসের মতো ব্যবহার করতে অভ্যস্থ ছিলাম । জমিদার ও নীলকরদের নির্বিরোধ যন্ত্ররূপে যাদের আমরা জানতাম, অবশেষে তারা জেগে উঠেছে; কর্মতৎপর হয়েছে এবং প্রতিজ্ঞা করেছে যে, তারা আর শৃংখলাবদ্ধ থাকবেনা । বর্তমানে কৃষক জনসাধারণ যে প্রকার আশ্চর্য অনুভূতি দিয়ে নীলচাষ সম্বন্ধে মনস্থির করেছে এবং যার ফলে তাদের মধ্যে বহুক্ষেত্রে বিস্ফোরণ দেখা দিচ্ছে তা বিজ্ঞ ব্যক্তিগন কল্পনা করতে পারেনি ।[১০]

তৎকালীন বুদ্ধিজীবীরা নীল বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেননি, কিন্তু কৃষকদেরকে নৈতিক সমর্থন দিয়েছিলেন। যে সব মণীষী নীলকরদের অত্যাচারের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছিলেন তাদের মধ্যে প্রখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ও খ্যাতনামা কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম উল্লেখ করা যায় । 'নীলদর্পণ' লিখে নীলকরদের অত্যাচারের সঠিক চিত্র তুলে ধরেছিলেন দীনবন্ধু মিত্র দেশবাসীর সামনে। আর মাইকেল মধুসুদন দত্ত পাদরী

Dhaka University Institutional Repository

লঙের তত্ত্বাবধানে নাটকটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে মামলার ব্যাপারে কৃষকদের পক্ষাবলম্বন করায় যতীন চট্টোপধ্যায় নামে একজন মোক্তারকে গ্রেফতার করা হয়েছিল । উল্লেখ্য যে, কোন আইনজীবী নীলচাষীদের পক্ষে মামলায় এগিয়ে আসলে তাদেরকে বিদ্রোহের সমার্থক বলে ঘোষণা করা হত । এ থেকে বুঝা যায় সব সময় সচেতন শ্রেণী, শিক্ষিত সমাজ অন্যায়, শোষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে নৈতিক সমর্থন দিয়ে বিদ্রোহিদের চেতনা জাগ্রত করেন ।

১৮৮৩ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে নীল বিদ্রোহ প্রশমিত হলেও অনেক নীলকর তাদের কর্মকাণ্ড বন্ধ করে দেয়া ছাড়াও তাদের এষ্টেট বিক্রি করে দেয় । কিন্তু নীল বিলুপ্ত হয়নি । অনেক নীলকর খাজনা হ্রাস এবং ভদ্র আচরণ করে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করেছিল প্রজাদের সাথে । কিন্তু নীলের বাজার দ্রুত হ্রাস পাচ্ছিল । বিশ্ববাজারে নীলের চাহিদার ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে নীলকরগণ বাংলায় তাদের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে । এতে কৃষকগণ স্বস্তিবোধ করে ।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে যশোরের বিজলীয়া বিভাগের নীলকরদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিদ্রোহ সংঘটিত হয় । বিজলীয়া কুঠির অধ্যক্ষ ভম্বল এর অকথ্য নির্যাতনের ফলে ৪৮টি গ্রামের কৃষকরা একত্রিত হয়ে বিদ্রোহ করেছিল । যদুনাথ মজুমদার ১৮৮৮ সালে আইন পাশ করে কৃষকদের পক্ষে আন্দোলনে যোগ দেন এবং মামলায় প্রজাদের পক্ষে ওকালতি করেন । মাগুরার উকিল পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং যদুনাথ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় কৃষকদের পক্ষে এক আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন বিলেতে । তখন কৃষকদের দুরবস্থার ব্যাপারে বৃটিশ পার্লামেন্ট এদেশের ইংরেজ শাসকদের কাছে কৈফিয়ত তলব করেছিল । তখন একটি কমিটি গঠন করা হয় । কমিটি তদন্ত করে নীলগাছের দাম বাড়িয়ে দিলে নীলকরদের ব্যবসা অচল হয়ে যায়। ১৮৯৫ সালে নীলের উৎপাদন কমে যাওয়ায় নীলকরদের এই ব্যবসা তুলে দিতে হয়েছিল ।

ব্লেয়ার ব্লি কিং লিখেছেন, "নীলবিদ্রোহের অব্যবহিত দশকটি, যখন কৃষকরা নীলকরদের হাত থেকে নিজেদের মুক্ত করেছে এবং মহাজনের খপ্পরে পড়েনি - সেই দশকটি ছিল বাংলার পল্লীর সবচেয়ে সুখের সময় । এরপরে আইনগত ব্যবস্থা -যা গ্রাম পর্যায়ে প্রথাগত আইনকে স্থানচ্যুত করেছিল তা সুদখোর মহাজনদের স্বার্থসিদ্ধির উপায় হয়ে দাঁড়ায়, আইন কাজ করে ক্ষুদ্র চাষীদের পক্ষে নয় বিপক্ষে"।[১১]

Dhaka University Institutional Repository

পাবনা কৃষক বিদ্রোহ ঃ

নীল বিদ্রোহের পর দুই দশক ধরে কৃষক সমাজে শান্তি বিরাজ করছিল । কিন্তু ১৮৭০ ও '৮০ এর দশকে প্রজাগণ প্রতিবাদী হয়ে উঠে । এর কারণ ১৮৬০-'৭৫ খৃষ্টাব্দে জমিদাররা খাজনা বৃদ্ধির জুলুম প্রজাদের উপর প্রবর্তন করেছিল ।

উনিশ শতকের চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকগুলোতে জমি হয়ে উঠেছিল মহাজনের নিকট ঋণ প্রদানের বিনিময়ে একটা আয়ের ক্ষেত্র । পরবর্তীতে মহাজন, বণিক ও সামন্ত ভূ-স্বামীরা কৃষকদের জমি দখল করতে সমর্থ হয় জমি বন্ধকি রাখার মাধ্যমে। তাদের কাছে জমি হস্তান্তরিত হলেও কৃষি অর্থনীতির ভিত্তি বদলায়নি । কৃষকরা নিজ জমি হারিয়ে সেই জমিই চাষাবাদ করতো এবং করভারে জর্জরিত হতো । কৃষকদের কাছে জমি বন্দোবস্তের পরিমাণ এবং রায়তচাষীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছিল। ভূমি রাজস্বের উপর যারা নির্ভর ছিল তাদেরও সংখ্যা বেড়েছিল । ১৮৮১-১৮৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী তখন ভূ-স্বামীদের সংখ্যা বেড়েছিল ২৫ লক্ষ থেকে ৪০ লক্ষ ।

ভূমি মালিকরা ১৮৬০--১৮৭৫ সালের মধ্যে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী বাংলার জমিতে খাজনা বাড়িয়েছিল । কোন কোন জমিদারিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমলের নির্দিষ্ট খাজনার চেয়ে ১০,১৫,৬০ এমনকি ১২০ গুণ খাজনা বাড়ানো হয়েছিল।[১২] কলকাতা হাইকোর্ট ১৮৭১ সালে প্রজাস্বত্ব আইনের (১৮৫৯) কিছু ধারা জমিদারের অনুকূলে ব্যাখ্যা করায় জমিদাররা পাইকারীভাবে ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি করেছিলো । এছাড়া জমিদাররা আরো নানা ধরনের কর আরোপ করেছিল । কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং ভূমির উপর বাড়তি জনসংখ্যার চাপের ফলে ১৮৬০ এর দশকে ভূমালিকরা খাজনার হার বৃদ্ধি করার জন্য তৎপরতা চালায় । কিন্তু রায়তগণ পরগণা নিরিখ অনুযায়ী খাজনা প্রদানের উপর জোর দেয় । ১৮৭০ থেকে দুই দশকের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে যে কৃষক বিদ্রোহ লক্ষ্য করা যায় সেগুলো হল সুন্দরবনের ভূষখালিতে (১৮৭২-৭৫), নোয়াখালীর ছাগলনাইয়ায় (১৮৭৪), উপ-পার্বত্য ময়মনসিংহে (১৮৭৪-৮২), ঢাকার মুন্সিগঞ্জে (১৮৮০-৮১) এবং মেহেদীগঞ্জে (১৮৮০-১৮৮১) ।

তৎকালীন জমিদারদের জুলুম অত্যাচার সম্পর্কে একজন লেখক লিখেছিলেন ঃ

"আমি যদি জমিদারের জোর করে আদায়ীকৃত অর্থ সরকারের নির্দিষ্ট খাজনার ১৪ গুণ বলে ধরি, তাহলে দেখা যাবে যে জমিদারেরা প্রজাদের কাছ থেকে বছরে ৫১,১২,৭০,৭০০ টাকা খাজনা হিসেবে আদায় করে । এই হিসাবের সঙ্গে বেআইনী কর থেকে সংগৃহীত টাকা যোগ দিলে আরো ১০ কোটি টাকা

Dhaka University Institutional Repository

বাড়বে । অর্থাৎ মোট ৬১ কোটি টাকা একদল কুড়ে লোক শ্রমজীবী জনসাধারণের কাছ থেকে প্রতিবছর কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে । ..... সরকার সারা বৃটিশভারত থেকে সমস্তখাতে যে টাকা আদায় করে জমিদারের আদায়কৃত অর্থ তার চেয়েও অনেক বেশী ।[১৩]

তৎকালীন বাঙলার বিভিন্ন জেলার জমিদারদের জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল । সবচেয়ে প্রচণ্ড কিন্তু ব্যাপকভাবে অহিংস ও সুসংগঠিত ছিল ১৮৭৩ সালের পাবনা কৃষক বিদ্রোহ। পাবনার জমিদারগণ প্রায় সকলেই ছিলেন অনাবাসিক (non-resident) । সময়ে সময়ে খাজনা বৃদ্ধি করা ছাড়াও ভূ-মালিকরা সকল ধরনের আবওয়াব (abwab) সংগ্রহ করতেন । যখন অহরহ খাজনা বৃদ্ধি ও অবৈধ আবওয়াব সংগ্রহ থেকে বিরত থাকার জন্য আবেদনে কাজ হলোনা, তখন ক্ষুব্ধ প্রজারা ১৮৭৩ সালে অমান্য আন্দোলন শুরু করে । অমান্য আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রথমে সিরাজগঞ্জে শুরু হয় পরে তা অন্যান্য পরগণা ও জেলায় ছড়িয়ে পড়ে । ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে 'ফ্রেণ্ডস অব ইণ্ডিয়া' নামক একটি খবরের কাগজে এই বিদ্রোহ সম্পর্কে লেখা হয়েছিল ঃ

পাবনা, বগুড়া ও অন্যান্য স্থানে নতুন জমিদারেরা খাজনা বৃদ্ধি ও বেআইনি কর বৃদ্ধি করা ছাড়াও কৃষকদের ঠকিয়ে কতগুলো চুক্তি সম্পাদনের জন্য রেজিষ্ট্রি অফিস ও মুন্সেফের আদালতটি তারা ব্যবহার করতে লাগল । পুরনো দিনের সমস্ত বেআইনী কর ও ভবিষ্যতের সব ট্যাক্স খাজনার অংশ হিসেবে দেখানোই ছিল এই চুক্তিগুলোর উদ্দেশ্য ।[১৪] তখন যে বিদ্রোহ হয়েছিল তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হল ঃ

জমিদারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রজারা আইনের আশ্রয় নিলে হামলার খবর চারিদিকের গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে । তখন আশেপাশের গ্রামের কৃষকরা জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় । এই বিদ্রোহে প্রায় ২৪০ টি গ্রাম অংশগ্রহণ করে । কৃষকরা বাড়তি খাজনা দেয়া বন্ধ করে দেয় এবং তাদের কাছ থেকে জমিদাররা যে স্বীকারোক্তিমূলক পত্রে সই নিয়েছিলো তা আগুনে পুড়িয়ে দেয় ।[১৫] কৃষকরা হিংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে জমিদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় । জমিদারদের সঙ্গে বেআইনি কর আদায় নিয়ে প্রজাদের সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিলো ।

১৮৭২-৭৩ সালে পাবনায় একাধিক ভয়াবহ কৃষক দাঙ্গার কারণ সম্পর্কে ভারত সচিবের কাছে ২১শে মার্চ ১৮৮২ সালের লিখিত পত্রে ভারত সরকার বলেন, "জমিদারের খুশিমত উচ্ছেদযোগ্য হবে, জনৈক জমিদার রায়তদের কাছ থেকে এই শর্ত সম্বলিত কবুলিয়ত নেয়ার চেষ্টা করলে পাবনায় ভয়াবহ দাঙ্গা হয় ।"[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

জমিদারের উৎপীড়ন সম্পর্কে তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক নোলান সাহেব একটি রিপোর্টে উল্লেখ করেছিলেন ঃ

'জমিদারেরা কৃষক নির্যাতনের অপরাধে দায়ী । জমিদারদের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কৃষকরা একতাবদ্ধ হয়েছিল । কৃষক বিদ্রোহের ফলে জমিদারেরা মুচলিকা দিতে বাধ্য হয়েছিল । জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে আদালতে যে মকদ্দমা হয়েছিল প্রজারা সেই মকদ্দমায় জয়লাভ করেছিল এবং তাদের উদ্যমও বেড়ে গিয়েছিলো'' ।[১৭] এই মহকুমা প্রশাসক তার রিপোর্টে আরো উল্লেখ করেছিলেন ঃ

''অত্যন্ত পশ্চাদপদ প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকায়ও কৃষকদের আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছিল। শত শত গ্রাম ঐক্যবদ্ধভাবে কৃষক সমিতি গঠন করে সংগ্রামের উত্তেজনাকে সংহতরূপ দান করেছিল। কৃষক জনসাধারণ যেন সংগ্রামে উত্তেজনায় ফেটে পড়েছিল। নতুন নতুন গ্রামগুলো সংগঠনের মধ্যে টেনে আনার জন্য চারদিকে প্রচার কার্যের দল প্রেরণ করা হয়েছিল এবং চারদিকে চলছিলো গোপনভাবে সভা সমিতির কাজ'' ।[১৮] কৃষকরা নিজেদেরকে সুস্পষ্ট নেতৃত্বের অধীনে বিভিন্ন জোট ও লীগে সংগঠিত করেছিল। চাঁদা সংগ্রহ করে লাঠিয়াল বাহিনী পরিচালনা করা হত। গ্রামে গ্রামে গিয়ে কৃষকরা নিজেদের পক্ষে প্রচারনা চালাত। এ প্রচারনার ফলে সমগ্র জেলা কৃষকলীগের সমর্থকে পরিণত হয়। সিরাজুল ইসলাম বলেন, ''এটি ছিল প্রকৃতপক্ষে অনাবাসিক জমিদারের সাথে সাধারণ কৃষক সমর্থিত স্থানীয় ক্ষুদে ভূমালিকদের বৃহৎ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। খাজনা প্রদান বন্ধ রাখা হয় যতক্ষণ না বৃহৎ অনাবাসিক জমিদারগণ কৃষকদের এ দাবি মেনে নেন যে, ভূমির উপর তাদের অধিকার রয়েছে এবং বিনা কারণে ভূমালিকদের খাজনা বৃদ্ধির কোন অধিকার নেই। এধারণা কৃষকদের মধ্যে সাধারণভাবে বিরাজ করছিল এবং এ ধারণা পোষণে তারা কোন বিমূর্ত তত্ত্ব দ্বারা পরিচালিত হয়নি, বরং রীতিসিদ্ধ অধিকারের ব্যাপারে তাদের সচেতনাতাই এর মূলে ক্রিয়াশীল ছিল'' ।[১৯]

তখনকার কৃষক বিদ্রোহের ফলে ইংরেজদের মনেও আতঙ্ক দেখা দেয় । জেলা প্রশাসক, পুলিশবাহিনী উপদ্রব অঞ্চল পরিদর্শন করেছিলেন এবং সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ ও সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল । বহু বিদ্রোহী নেতাকে বন্দী করা হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলাও রজু করা হয় । ৩০২ জন কৃষক নেতার বিচার হয়েছিল মকদ্দমায়। তাদের মধ্যে ১৪৭ জনের ১ মাস থেকে ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হয়েছিল । জমিদাররাও ভবিষ্যতে আর কবৃবৃদ্ধি ও অত্যাচার করার সাহস পাননি ।

ইংরেজরা কৃষক বিদ্রোহকে গুরুত্ব সহকারে মূল্যায়ণ করেছিল । আর যাতে কৃষক বিদ্রোহ না হয় ও গ্রামাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় এবং ভূস্বামী ও কৃষকদের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন হয় সর্বোপরি কৃষকদের স্বার্থের

Dhaka University Institutional Repository

দিকে তাকিয়ে ১৮৮৫ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কিছুটা পরিবর্তন করে ১৮৮৫ সালে এক নতুন প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তন করা হয় । ১৮৮৫ সালের বাংলা প্রজাস্বত্ব আইনে কৃষক বিদ্রোহের ফলশ্রুতি ছিল ।

ডঃ মো. হান্নান এর মতে, উপরোক্ত বিদ্রোহ দুটি ছিল প্রকৃতপক্ষে সামন্তবাদ বিরোধী । এসব বিদ্রোহের ফলে সামন্তবাদ, রাজতন্ত্র ও জমিদারতন্ত্র ইত্যাদির ভিত্তিমূল প্রচণ্ডভাবে নড়ে উঠেছিল।[২০]

তেভাগা আন্দোলন

ভূস্বামীদের অধীনে যারা ভাগে জমি চাষ করতো তারা ছিলেন ভাগচাষী, বর্গাদার বা আধিয়ার । তারা লাঙ্গল চষে যে ফসল ফলাতেন তার অর্ধেক ভাগ দিতে হতো ভূস্বামীদের । আর সম্পূর্ণ বিনা পরিশ্রমে জমির মালিকগণ সম্পত্তির ফসল ভোগ করত । এদের বিরুদ্ধেই কৃষকরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল এবং শুরু করেছিল তেভাগা আন্দোলন। ১৯৩০ সালে বাঙলার কৃষকরা তেভাগার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছিল । ১৯৩০ সালে যশোর জেলার নড়াইল মহকুমা, মাগুরা মহকুমা এবং সদর মহকুমার কিছু অংশবিশেষ নিয়ে এক ব্যাপক অঞ্চলে কৃষকরা আন্দোলন শুরু করেছিল।

ভাগচাষীকে ফসলের তিনভাগের দুই ভাগ দিতে হবে এটাই ছিলো তেভাগা আন্দোলনের মূল দাবি। কৃষকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে সমস্ত জমির মালিক ভাগ দিতে রাজী হবেনা- তাদের জমিতে কোন কৃষক চাষ করতে পারবেনা । কৃষকদের আরো সিদ্ধান্ত ছিলো যে উচ্চবর্ণ হিন্দু মালিকের জমি থেকেই তেভাগা আদায় করতে হবে। কোন উচ্চবর্ণ হিন্দুর বাড়ীতে কোন মুসলমান কৃষিকাজ করতে পারবেনা এমনকি চাকরের কাজও করা যাবেনা। তাছাড়া যে সমস্ত জমির মালিক পানের বরজ করে জীবিকা নির্বাহ করে, তাদের জমি থেকেও তেভাগা নিতে হবে। বারুইদের কাছ থেকে পান কেনাও ছিল নিষেধ। এ আন্দোলনটি ছিল মূলতঃ বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমান ও নমশুদ্র চাষীদের অসহযোগ আন্দোলন। একটু অবস্থাপন্ন কৃষকরাই ছিলো এই আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়। বাঙলার তিরিশ ও চল্লিশের দশকে তেভাগা আন্দোলন যশোরের নড়াইল ছাড়াও খুলনার ডুমুরিয়া, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনপদে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল ।

উত্তরবঙ্গের রাজশাহী ও মালদাহ জেলার সাঁওতালরা ১৯৩২ সালে একটি আন্দোলন শুরু করে । তখনকার জোতদারেরা জোর জবরদস্তি করে সাঁওতালদের কাছ থেকে উৎপাদিত ফসলের সিংহভাগ আদায় করে নিতো । জোতদার ও জমিদারের বিরুদ্ধে সাঁওতালরা তীর, ধনুক, দা, বল্লম, লাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করত । আর পুলিশ বাহিনী আগ্নেয়াস্ত্রের মাধ্যমে সাঁওতালদের দমন করত।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরবঙ্গের রংপুরের বিভিন্ন অঞ্চলেও শুরু হয় ভাগচাষীদের আন্দোলন । মহাজন ও জোতদাররা কৃষকদেরকে ধানের ন্যায্য ভাগ না দেওয়ায় উপায়ন্তর না দেখে কৃষকরা কৃষক সমিতির পতাকাতলে সমবেত হয়ে উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দুইভাগ দাবী করেছিল ।

খুলনার ডুমুরিয়া অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়েছিল বিষ্ণু চ্যাটার্জির নেতৃত্বে । ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সোভনা গ্রামে তারই নেতৃত্বে বিরাট একটি কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল । বাঁধবন্দীর সপক্ষে এবং প্রজা উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ডুমুরিয়ার কৃষকরা আন্দোলন করেছিল কারণ ডুমুরিয়ার প্রধান সমস্যা ছিল বাঁধবন্দী । ধান হোক আর না হোক জমিদাররা তখন জমির খাজনা আদায় করতো বাধ্যবাধকতাভাবে । এর জন্য নিপীড়নও চালাতো তারা । বেশীর ভাগ কৃষকই খাজনা দিতে পারতোনা ফসল ও টাকার অভাবে । ফলে খাজনা না দেয়ার জন্য প্রজার সম্পত্তি বিক্রি হয়ে যেতো নিলামে । জমিদাররা বাঁধবন্দীর প্রধানতম শত্রু ছিল । সরকারও এদিকে নজর দেয়নি । এর ফলে কৃষকরা কৃষক সমিতির পতাকাতলে সমবেত হয়ে আন্দোলন শুরু করেছিল । বিষ্ণু চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে ১৯৪৪ সালে আর একটি কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সাহসা গ্রামে । এতে দুইশত লাঠিয়ালসহ হাজার হাজার কৃষক যোগদান করেছিলো ।

ফকিরহাট থানার মৌভোগ গ্রামে ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল । এই সম্মেলনে কৃষকদের শ্লোগান ছিল 'লাঙল যার, জমি তার'। এই শ্লোগান শেষপর্যন্ত আন্দোলনে রূপ নিয়েছিলো খুলনার চিতলমারী, চুনখোলা, ডুমুরিয়া, বটিয়াঘাটা, দাকোপ প্রভৃতি অঞ্চলে। সেই সঙ্গে ধ্বনি উঠেছিলো 'জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ কর', 'সামন্ততন্ত্রের অবসান করো', 'পুলিশের দালাল হালাল করো' ইত্যাদি ।

সিলেটে নানকার বিদ্রোহ

১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত সিলেট জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দিয়েছিলো প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আন্দোলন ও নানকার বিদ্রোহ । ১৯৩৬ সালে সারা ভাষত কিষাণ সভা প্রতিষ্ঠিত হবার পর সিলেটে সুরমা উপত্যকায় কৃষক সমিতি গঠিত হয় । তখনকার সিলেট জেলায় নানকাররা ছিলো জমিদারের খাসজমির উপর স্বত্বহীন দখলকার । জমিদারদের যখন তখন তাদেরকে উচ্ছেদ করার ক্ষমতা ছিল । এই কৃষক সমিতি ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর সিলেট জেলায় কৃষকদের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রজাস্বত্ব আইনে খসড়া সংশোধনী প্রণয়ন করে । তাতে দাবি জানানো হয় যে, প্রজাদের জমির স্বত্ব দিতে হবে এবং জমি থেকে উচ্ছেদ করার ক্ষমতা আইনানুগ বাতিল করতে হবে । এই বিষয়টি আইন পরিষদে তুলতে না পারায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রজাস্বত্ব সংশোধনীর দাবি জানিয়ে কৃষক সমিতি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছিল । এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল সিলেট জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে । জমিদারী খাজনাও কৃষকরা বন্ধ করে দিয়েছিল । মূলত তাদের দাবি ছিল নানকার ব্যবস্থার উচ্ছেদ । যেসব জমি কৃষকরা চাষ করত এবং যেখানে বসবাস করত সেসব জায়গা তারা নিজেদের দখলে নিয়েছিল । জমিদার মিথ্যা ফৌজদারী মামলা দায়ের করেও তাদের উচ্ছেদ করতে পারেনি । এই আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে গ্রেফতার হয়েছিলেন প্রাদেশিক কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক- লালা শরদিন্দু দে এবং আরো অনেকে । কিন্তু তার পরেও কৃষকদেরকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা যায়নি । ১৯৩৮ থেকে ১৯৩৯ সাল এই এক বছরে বাহাদুরপুরে নানকার বিদ্রোহ জোরালো হয়ে উঠেছিল । সেখানকার জমিদার নাজমুল ইসলাম চৌধুরী ও নুরুল ইসলাম চৌধুরী নানকার কৃষকদের উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করায় বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। জমিদাররা সরকারের সাহায্যে বিদ্রোহ দমনের ব্যবস্থা নেয় এবং আদালতে মিথ্যা মামলা রজু করে কৃষকদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি দেয়া হয়। তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক জমিদারের সহায়ক ছিলেন। তারই সহায়তায় বিদ্রোহটি ২য় বিশ্বযুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার সুযোগে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে । এক পর্যায়ে বিদ্রোহীরা সরকারের কাছে আত্মসমর্পন করে । এ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আব্বাস আলী পাট্টাদার ও শেখ আজহার আলী ।

১৯৩৯ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সিলেট অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনে ভাটা পড়ে । ১৯৪১ সালে কৃষকসভা প্রণীত প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনী কাটছাঁট করে সম্পন্ন কৃষকদের কিছু মর্যাদা ও অধিকার দিয়ে আইন সভায় প্রজাস্বত্ব আইন প্রস্তাবটি পাশ হয় । তবে এ আইনে নানকারদের মূল দাবিটি পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয় ।

ভানুবিল বিদ্রোহ

মহাত্মা গান্ধীর ডাকে অহিংস আন্দোলন শুরু হলে সিলেটের ভানুবিল অঞ্চলের মণিপুরী কৃষকরা বামপন্থীদের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল । তৎকালীন জমিদার তাদের উপর অন্যায়, অত্যাচার জুলুম করা সত্ত্বেও অহিংস আন্দোলনের কারণে কৃষকরা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে । পরবর্তীতে অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় অহিংসনীতি পরিত্যাগ করে হিংসার পথ বেছে নেয় । ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত মনিপুরী কৃষকরা পুলিশ ও জমিদারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে । কিন্তু সরকার সশস্ত্রবাহিনী প্রেরণ করায় কৃষকরা তাদেরকে প্রতিরোধে ব্যর্থ হয় । তবুও লড়াই করতে করতে তারা পিছনে হটে যায় এবং গ্রাম ও নিজের অঞ্চল ছেড়ে ত্রিপুরা রাজ্যে পালিয়ে গিয়েছিল । বৃটিশ সরকারের দমণনীতির বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে প্রতিবাদ উঠেছিল এবং বৃটিশ পার্লামেন্টেও এ নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল ।

Dhaka University Institutional Repository

হাজং বিদ্রোহ/টংক আন্দোলন

ময়মনসিংহের হাজং কৃষকরা জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল ১৯৪০ সালের প্রথমদিকে । ঐ সময় জমির খাজনার হার বেশী ছিলনা । কিন্তু গরীব কৃষকরা জমি বন্দোবস্ত নিতে পারতোনা কারণ সেলামী নজরানা হিসেবে তাদেরকে বেশ কিছু অর্থ দিতে হতো । তাই হাজং কৃষকরা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন আন্দোলন করায় জমিদাররা ব্যবস্থাটি তুলে দিতে বাধ্য হয় । কিন্তু এর বিকল্প হিসেবে জমিদাররা টংক প্রথা নামে আরেকটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল । এই প্রথা অনুসারে ফসল হোক আর না হোক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল জমিদারকে দিতেই হবে । ঠিকমত ফসল দিতে না পারলে কৃষকদেরকে জমিদারদের দ্বারা নাজেহাল হতে হতো । কৃষকদের এই দুরবস্থা দেখে মনিসিংহ শ্রমিক আন্দোলন ত্যাগ করে নির্যাতিত কৃষকদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন । এই আন্দোলনে তিনি তিনটি দাবি তুলে ধরেছিলেন । যথা ঃ-

ক) টংক প্রথা তুলে দিতে হবে/

খ) টাকার খাজনার পরিমান কমাতে হবে ।

গ) কৃষকদের জমির স্বত্ব ও মালিকানার স্বীকৃতি দিতে হবে ।

এই তিনটি দাবির ভিত্তিতেই আন্দোলন জোরদার হয়েছিল । এই বিদ্রোহকেই ইতিহাসে হাজং বিদ্রোহ নামে অভিহিত করা হয় ।

১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে নেত্রকোনায় হাজংদের উদ্যোগে এক কৃষক সম্মেলন হয়েছিল । এই সম্মেলনে হাজার হাজার কৃষক যোগদান করেছিল। সরকার এই আন্দোলনের গুরুত্ব অনুধাবন করে তা দমন করার জন্য সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ করে। আগ্নয়াস্ত্র প্রয়োগ করায় সরকার এ বিদ্রোহকে দমন করতে সমর্থ হয়। দমন পীড়ন সহ্য করেও দেশবিভাগের পরেও হাজং কৃষক বিদ্রোহীরা সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিল।

নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ

১৯৪৭ সালে সারা বাংলাদেশে তেভাগা আন্দোলন শেষ হওয়ার পর একমাত্র নাচোল ছাড়া আর কোন অঞ্চলেই সেই আন্দোলন আর পুনর্গঠিত হয়নি । রাজশাহী জেলার বরেন্দ্র অঞ্চলের নাচোল থানার সাঁওতাল কৃষকদের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল ১৯৪৮-৫০ সালের নতুন পর্যায়ের তেভাগা আন্দোলন। এই অঞ্চলে সাঁওতালদের দাবী আদায়ের সংগ্রামে বাঁধা সৃষ্টি করেছিল সরকার জোতদার ও পুলিশরা । খাস করে

Dhaka University Institutional Repository

সাঁওতালদের জমি আর ফেরত দেয়নি । এই অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে সাঁওতালরা অস্ত্র ধারণ করেছিল । মাতলা সরদার ছাড়াও রাজশাহী জেলার অন্যান্য অঞ্চলের যে কয়জন নেতা এই এলাকার কৃষক সংগঠন ও আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তারা হচ্ছেন ইলা মিত্র, রমেন মিত্র, অনিমেষ লাহিড়ী, শিবু কোড়ামুদি, বৃন্দাবন সাহা, আজহার হোসেন ও চিত্ত চক্রবর্তী ।

বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, "নাচোলের তেভাগা আন্দোলন যেভাবে শৃংখলা ও দায়িত্বশীলতার সাথে সমগ্র অঞ্চলকে আলোড়িত করেছিল তার দ্বারা কৃষকের বিপ্লবী শক্তির একটা নির্ভুল পরিচয় পাওয়া যায় । ..... আন্দোলন ও সংগঠনের এই অবস্থার জন্য সমগ্র এলাকাটিতেই বেসরকারীভাবে তেভাগার রাজত্ব কায়েম হয়ে গেলো । নাচোলের এই অঞ্চলটিতে তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের কর্তৃত্ব বাস্তবতঃ অসম্ভব শিথিল হয়ে এলো । জোতদাররা তেভাগার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা অথবা আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোন বাধা সৃষ্টি করার সবরকম ক্ষমতাই হারিয়ে ফেললো" ।[২১]

উপরের আলোচিত কৃষকদের সশস্ত্র আন্দোলনগুলোর কয়েকটি বৃটিশ যুগ থেকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথমদিক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কমিউনিষ্ট পার্টিও কোন কোন ক্ষেত্রে সশস্ত্র আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল । কৃষক আন্দোলনগুলির আদর্শ বিভিন্নমুখী হওয়া সত্ত্বেও এদের মূল ঐক্য ছিল ইংরেজ বিরোধিতা এবং সার্বিক কৃষকমুক্তি । বৃটিশ বিরোধী একটি কৃষক আন্দোলনের প্রচারপত্রে এর প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ

"আমাদের কুটির শিল্প ধ্বংসকারী, আমাদের তাঁতি ও কামারদের পেশা হরণকারী এই চোরদের (বৃটিশদের) আমরা কী করে নিজেদের শাসক হিসাবে স্বীকার করব। তারা তাদের দেশে তৈরী অজস্র পণ্য আমদানি করে, আমাদের বাজারে আমাদের জনগণের কাছে এগুলি বিক্রি করে, এভাবে আমাদের ধন-দৌলত লুট করে আমাদের জনগণের রুজি-রোজগার কেড়ে নেয়। যারা আমাদের মাঠের ফসল লুট করে, আমাদের অনাহার, জ্বর ও প্লেগের মধ্যে ঠেলে দেয় তাদের আমরা কিভাবে শাসক ভাবব যারা আমাদের উপর ক্রমাগত করের বোঝা চাপাচ্ছে সেইসব বিদেশীদের আমরা কিভাবে শাসকে স্বীকৃতি দেব ?

.... ভাইসব, আপনারা এগুলি যত সহ্য করবেন এই সঠয়া ততবেশী আপনাদের শোষণ করবে । আপনাদের শক্ত পায়ে দাঁড়াতে হবে, মুক্তির পথ খুঁজতে হবে । ভাইসব, আমরা দুনিয়ার সেরা জাতি । আমাদের ধনদৌলতেই তারা কাজ না করে নিজেদের মেদ বাড়াচ্ছে । এরা আমাদের রক্তপায়ী । আমরা কেন এইসব সহ্য করব ?

.... হিন্দু ভাইয়েরা কালী, দুর্গা, মহাদেব ও শ্রীকৃষ্ণের নামে শপথ করুন, মুসলমান ভাইরা আল্লাহ্‌র নামে কসম নিন আর গ্রামে গ্রামে আওয়াজ তুলুন- হিন্দু-মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের সেবা করবে ।

Dhaka University Institutional Repository

.... ভাইরা জাগুন । জন্মভূমির সুযোগ্য সন্তানের পরিচয় দিন, সাহসের সঙ্গে লড়াই করুন, বাংলা মায়ের জন্য প্রাণ কুরবাণি দিতে প্রস্তুত হন ।"[২২]

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় বাংলার সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহগুলি দীর্ঘদিনের প্রজা শোষণ ও বিভিন্ন রকম অনাচারের বিরুদ্ধে জাতীয় ও আঞ্চলিক অসন্তোষেরই বহিঃপ্রকাশ ছিল ।

পাকিস্তান ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাংলাদেশের কৃষক

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উচ্ছেদ করে আইন প্রণীত হলেও এতে কৃষকদের তেমন উপকার হয়নি। কারণ রাজস্বের আদায়ের সাথে জমিদারি ব্যবস্থার খাজনা আদায়ের পার্থক্য ছিলনা। নতুন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রই জমিদারে পরিণত হয় এবং তহশিলদারসহ অন্যান্য কর্মচারীরা কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা বা রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত থাকে। খাজনা আদায়কালে তারা নানাপ্রকার অতিরিক্ত আদায় শুরু করে । গ্রামাঞ্চলে ঘুষ ও দুর্নীতির ব্যাপকতা দেখা দেয়। ফলে জমিদারি প্রথায় মধ্যস্বত্বভোগী এবং জমিদারের নায়েব গোমস্তরা যে নির্যাতন চালাতো নতুন ব্যবস্থায় তা' লাঘব হয়নি । পূর্বে জমিদারের খাজনা বাকি পড়লে জমিদার অথবা নায়েব গোমস্তাদের কাছে সুপারিশ করে কৃষকরা স্থানীয় পরিচিত লোক হওয়ায় অনেক সময় তারিখ পিছাতে পারতেন । কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় তা সম্ভব ছিলনা। কারণ সরকারী কর্মচারীরা বেশীরভাগই ছিল অস্থানীয় এবং তাদের খাজনা আদায় পদ্ধতিও ছিল যান্ত্রিক । ১৯৫০ সালের দিকে প্রজাদের উপর জমিদারের নিয়ন্ত্রণ অনেকখানি শিথিল হয়ে এসেছিল । এর কারণ হিসেবে জমিদারের ক্ষয়িষ্ণুতা এবং জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকদের একের পর এক আন্দোলনকেই অভিহিত করা যায় ।

১৯৫০ সালের পূর্ববাংলা জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের দুটি প্রধান দিক হচ্ছে প্রথমতঃ এ আইনানুযায়ী জমির খাজনা গ্রহণের দায়িত্ব জমিদার শ্রেণীর পরিবর্তে সরকার নিজে গ্রহণ করে । এর ফলে প্রজারা সরকারকে সরাসরি খাজনা প্রদানের অধিকার পায় । দ্বিতীয়তঃ জমিদার বা কৃষক সবার জন্যই ১০০ বিঘার উপর জমির মালিকানাকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছিল । কিন্তু আবাদি প্রজা হিসেবে এমন প্রজাকে গণ্য করা হয়েছে যারা তার পুরো জমি নিজে চাষ করে, বর্গাদারকে দিয়ে চাষ করায় কিংবা ক্ষেতমজুরকে দিয়ে চাষ করায় ।

তখন এমন সব পরিবার কৃষক পরিবার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল যারা আবাদের সাথে কোনভাবেই যুক্ত ছিলনা । তারা দৈহিক পরিশ্রমতো করতইনা, চাষাবাদও দেখাশুনা করতনা এমনকি তাদের বাসস্থান মালিকানাধীন জমির কাছাকাছিও ছিলনা । ফলে অন্য পেশায় যুক্ত থেকেও বর্গা প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদিত

Dhaka University Institutional Repository

ফসলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভোগ করতে পারত । এ আইনে জমি ভাড়া দেওয়াকে নিষিদ্ধ করা হলেও বর্গা ব্যবস্থাকে জমি ভাড়া দেয়া হিসেবে বিবেচনা না করায় বড় খামারের মালিকরা বর্গাচাষ ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের ওপর একটি স্থায়ী অধিকার অর্জন করেছিল । এর ফলে এ আইনের মধ্যদিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে জমির উপর বহুদিন থেকেই যে কায়েমি স্বার্থ বিদ্যমান ছিল তা পুনরায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেল । ১৯৫০ সালের প্রজাস্বত্ব আইনটি কার্যকর হতে বেশ কবছর সময় লেগেছিল । এ আইনের ফলে ভূমিহীন বা ছোটকৃষক কিছু কিছু করে জমি পাওয়ায় ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা হ্রাস পায় । ১৯৪৪-৪৫ সালে ভূমিহীনের সংখ্যা যেখানে ৩০ শতাংশ ছিল ১৯৫০ সালের আদমশুমারিতে এ সংখ্যা ১৭ শতাংশে কমে আসে । কিন্তু পরবর্তীকালে ভূমিহীনতার হার হ্রাস না পেয়ে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তা বাড়তে থাকে । কারণ বর্গা ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ায় ভাগচাষীর উপর ক্রমাগত চাপ বাড়তে থাকে ।

এই আইনানুযায়ী কিছু জমি সরকারের খাস জমিরূপে রেকর্ড করার কথা থাকলেও বাস্তবে সেগুলি ব্যক্তিবিশেষের নামে দলিলভুক্ত করা হয়েছিল । আইয়ুব সরকার তার সামাজিক সমর্থনকে সম্প্রসারণ করার জন্য প্রজাস্বত্ব আইনের সর্বোচ্চ জমির সীমা ৩৩ একর থেকে বাড়িয়ে ১২৫ একরে পুনঃনির্ধারণ করে । সে সময় মাত্র ৪৩৯ টি পরিবারের কাছেই এর চেয়ে বেশী পরিমাণ জমি ছিল । ১৯৬২/৬৩ সালে ৩৭৫ বিঘার চেয়ে বেশী পরিমাণ জমির মালিক পরিবারের সংখ্যাছিল ৫২৯ টি । ১৯৬২ সালে রাষ্ট্রের খাস জমির পরিমান ছিল ৪ লাখ ৬৫ হাজার একর ।[২৩] কিন্তু খাস জমি ভূমিহীনদের পাওয়ার তেমন সুযোগ ছিলনা কারণ দূর্নীতিবাজ সরকারি কর্মচারীরা এত উঁচুহারে সালামী দাবী করতো যে তাদের পক্ষে তা মিটানো সম্ভব ছিলনা।

আসহাবুর রহমান লিখেছেন, "১৯৬০ সালের মধ্যেই পূর্ববাংলার কৃষি কাঠামো দেশবিভাগ এবং জমিদারি উচ্ছেদের ফলে সৃষ্ট সমতামূলক চরিত্র হারিয়ে ফেলে । ১৯৫১ সালে কৃষক গৃহস্থালির ৪১ শতাংশ মালিক চাষি, ৪৭ শতাংশ মালিক ভাগচাষি এবং ১২ শতাংশ ছিল পুরোপুরি বর্গাদার । ১৯৬০ সালে ১.৫ একরের কম জমির কৃষি খামারের সংখ্যা ছিল সকল কৃষি খামারের ৪১% এবং পুরো খামার এলাকার ১৬% । ৫ থেকে ২৫ একর জমি রয়েছে এমন খামারের সংখ্যাছিল সকল খামারের ২২% এবং পুরো খামার এলাকার ৫২% । ১৯৬০/৬৪ এর মাষ্টার সার্ভে অব এগ্রিকালচার (দ্বিতীয় পর্যায়) এর জরিপে দেখা যায় ০.৭৫ একরের নিচে জমি রয়েছে এমন সকল গ্রামীণ গৃহস্থালীর সংখ্যা ৪২.১% । কিন্তু তাদের আওতায় মোট আবাদি জমি আছে মাত্র ২.৩%। গড়ে ২ একরের কম জমি আছে এমন গৃহস্থালি সকল গ্রামীণ গৃহস্থালীর ৬২.৬% এবং তাদের আওতায় ছিল মোট আবাদি জমির ৯.৫% । ১৯৬১-৬২ সালে লক্ষীপুর জেলার একটি গ্রামে পরিচালিত কৃষিখাতে বেকারত্ব বিষয়ক জরিপে দেখা যায় যে, সকল গ্রামীণ গৃহস্থালীর

Dhaka University Institutional Repository

৪০.৩% প্রায় ভূমিহীন (০.০০-০.৪৯ একর)। এ তথ্য মাস্টার সার্ভে অব এগ্রিকালচার (দ্বিতীয় পর্যায়) এ প্রাপ্ত উপরে উল্লিখিত প্রায় ভূমিহীন গৃহস্থালির সংখ্যার (৪২.১%) কাছাকাছি"।[২৪]

এসব নানাকারণে এই আইন অনুসারে জমি পুনর্বন্টনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন ইতিবাচক প্রভাব পড়েনি। কিন্তু প্রভাব পড়েছিল আয় পুনর্বন্টনের ক্ষেত্রে । জমির উন্নয়নের জন্যও কিছু করা হয়নি। রাজস্ব আদায়ে নিয়োজিত সরকারের নিম্নপর্যায়ের কর্মচারী অর্থাৎ তহশিলদারেরা জমিদারের অত্যাচারী নায়েব গোমস্তাদের তুলনায় কম অত্যাচারী ছিলনা। তৎকালীন একটি সরকারি রিপোর্টেই এদের সম্পর্কে বলা হয়, " .... We are told in many places by ordinery people that the tahsilders are really Zamindars in a new grab with all their operession and they are all the more powerful and dangerous as they have the authority of government behind them."[২৫]

তৎকালীন সময়ে বড় খামার মালিকগণ বর্গাজমির ফসলি খাজনা গ্রহণ, ঋণের জন্য চড়া হারে সুদ গ্রহণ এবং তহসিলদারদের মধ্যস্থতায় দুর্বল জনগোষ্ঠীর জমি অধিগ্রহণসহ এধরনের নানারকম কাজ করতো । ফলে এ-আইনটি তৎকালীন কৃষি কাঠামোতে তেমন কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি । গ্রামে একটি নতুন পরজীবী শ্রেণী গড়ে উঠে যাদের থেকে আগের দিনের জমিদারদের পার্থক্য খুব সামান্য । এ ব্যাপারে বিমল কুমার সাহার মন্তব্য ঃ

..."the Act could bring perceptible changes in the sphere of power structure in favour of jotedars and rich tenants by eliminating the parasitic class of Lamindars the old feudal tanded class." [২৬]

নিম্নে জোতদারদের শোষণমূলক ভূমিকা এবং অন্যান্য কারণে ষাটের দশকে ভূমি বিন্যাসে যে পরিবর্তন সূচিত হয় তা আলোচনা করা হল ।

ঐ সময় গ্রামের বিপুল সংখ্যক মানুষ ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকে পরিণত হয় । বড় কৃষকরা প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক হয় এবং মাঝারি কৃষক পরিবারের আয়তন ছোট হয়ে আসে । এটাই ছিল সে সময় গ্রামের সাধারণ প্রবণতা। তখন ক্ষুদ্র খামার মালিকদের খামার আয়তন ছোট হওয়ায় নিজেরা চাষ করলেও অন্য কোন পেশার সাহায্য ছাড়া তাদের পক্ষে পারিবারিক খরচ মিটানো সম্ভব হত'না। তাই কৃষি মজুরি বা অন্য কিছুকে পার্শ্বপেশা হিসেবে বেছে নিতে হত । ষাটের দশকে কৃষি বহির্ভূত পেশার গণ্ডি সীমিত থাকায় উপার্জনের দিক থেকে তা ছিল অনিশ্চিত। ফলে যে কোন সংকট বা প্রয়োজনের সময় জোতদার বা ধনী পরিবারের কাছে ঋণ বা সাহায্যের জন্য যেতে হত। ফলে যেকোন শর্ত মেনে নিয়েই তাদেরকে ঋণ বা

Dhaka University Institutional Repository

সাহায্য দিতে হত। সে সময় বর্গা পাওয়ার ক্ষেত্রে চাষীর প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেয়া হত না। যার পক্ষে ভাল ফলন দেয়া সম্ভব হত তার পক্ষে জমি বর্গা পাওয়া সহজ ছিল। ফলে ক্ষুদ্র খামার মালিকদের শেষ সম্বলটুকুও হাতছাড়া হয়ে যেত। তখন মাঝারি খামারের মালিকগণ জোতদারদের দ্বারা কেবল ফসলী খাজনার মাধ্যমেই শোষিত হয়নি, তাদেরকে জোতদারদের ক্ষমতা প্রয়োগ ও বিস্তারের ক্ষেত্রেও নির্ভরযোগ্য মিত্র হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল ।

তৎকালীন সময়ে বড় খামারগুলির সংখ্যা অল্প হওয়া সত্ত্বেও এদের অধীনেই গড়ে এক তৃতীয়াংশ জমি চাষ হত । এই আবাদকৃত জমির মধ্যে বর্গা নেয়া জমির পরিমাণও কম ছিলনা । কৃষি উপকরণ ও কৃষি যন্ত্রপাতির ওপর মালিকানার ধরনের দিকে লক্ষ্য করলেই বড় খামারগুলির মাঝেও কি করে জমি বর্গা নেওয়ার প্রবণতা ছিল তা বুঝা যায় ।

কৃষি ব্যবস্থায় অন্যতম একটি কৃষি উপকরণ হচ্ছে গবাদি পশু । ষাট দশকের (National sample survey third round) এর তথ্যে দেখা যায়, শতকরা ৩৭ ভাগ খামারের অধীনে সে সময় কোন গবাদী পশু ছিলনা।[২৭] উক্ত sample survey এর তৃতীয় রাউন্ড এর রিপোর্ট অনুযায়ী শতকরা ৬৮ ভাগ গ্রামে গবাদি পশুর অভাব ছিল এবং সে কারণে কৃষকদের জমি চাষ করতে খুবই অসুবিধা হত।[২৮] এজন্য তাদেরকে কঠিনতর দৈহিক পরিশ্রম করে জমি চাষ করতে হত নতুবা বিত্তবানদের কাছ থেকে গবাদিপশু ধার নিয়ে জমি চাব করতে হত। ফলে এ পরিস্থিতি ছোট খামারগুলিকে বড় খামারগুলির সাথে নির্ভরশীল সম্পর্কের একটি ক্ষেত্র তৈরী করতে বাধ্য করেছিল ।

কৃষি উৎপাদনের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে লাঙ্গল । ১৯৬০ সালের কৃষিশুমারী অনুযায়ী এ সময় মোট খামারগুলোর এক তৃতীয়াংশের মালিকানায় কোন লাঙ্গল ছিল না।[২৯] ১.০০ একর কিংবা তার কম পরিমাণ জমির খামারগুলির মালিক মোট খামারের এক চতুর্থাংশ হওয়া সত্ত্বেও এদের মাত্র শতকরা ১৬.৭ ভাগের কাছে লাঙ্গল ছিল । আবার যে সকল খামারের আয়তন ৫.০০ একর বা তার চেয়ে বেশী তাদের শতকরা প্রায় ১০০ ভাগের কাছেই লাঙ্গল ছিল । গড়ে ৫.৫ টি লাঙ্গল ছিল ৪০ একরের চেয়ে বেশী খামার মালিকদের । গড়ে ৩.৫টি লাঙ্গল ছিল ২৫-৪০ একর আয়তনের খামার মালিকদের । এ থেকেই বুঝা যায় ঐ সময় বড় খামারগুলির কাছে লাঙ্গল কি নিদারুনভাবে কেন্দ্রীভূত ছিল । ফলে বিপুল সংখ্যক লাঙ্গলহীন খামার মালিক বড় খামারগুলির ওপর নির্ভরশীল ছিল। এ নির্ভরতা পরবর্তী চার বছরে একটুও কমেনি।[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলের প্রান্তিক ও ছোট খামার মালিক এবং মাঝারি খামার মালিকগণ দারিদ্রের কারণে জোতদারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল । সে সময় ছোট ও প্রান্তিক খামারের প্রধান অংশই এ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল । তাদের বিনিয়োগ করার কোন ক্ষমতা ছিলনা । প্রতিবছর তাদের পরিবারে ঘাটতি পড়ত বিধায় তা পূরণ করতে গিয়ে তাদের জমির একাংশ হাতছাড়া হয়ে যেত। এই জমি হারানোর প্রক্রিয়া ভূমিহীন হবার আগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকতো । সেসময় গ্রামীণ দরিদ্র কোন পর্যায়ে ছিল তা নিম্নের সারণীতে পরিবেশিত আয় বন্টনের দিকে লক্ষ্য করলেই বুঝা যাবে ।

সারণী ৩.১

১৯৬১ সালে পূর্ব বাঙলার গ্রামাঞ্চলে আয় বিতরণের চিত্র[৩১]

ক্রমিক নম্বর	আয় গ্রুপ	সংখ্যা	সমগ্র পরিবারের শতাংশ	আয়	সমগ্র আয়ের শতাংশ
১	২৫ টাকার নিচে	২১	১.৬	৪৮৩	০.১
২	২৫-৮৯ টাকা	১৮৩	৯.২	৮৮৬৭	২.৯
৩	৫০-৭৪	৩১০	১৫.৬	১৮৬০০	৬.১
৪	৭৫-৯৯	২৯৫	১৪.৯	২৪৪৮৫	৮.১
৫	১০০-১২৪	২৬৯	১৩.৬	২৮৭৮৩	৯.৩
৬	১২৫-১৪৯	২১৬	১০.৯	২৮০৮০	৯.২
৭	১৫০-১৯৯	২৭৭	১৪.০	৪৭০৯০	১৫.৫
৮	২০০-২৪৯ টাকা	১১৮	৫.৯	২৬০৭৮	৮.৬
৯	২৫০-২৯৯ টাকা	৯২	৪.৬	২৪৯৩২	৮.২
১০	৩০০-৩৯৯ টাকা	৯৬	৪.৮	৩১২০০	১০.৩
১১	৪০০-৫০০	৪৩	২.১	১৯১৬৮	৬.৩
১২	৫০০ টাকার উর্ধে	৫৭	২.৮	৪৪৫১৭	১৪.৭

- আয় বলতে এখানে মাসিক আয় ধরা হয়েছে ।

উৎস ঃ বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৩৮

উপরের সারণীতে দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে মাসিক আয় ৭৫ টাকার নীচে ২৬.৪% পরিবারের । এই আয়ে তাদের ন্যূনতম খাদ্য সংস্থানও হয়না। আবার ১.৬% পরিবারেব মাসিক আয় ২৫ টাকারও নীচে ।

Dhaka University Institutional Repository

অতএব, দেখা যায় এক চতুর্থাংশেরও বেশী পরিবার অভুক্ত এবং অর্ধভুক্ত অবস্থায় দিন কাটায় । যাদের মাসিক আয় ৭৫ টাকার উপরে ছিল তাদের অবস্থাও শোচনীয় ছিল। সারণী অনুযায়ী ৮৭.৭% পরিবারের মাথাপিছু গড় মাসিক আয় ২৮ টাকায়ও কম আর ৪.৯% ধনী পরিবারের মাসিক আয় সমগ্র আয়ের ২১% ভাগ ।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের যাদের মাসিক মাথাপিছু আয় ২৮ টাকা ছিল তারা তখন দারিদ্রসীমার অনেক নীচে অবস্থান করছিল । তাদের পক্ষে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে কৃষি উৎপাদনে বিনিয়োগ করার কোন ক্ষমতা ছিলনা । এসব পরিবার যে কৃষি উৎপাদনের সাথে যুক্ত ছিল এমন নয়; এদের অনেকেই কৃষিমজুর বা অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত ছিল । এথেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিবার তখন অর্থনৈতিকভাবে অন্য শ্রেণীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল ।

লেনিন আজাদের ভাষায়,

" তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা যখন এরকম ছিল তখন সরকারের পক্ষ থেকে এ সকল সমস্যার সমাধান করার কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়নি । বরং বিভিন্ন অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন গ্রামাঞ্চলের শ্রেণী বৈষম্যকে তীব্রতর করে তোলা হয়েছে তেমনি অন্যদিকে, সরকারের সামাজিক ভিত্তি গড়ে তোলার লক্ষে একশ্রেণীর বিত্তবান ব্যক্তির কাছে ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে । সে সময় প্রয়োজন ছিল সহজশর্তে ঋণ প্রদান করা, খোদ কৃষকের কাছে জমি প্রদান করা অথবা অন্তত খোদ কৃষকদের কাছ থেকে জমি হাতছাড়া যাতে না হতে পারে তার ব্যবস্থা করা এবং উৎপাদনের উপকরণ যাতে খোদ কৃষকদের হাতে পৌঁছতে পারে তার ব্যবস্থা করা । ঠিক সে সময় এসব কিছু না করে সরকার মৌলিক গণতন্ত্রীদেরকে খুশী রাখার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করেছে । এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে এই মৌলিক গণতন্ত্রী ও তাদের সহযোগিরা মিলে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামাঞ্চলে গড়ে তুলেছিল ক্ষমতার এমন একটি শক্ত প্রাচীর যাকে ভেদ করে কৃষক সমাজের নিজের দাবীর কথা বলা এবং সেই জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল।"[৩২]

তখন মৌলিক গণতন্ত্রী ও তাদের সহযোগীরা কৃষকদের মধ্যে তীব্র শ্রেণীঘৃণার কারণ হয়েছিল । তখন মেম্বার-চেয়ারম্যান তথা সকল মৌলিক গণতন্ত্রীর শ্রেণী অবস্থানও এমন ছিল যে তাদের নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ সাধারণ কৃষকদের স্বার্থের অনুকূলে ছিলনা ।

Dhaka University Institutional Repository

বড় খামার মালিকদের বেশীর ভাগই ছিল মৌলিক গণতন্ত্রী। তখন ৪২.৪০% মৌলিকগণতন্ত্রীদের খামার আয়তন ছিল ১৩.৫ একরের উপরে এবং ২০.৪১% এর খামার আয়তন ছিল ৭.৫-১২.৫০ একরের মধ্যে। মৌলিক গণতন্ত্রীদের শতকরা ২১.১৭ ভাগের খামার আয়তন ছিল ৫.০-৭.৫০ একর, ১২.২৬% এর খামার আয়তন ছিল ২.৫-৫.০ একর এবং বাকী ২.২৯% এর জমির পরিমাণ ছিল ১.০-২.৫০ একর । কোন মৌলিক গণতন্ত্রীরই ১ একরের নীচে খামারের আয়তন ছিলনা ।

মৌলিক গণতন্ত্রীদের বেশীর ভাগ নির্বাচিত হয়েছিল বড় খামার মালিকদের মধ্য থেকে । মাত্র ২.২৯ ভাগ মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিল ছোট খামার মালিকদের পক্ষ থেকে । গ্রামাঞ্চলের প্রায় ৫০ ভাগ পরিবার ছিল ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক, কিন্তু তাদের পক্ষ হতে কোন ব্যক্তিই মৌলিকগণতন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হয়নি অর্থাৎ তাদের পক্ষে স্থানীয় সরকারে কোন প্রতিনিধিত্ব ছিলনা ।

মৌলিক গণতন্ত্রীদের সরকার নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকায় সরকার তাদেরকে খুশী রাখত । ওয়ার্কস প্রোগ্রামের ওপর কোন জবাবদিহিতা নেয়ার ব্যবস্থা ছিলনা। হিসাব নিকাশের ক্ষেত্রেও কোন নিয়ন্ত্রণ ছিলনা । এতে ওয়ার্কস প্রোগ্রাম তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল এবং এ প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে নিয়োজিত মৌলিক গণতন্ত্রী ও বড় খামার মালিক ফুলে ফেপে উঠেছিল।[৩৩] সরকারী হিসাব অনুযায়ী ওয়ার্কস প্রোগ্রামে ১৯৬৪-৬৫ সালে যত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল তার শতকরা ১৮.৩৯ ভাগ অপচয় হয়েছিল।[৩৪]

রেহমান সোবহান দেখিয়েছেন ওয়ার্কস প্রোগ্রামের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় মৌলিক গণতন্ত্রী ও প্রশাসনের কর্মচারীগণ বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাৎ করত এবং তাদের ইচ্ছামত হিসাব প্রদান করত । এর মধ্যদিয়েই ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানরা বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিল । ফলে দেখা যায় নিঃস্ব অবস্থায় যে মৌলিক গণতন্ত্রী চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিল কয়েক বছরের মধ্যে তাদের বার্ষিক আয় ৪০ হাজার টাকারও উপরে দাঁড়িয়েছিল।[৩৫]

মৌলিক গণতন্ত্রী ও তাদের সহযোগীগণ ওয়ার্কস প্রোগ্রামের টাকা আত্মসাৎ করত এবং এ আত্মসাৎ করা অর্থ তারা উৎপাদন বৃদ্ধির কাজেও বিনিয়োগ করেনি । ওয়ার্কস প্রোগ্রাম শুরুর পরে গ্রামীণ কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার কোন ইতিবাচক পরিবর্তন না হয়ে বরং এ সময়ে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল ।

লেনিন আজাদের মতে, "ওয়ার্কস প্রোগ্রামের কারণে গ্রামের ক্ষুদ্র একটি শ্রেণীর লাভ হয়েছিল। কিন্তু এ লাভের খেসারত দিতে হয়েছিল সমগ্র গ্রামবাসীকে । শুধু ফয়ের ক্ষেত্রে খেসারত দিয়েই তারা পার পায়নি । তাদেরকে রাজস্বের ক্ষেত্রেও বিপুল পরিমানে খেসারত দিতে হয়েছিল" ।[৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

ষাটের দশকে কর ও খাজনার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় কৃষকরা প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে । সেসময় গ্রামের মানুষের গড় আয় ও সঞ্চয়কারী পরিবারের সংখ্যা কমতে থাকে । প্রজাস্বত্ব আইন চালুর পূর্বে কৃষকদের কাছে জমিদারের পাওনা ছিল ৮ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা কিন্তু ১৯৫৮ সালের পর থেকে খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭০ এর দিকে তার পরিমাণ ১৮ কোটি ৫০ লাখ টাকায় দাঁড়ায়।[৩৭]

ষাটের দশকে খাজনা পরিশোধ না করলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হত । ১৯৫০ সালের প্রজাস্বত্ব আইনানুযায়ী খাজনা পরিশোধ না করলে জমি নিলামে দেয়া যেত । ১৯৬১ সালে তা পরিবর্তন করে আরো কঠোর করা হয় । নতুন আইনানুযায়ী খাজনা না দিলে প্রথমদিকে বডি ওয়ারেন্ট জারি করা হত । পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি যেমন মালপত্র নিলামে দেয়া হত । গবাদি পশু সহ অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হত।[৩৮] এধরনের অত্যাচার নির্যাতন করেও খাজনা আদায় করা সম্ভব হতনা । ১৯৭১ সালে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত খাজনা আদায় করার জন্য সারা বাংলাদেশে কৃষকদের ওপর ৬০ লাখ মামলা চলছিল ।

ষাটদশকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল প্রচণ্ডভাবে পশ্চাৎপদ । কৃষকগণ মহাজনি ঋণে জর্জরিত । খাজনা ট্যাক্সের ক্রমবর্ধমান চাপ এবং এসকল দাবি মেটাতে না পারার ফলে কৃষকদের উপর নেমে এসেছিল নির্বিচার ক্রোক ও ধন-সম্পত্তির লুণ্ঠন । জোতদারি ও মহাজনি শোষণের ফলে কৃষকরা ব্যাপকহারে জমি হারিয়ে বর্গাদারে পরিণত হচ্ছিলেন ।

যে কৃষকরা জমি হারিয়ে বর্গাদার হিসাবে জমি চাষ আবাদ করছিলেন তারা পরিণত হতে থাকেন কৃষি শ্রমিকে । মৌলিক গণতন্ত্রীগণ এসব অন্যায়ে নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং এই মৌলিক গণতন্ত্রীরাই গ্রামাঞ্চলে আইয়ুবী স্বৈরশাসনের প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছিল। এসব মৌলিক গণতন্ত্রীগণ একদিকে যেমন বড় খামারের মালিক ছিল তেমনি অন্যদিকে তারা ছিল প্রধান প্রধান গোষ্ঠীর প্রতিনিধি । রাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার কারণে তারা প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। তাদের নিয়ন্ত্রণেই থাকত চৌকিদার দফাদার তথা গ্রাম পুলিশ এবং এদের সাহায্যে তারা যেকোন ধরনের বলপ্রয়োগ করত জনসাধারণের উপর । বলা যায় আইয়ুব খান তাঁর ভূমিনীতির ও কৃষিনীতির মাধ্যমে যে প্রক্রিয়া জারি করেছিলেন তাঁর পরিণতিতে কৃষক সমাজের ভাঙন প্রকৃতপক্ষে আরও তরান্বিত হয়েছিল । একদিকে ভূমি মালিকদের হাতে জমি এবং উপাদানের অন্যান্য উপকরণ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল এবং অপরদিকে ভূমিহীন কৃষি মজুরদের সংখ্যা বাড়তে থাকে ।

Dhaka University Institutional Repository

আইয়ুব খান পূর্ব বাংলার কৃষি অর্থনীতিকে রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর নীতি ১৯৬৮ সালের দিকে অকার্যকর হয়ে পড়েছিল । ১৯৬৮-৬৯ সালের ব্যাপক গণআন্দোলনে আমরা তার প্রতিফলন দেখতে পাই । লেনিন আজাদের ভাষায়, "রাষ্ট্রযন্ত্র, মৌলিক গণতন্ত্রী এবং জোতদার মহাজনসহ অপরাপর শোষকশ্রেণী গ্রামীণ সমাজে যে ক্ষমতার আবর্ত (Ring) তৈরী করেছিল তার প্রভাব শহুরে সমাজে, বিশেষতঃ ছাত্রদের ওপর না পড়ে পারেনা। কেননা সে সময় মোট ছাত্রদেরতো বটেই , এমনকি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের প্রধান অংশ এসেছিল গ্রাম থেকে । কৃষক পিতার উপর বিপুল হারে খাজনা ট্যাক্সের বোঝা আর অর্থকরী ফসলের নিম্ন মূল্যের কারণ তাদের অনেকের নিকটই অজানা ছিলনা । তাই একথা সহজেই অনুমান করা যায়, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানকালে লাখ লাখ শহুরে ছাত্র জনতা যে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল, তা গ্রামীণ জনসাধারণের জীবন সংগ্রামের সাথে সম্পর্কহীন ছিলনা" ।[৩৯]

বাংলার কৃষক সমাজ আজীবন সংগ্রাম করে তারা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে । আর এজন্য তাদেরকে প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে । যুগ যুগ ধরে বাংলার কৃষক সমাজ শোষিত ও নির্যাতিত হওয়ার ফলে তারা দারিদ্র হতাশা ও বঞ্চনার শিকার । আর এই বঞ্চনা দারিদ্র হতাশা থেকেই তাদের মধ্যে চেতনা, ক্ষোভ, দ্বন্দ্ব দেখা দেওয়ায় একপর্যায়ে তারা প্রতিবাদী হয়ে উঠে এবং পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয় ।

উপরে দীর্ঘ আলোচনায় আমরা দেখতে পাই দারিদ্র উৎসারিত নির্যাতনের বিরুদ্ধে কৃষকরা প্রতিরোধ প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ করায় অস্থিরতা দেখা দেয় ।

Dhaka University Institutional Repository

"বর্তমান প্রেক্ষাপট"

ভূমিকা ঃ বর্তমান এই আধুনিকযুগে কৃষিক্ষেত্রে অনেক আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে অধিক উৎপাদনের জন্য । বর্তমানে পৃথিবীতে দ্রুতগতিতে জনসংখ্যা বাড়ছে । তাই তাদের খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করার জন্য কৃষিক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা হচ্ছে । কিন্তু বাস্তবে প্রয়োগ করতে যেয়ে অনেকক্ষেত্রেই মানবিকতার চেয়ে ব্যবসাকে তথা স্বার্থসিদ্ধিকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে ।

আর এতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তৃতীয়বিশ্বের গরীব কৃষককূল । নিম্নের আলোচনা থেকে বিষয়টি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যাবে ।

বর্তমান কৃষিক্ষেত্রের অনেক আধুনিক প্রযুক্তির একটি হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তি । এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্পসময়ে অধিক এবং বড় বড় শস্য, ফল সবজি, মাছ, হাঁস-মুরগী, গরু ইত্যাদি উৎপাদন করা যায় । স্বাভাবিকের চেয়ে বড় খাদ্য সামগ্রীকে জেনেটিক ফুড বা জিমফুড এবং এদের বীজকে জিই বীজ বলে । এই প্রযুক্তি সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে । বিজ্ঞানীরা এ প্রযুক্তি নিয়ে দ্বিধা-বিভক্ত এবং এ নিয়ে নানা বিতর্কও দেখা দিয়েছে । কারণ (১) জিন ট্রান্সফার করে উদ্ভাবিত জেনেটিক ফুডের মাধ্যমে মানবদেহের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। (২) জিই বীজ প্রতিবছর ক্রয় করতে হবে বীজ উৎপাদনকারী দেশ থেকে । তাছাড়া আরও অনেক কারণ রয়েছে ।

এই প্রযুক্তির উদ্ভাবকগণ বলছে, জিমফুড বা জিই বীজ বিশ্বকে ক্ষুধামুক্ত করতে সহায়ক হবে । আর যারা এর বিরোধিতা করছে তারা বলছে এ প্রযুক্তি কৃষকদের ক্ষমতাহীন করে দেবে এবং তারা বীজ উৎপাদনকারীদের কাছে জিম্মি থাকবে। কারণ গরীবদেশ এ জটিল প্রযুক্তিতে বীজ উৎপাদন করতে পারবেনা । হাইব্রীডের মত এই বীজ রেখে ব্যবহার করলে ফলন হয়না ।

সুবিধা

জিই বীজ ব্যবহার করলে ফলন ১০ গুণ বেশী হয় এবং লোনামাটি ও খরা এলাকায় ফলন ভালহয়। ইচ্ছানুযায়ী কাংক্ষিত গুণসম্পন্ন ফসল উৎপাদন করা যায় । এটি রোগ প্রতিরোধক বীজ। বীজে ইচ্ছামত পুষ্টি সংযোজন করা যায় । ভ্যাকসিন সংরক্ষিত ফসল দ্রুত ফলন দেবে এবং খেলে দ্রুত ওষুধের কাজ করবে। এ বীজ পোকামাকড় ও আগাছা প্রতিরোধী ।

Dhaka University Institutional Repository

অসুবিধাঃ

জিই বীজ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর । জিই বীজে প্রায়ই এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধক জিন ব্যবহার করা হয় বলে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে । এই প্রযুক্তি উন্নত হওয়ার কারণে কৃষক ও উন্নয়নশীল দেশ তা উৎপাদন করতে পারেনা । ফলে উৎপাদনকারি দেশের কাছে জিম্মি থাকতে হয় । এ বীজ বার বার ফলানোর ফলে তাদের নিজস্ব কীটনাশক গুণ দিয়ে নতুন ধানের কীট জন্ম দিতে পারে এবং কীটনাশক প্রতিরোধী হয়ে উঠার সম্ভাবনা থাকে । জেনেটিক ফুডে স্বাদ কম, জিই বীজ চাষ করতে লাগে, কীটনাশক ও পানি বেশী লাগে । এটি টেকসই প্রযুক্তি না।[৪০]

এসব নানা কারনে জিই বীজ বা ফুড নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল । জানুয়ারী ২০০১ সালে ম্যানিলাতে প্রায় একশতাধিক দেশের কৃষিবিদ বিজ্ঞানী, কৃষক, ফার্মের মালিক জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তির বিরোধিতা করার জন্য সমাবেশে উপস্থিত হয়েছিলেন । বর্তমানে ইউরোপের অধিকাংশ কৃষক জিই বীজ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখছে । সাধারণ প্রযুক্তিকেই তারা ভাল মনে করছে । ভারত মনে করে জিই বীজের যে জিন আছে তা আত্মধ্বংসী এবং এই জিন বীজকে নিষ্ফলা করে দেয় । আফ্রিকান বিজ্ঞানিরা মনে করেন, এই বীজ প্রয়োগের মাধ্যমে টেকসই কৃষিব্যবস্থা ধ্বংসের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা মনে করেন যদি কোন জমিতে জিই গম বীজ বপণ করা হয় তবে এর কাছাকাছি অন্য জমির প্রাকৃতিক গম বীজও দূষিত হবে । সংবাদপত্রের খবর থেকে জানা যায়, বৃটেনের যে সব জমিতে জিই বীজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছিল, সেসব জমি দেখে এখন মনে হয় সেখানে ধ্বংসযজ্ঞ চলছে । দি ইউনিয়ন অব কনর্সানও সায়েন্টিষ্ট যতগুলো কেস নিয়ে স্টাডি করেছে, তাদের শতকরা ৯৩ ভাগই দেখা গেছে জেনেটিক ফুড উৎপাদনের পিছনে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবসা। মনসানটো কোং জেনেটিক ফুডের জনপ্রিয়তা বাড়ানোর লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ করেছিল ১২৬ কোটি ডলার। আফ্রিকানদের মতে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো তাদের নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে এই ধ্বংসাত্মক কাজে নেমেছে। বিশ্বের দারিদ্র দেশগুলোতে তারা বীজ রফতানীর চেষ্টা করছে । জিই বীজের কর্তারা ৮৭টি দেশে পেটেন্টের জন্য আবেদন করেছেন, যাতে বাজারজাত করা সহজ হয়।

৩ বছর আগে বাংলাদেশে কৃষি মন্ত্রণালয় ৪টি কোম্পানীকে হাইব্রীড আমদানী করে দেশে টেকসই করার অনুমোদন দেয় । কোম্পানীগুলো বীজ বিক্রি করে ব্যবসা করেছিল কিন্তু টেকসই করেতে পারেনি । হাইব্রিড বীজ ব্যবহার করে গত ৩ বছরে প্রচুর কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল । জিই বীজ আমদানী করলে এর চেয়ে বেশী ক্ষতি হবে দেশ ও দেশের কৃষক।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে সারাবিশ্বে হাইব্রিড, জেনেটিক, হরমোনাইজড ও সিনিক ফুডের ছড়াছড়ির কারনে প্রকৃতি ভারসাম্য হারাচ্ছে, মানুষের নতুন নতুন রোগের সৃষ্টি হচ্ছে। জেনেটিক ফুড মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর এটা প্রমাণিত হবার পর সারাবিশ্বের মানুষের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে । প্রকৃতিবিদরা মনে করেন জেনেটিক ফুড তৈরী বন্ধ করে দেয়া উচিত কারণ এর ফলে জৈব বৈচিত্র হ্রাস পাচ্ছে এবং প্রকৃত প্রজাতির খাদ্যদ্রব্যের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাচ্ছে ।

বাংলাদেশে উন্নত প্রযুক্তি

'৬০ এর দশকের শেষ দিকে বাংলাদেশে HYV বা উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ধান চাষের শুরু হয় । বর্তমানে ৫০ শতাংশেরও বেশী ধানী জমিতে উফশী ধানের চাষ হচ্ছে। আগে জমির স্বাভাবিক উর্বরা শক্তির উপর নির্ভর করেই ধান চাষ হত । উফশী ধান চাষের সাথে রাসায়নিক সার, সেচের পানি, বালাই নাশক ওষুধ ও কৃষিঋণ ইত্যাদি উপাদান জড়িত। এই ধান চাষের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও আশির দশকের পর থেকে উৎপাদন সে হারে বাড়েনি। অতিরিক্ত সারের ব্যবহারই জমির উর্বরা শক্তি হ্রাসের কারণ । ১৯৮২-৮৩ সালে প্রতি কেজি সার ব্যবহার করে ২৪ কে.জি. ধান উৎপাদিত হয়েছিল। কিন্তু ১০ বছর পরে তা কমে ১২.৯০ কেজিতে দাঁড়ায়।[৪১]

ষাটের দশক থেকেই বাংলাদেশের কৃষিখাতে পরিবর্তন সূচিত হয়। উফশী (উচ্চ ফলনশীল) চাষ করলে খাদ্য উৎপাদন বাড়বে আর খাদ্য উৎপাদন বাড়লে ক্ষুধা সমস্যা দূর হবে এ ধারণা থেকেই বাংলাদেশের মতো পৃথিবীর অনেক দেশ দেশীয় পদ্ধতির কৃষিতে পরিবর্তন এনেছিল। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে এ পরিবর্তন প্রান্তিক চাষীকে ভূমিহীন করেছে এবং জীবন নির্বাহী কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরিত করেছে। সেই পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বৃগিতে এরলার লিখেছেন,"তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই গ্রামে বাস করে এবং কৃষি কাজের মাধ্যমে জীবন ধারন করে । বাংলাদেশে কৃষিতে আধুনিকীকরণ করার জন্য সেখানকার ছোট ও প্রান্তিক চাষীদের জমির উপর অধিকারটা কেড়ে নেয়া হয়েছে। অথচ সেটাই ছিল তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার একমাত্র সম্বল। কৃষিক্ষেত্রে বাণিজ্যিকীকরনের ফলে আফ্রিকার একটা বিরাট অঞ্চলের জমিতে নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য উৎপাদনের বদলে ইউরোপের বাজারে বিক্রির উপযোগী প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও পণ্য তৈরী হচ্ছে। যেমন ঃ সাহেল এলাকার জমিগুলিতে উঁচু জাতের বরবটি, মরক্কোর জমিতে অসময়ের স্ট্রবেরি ইত্যাদি ইউরোপের বাজারের জন্য চাষ হওয়ার ফলে স্থানীয় লোকদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য চাষে জমি কমে গিয়েছে। এই ব্যাপারটা চাষীদের এমন একটা বাজারের উপর নির্ভরশীল করে তোলে যে বাজারটা বহুদূরে অবস্থিত এবং সে বাজারটাকে তাঁরা কোনভাবে প্রভাবিত

Dhaka University Institutional Repository

ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা । এর উপর আবার যখন খাদ্যশস্য সাহায্যের সুবাদে তাদের নিজেদের খাদ্যশস্য উৎপাদন অলাভজনক হয়ে দাঁড়ায় তখন সরাসরি মৃত্যু নেমে আসে ওই ছোট ও প্রান্তিক চাষীদের উপর।"[৪২]

আধুনিক প্রযুক্তিতে চাষাবাদ করে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও তা দারিদ্র মানুষের ক্ষুধা সমস্যার সমাধানে কাজে আসেনি । ধনী ও উন্নত দেশগুলো তাদের প্রয়োজনে, স্বার্থে যেসব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে এগুলো দারিদ্র দেশে বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে প্রায়ই নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ফেলেছে । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ইউরোপীয়দের জন্য বাংলাদেশে যে চিংড়ী চাষ হচ্ছে তা দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি জমিকে লবণাক্ত করছে এর ফলে ভবিষ্যতে ধান চাষের অনুপযোগী হয়ে উঠছে ।

বাংলাদেশে 'সবুজ বিপ্লবের' প্রসার, বিস্তার এবং কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরনের জন্য বি.এ.ডি.সি. স্থাপন করা হয় এবং এই প্রযুক্তির প্যাকেজের একটি উপাদান সার যা বি.এ.ডি.সি. এর শুরু হতে ডিলারশীপের মাধ্যমে কৃষকদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।[৪৩] আর এই রাসায়নিক সারের সংকট দেখা দিয়েছিল ১৯৯৫ সালে । যার ফলে কৃষকরা সার না পেয়ে ঐ মৌসুমে সারা দেশব্যাপী মিছিল সড়ক অবরোধ করে । তাছাড়া সার লুট করে ও প্রশাসনের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় । তৎকালীন পত্রিকার খবর অনুযায়ী সারাদেশে এই সংঘর্ষে ১৭ জনের মৃত্যু ঘটে । এই সার সংকট তখন রাজনীতিকে অস্থিতিশীল করেছিল । সচেতনতা থেকেই কৃষকরা প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিল । আর গরীব কৃষকরাই সবসময় ক্ষতিগ্রস্ত হয় । যেমন বড় কৃষকরা যাদের নিজস্ব জায়গা জমি আছে তারা কোন না কোন ব্যবসার সাথে যুক্ত । টাকা পয়সা বেশী থাকায় সবুজ বিপ্লব প্রযুক্তির সুবিধাও তারা বেশী ভোগ করতে পারে । তাদের অনেকেই কলের লাঙ্গল বা স্যালো মেশিনের মালিক । ফসল উৎপাদনের জন্য ধনী কৃষক ও বর্গাচাষী সবারই সারের প্রয়োজন হয় । কিন্তু এক্ষেত্রে আর্থিক সামর্থের কারণে সারের দাম বাড়লেও ধনীরা তা কিনতে পারে আর এক ফসলের উৎপাদন খরচ না উঠলেও তাদেরকে না খেয়ে থাকতে হয়না ।

বাংলাদেশের ধনী কৃষকদের জমি সবই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে অর্থাৎ তাদের প্রায় জমিই বড়, ছোট, খুব ছোট ও ঠিকাচাষীদের জমির লাগোয়া হয়ে আছে । এর ফলে একজন বড় কৃষক যখন উচচ ফলনশীলের বীজ ব্যবহার করে তখন পাশের ছোট কৃষককেও বাধ্য করা হয় রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে । তা না করলে ক্ষতিকর পতঙ্গ চলে যেতে চাইবে পাশের জমিতে। এ থেকে বুঝা যায় সবুজ বিপ্লবের ইতিবাচক প্রভাব ধনী কৃষকদের পক্ষেই যায় । সিরাজুল ইসলামের মতে "গ্রামে বৈষম্য সৃষ্টিতে বিশেষ অবদান রাখছে উচ্চফলনশীল শস্য চাষের টেকনোলজি ও যান্ত্রিক জলসেচ ব্যবস্থা । কৃষি উৎপাদন বাড়ছে এবং এর সঙ্গে বাড়ছে গ্রামীণ বৈষম্য ও শ্রেণীচেতনা।"[৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশের উপর আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব

এ সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষক ও ব্যক্তিবর্গের মন্তব্য তুলে ধরা হল । মাহবুব হোসেন বলেন, "আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির প্রসার পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে । একই জমিতে উপর্যুপরি একই ফসলের চাষ, সারা বছর সেচ ব্যবহারের মাধ্যমে জমিকে সর্বদা সিক্ত রাখা, অজ্ঞতার কারণে রাসায়নিক সারের অপব্যবহার ইত্যাদির জন্য জমিতে micro-nutrient এর অভাব সৃষ্টি করে জমির উপর উর্বরতা শক্তি ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে । সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানির অধিকমাত্রায় উত্তোলন পানীয় জলের অভাব সৃষ্টি করতে পারে । সেচ প্রকল্প এলাকাতে জলাবদ্ধতার জন্য ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য পানিবাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি করতে পারে । বন্যা নিয়ন্ত্রণ , বাঁধ ও কৃষিতে অধিক পরিমাণে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার মাছ উৎপাদনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে । বিস্তৃত এলাকাতে একই জাতের বীজ ব্যবহারের জন্য শস্যে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ বাড়ে। পোকা-মাকড় দমনে বিষাক্ত ঔষধের অধিক মাত্রায় ব্যবহার খাদ্যশস্য, ফলমুল ও পানীয়জলে ঃ toxic material এর পরিমান বাড়িয়ে জনগণের স্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করতে পারে"।[৪৫] রুচিরা তাবাসসুম নভেদ লিখেছেন, "এদেশে উফশীর সঙ্গে সঙ্গে সেচের প্রসার ও রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের প্রয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় পানি দূষিত হচ্ছে এবং প্রায়ই মাছের মড়ক দেখা দিচ্ছে। কৃষিতে রাসায়নিকের ব্যবহার পানির দূষণ, মাছের মড়ক ইত্যাদি থেকে শেষ বিচারে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এগুলোর ভোক্তা প্রাকৃতিক উৎপাদিকা শক্তির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মানুষ" ।[৪৬]

তপন চক্রবর্তী লিখেছেন, "কীট-শত্রু দমণের জন্য ডিডিটি ও অন্যান্য কীটনাশক ব্যবহৃত হচ্ছে বটে; কিন্তু প্রকৃত প্রমাণে দেখা যাচ্ছে এতে শত্রুর সংখ্যা বাড়ছে বই কমছেনা । এতে ফুড চেইনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে এবং নির্দিষ্ট এলাকায় সমস্ত জীবকুলকে বিপর্যস্ত অবস্থার মোকাবিলা করতে হচ্ছে। একটা উদাহরণ বিষয়টি স্পষ্ট করার সহায়ক হতে পারে । পেরুর কোন কোন এলাকায় ১৯৪৯ সনে ডিডিটি ও অন্যান্য কীটনাশক তুলাচাষে ব্যবহার করা হয় । প্রতি একরে ফলন ৪৪০ পাউণ্ড থেকে বেড়ে ৬৪৮ পাউণ্ডে দাঁড়ায় । তুলার শত্রু এফিড দমন হবার কারণে এই বাড়তি ফলন সম্ভব হয় বলে ধারণা । তিন বছর পর ডিডিটি এফিডের বিরুদ্ধে কার্যকারিতা হারায় । এফিড তার শরীরে ডিডিটি রোধী ক্ষমতা অর্জন করে । এর মধ্যে এফিডের প্রাকৃতিক শত্রুও এফিডের সাথে সাথে মারা গিয়ে থাকবে । ফলে নতুন ক্ষমতাসম্পন্ন এফিড দ্রুত বাড়তে থাকে । এর কয়েক বছর পর এখানে আরো পাঁচ ছয়টি পোকার উপদ্রব বাড়ে । এরা আগে আশে পাশের এলাকা থেকে যেখানে ডিডিটি বা কীটনাশক ছড়ানো হয়নি, সেখানে ওদের সংখ্যা কম ছিল, কারণ ওদের প্রাকৃতিক শত্রু ছিলো । এই তুলাক্ষেত ছিল শত্রুহীন । দেখা গেলো পাঁচ বছর পর ১৯৫৪ সনে

Dhaka University Institutional Repository

তুলার ফলন কমে ৪৪০ পাউন্ডের এক তৃতীয়াংশ দাঁড়ালো। কীটনাশক ব্যবহারের সুদূর প্রসারী ফল ফলন কমলো, শত্রু বাড়লো। সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশও দূষিত হলো । যার পরোক্ষ ফলের দরুণ সমস্ত জীবকূলকে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে এবং হবে" ।[৪৭]

আহমদ মুসাউদ্দীন এর ভাষায়, "কীটনাশক ঔষধের মধ্যে রয়েছে এনড্রিন, ডিয়েলড্রিন, অলড্রিন এবং ডিডিটি, এসবই অতি বিষাক্ত পদার্থ, ডিয়েলড্রিন এবং ডিডিটি বাংলাদেশে বেশী ব্যবহৃত হয় । কীটনাশক ঔষধের মাত্রাধিক ব্যবহার মাটি ও পানিকে দূষিত করে । ফলে মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর মৃত্যু ঘটায় । এমনকি এ ধরনের কীটনাশক মাছ ও জলজ প্রাণীর শারীরিক প্রক্রিয়াকে পরিবর্তিত করে ফেলে । বেঁচে থাকলেও এদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বংশবিস্তার লোপ পায়" ।[৪৮]

শেখ ম. শহীদুল্লাহ লিখেছেন, "কৃষি উপকরণ তথা বীজ, সার, কীটনাশক, পানি এবং সেচ ও চাষাবাদ যন্ত্রপাতি,কৃষি ঋণ বা জমির থেকে কৃষি উপকরণের উপর বিশ্ব কৃষি ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ আরও প্রত্যক্ষ । চাষাবাদ সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার স্বাধীনতা কৃষকের আর নেই । সবই উপর থেকে নেয়া ও চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে ক্রমাগত উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি ও তদনুযায়ী কৃষিজাত পণ্যের মূল্য না পাওয়ায় কৃষক হচ্ছে সর্বস্বান্ত; পরিবেশের ভারসাম্য ধ্বংস ও দূষণ, স্থানীয় প্রজাতির বিলুপ্তি, খাদ্যশস্যের বদলে স্থানীয় স্বার্থের পরিপন্থী অর্থকরী ফসলের (যেমন- চিংড়ী) চাষ, মাটির রাসায়নিক মানহ্রাস (degradation) সহ বিভিন্ন ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক পরিণতির মোকাবেলায় কৃষক হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণ অসহায়" ।[৪৯]

জিন সাম্রাজ্যবাদ ঃ

৬০-এর দশক থেকেই জিন সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের সূচনা হয়। এই সময় সারা পৃথিবী জুড়ে সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচী হাজির করে কনসালটেটিভ গ্রুপ ফর ইনটিগ্রেটেড এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (C.G.J.A.R.)। এই কর্মসূচী অনুসারে তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটি (HYV) বা উচ্চফলনশীল জাতের ধান চাষ শুরু হয় । এই উচ্চফলনশীলগুলি হচ্ছে রাসায়নিক সারে সংবেদনশীল খর্বাকৃতির গাছ । যে সব দেশে হাজার হাজার দেশী জাতের যে ধান চাষ হত সবুজ বিপ্লবের ফলে তাদের চাষ ক্রমশ বন্ধ হতে থাকে। সবুজ বিপ্লবের কুফল কয়েক বছরের মধ্যেই ফলতে শুরু করে। যেমন কৃষিক্ষেত্রে পতঙ্গের উৎপাত বহুগুণে বেড়ে যায় । গবেষণানুযায়ী উচ্চফলনশীল ধান চাষের ফলে ৩২টি প্রজাতির প্রাণী ধানের ক্ষতিকর পোকার আবির্ভাব হয়েছে যাদের আগে ক্ষতি করার ক্ষমতা তেমন ছিলনা ।[৫০] ফলে কীটনাশকের ব্যবহার বেড়েছে বহুগুন। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহুজাতিক কোম্পানিগুলি কীটনাশক

Dhaka University Institutional Repository

তৈরী করে । ফলে উচ্চফলনশীল চাষের ফলে তাদের ব্যবসা বেড়েছে । কিন্তু কীটনাশক প্রয়োগের মাধ্যমে পোকার উপদ্রব স্থায়ীভাবে ঠেকানো সম্ভব নয় । কারণ ১০ প্রজন্মের মধ্যেই একটি পতঙ্গ প্রজাতি কোন বিশেষ কীটনাশক সহনশীল হয়ে পড়ে । তখন চাষীকে বাধ্য হয়ে নতুন কোন কীটনাশকের জন্য বহুজাতিকের দ্বারস্থ হতে হয়।[৫১]

উচ্চফলনশীল চাষের ফলে রোগ পোকার ভয়াবহ উপদ্রব ছাড়াও জমির উর্বরতা নষ্ট হয়। উচ্চফলনশীলের বিপুল জলের চাহিদা মেটানোর জন্য যত্রতত্র অবৈজ্ঞানিকভাবে বাঁধ, স্যালো ডিপটিউবওয়েল ইত্যাদি বসানোর ফলে জলসম্পদের সাম্যবস্থা নষ্ট হচ্ছে । বন্যা ও আর্সেনিক দূষণে মানুষের ক্ষতি হচ্ছে । সবুজ বিপ্লবের ফলে ধান, গমের উৎপাদন বাড়লেও জলজাতীয় শস্যের উৎপাদন কমে যায় । কারণ একই জমিতে ২/৩ বার ধান চাষ করার জন্য কৃষককে উৎসাহিত করা হয় । জলমগ্ন ধান জমিতে আগে যে প্রচুর মাছ চাষ হত কীটনাশক ব্যবহারের ফলে সেই মাছের উৎপাদনও কমে গেছে । তাই বলা যায় সবুজ বিপ্লবের ফলে খাদ্য উৎপাদন বাড়ছে ঠিকই তবে এর ফলে পরিবেশগত নানা সমস্যাও দেখা দিচ্ছে । বিখ্যাত কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ আর এইচ রিচারিয়া ও ডঃ রতন লাল ব্রহ্মচারীর মতে এমন অনেক দেশী ভ্যারাইটি আছে যাতে সার প্রয়োগ করলে ও সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এইসব (দেশী) ধান চাষ করলে ফলন নিঃসন্দেহে উচ্চফলনশীলের চেয়ে বেশী হত কারণ সেক্ষেত্রে উপরোক্ত কুফলগুলি সহ্য করতে হতনা।[৫২]

HYV চাষে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ব্যবহার করার ফলে জমির উর্বরতা কমতে থাকে । জমির উর্বরতা কমলে ও রোগ পোকার উপদ্রব বাড়লে অতি উচ্চফলনশীল ধানও নিম্ন ফলন দেয়। এই অবস্থায় ফলন ধরে রাখার জন্য বিপুল পরিমান সার, কীটনাশক ও জলের বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। আর এসব প্রয়োজন মিটানো ধনী কৃষকদের পক্ষে বেশীরভাগ সময়ই সম্ভব হয়না । অনেক জায়গাতেই দেশি ধানের বীজ না পাওয়া যাওয়ায় উচ্চফলনশীল চাষ দেশি ধানের থেকে অসুবিধাজনক হওয়া সত্বেও বহুচাষী এই চাষ করতে বাধ্য থাকছেন ।

বহুজাতিক বীজ কোম্পানীগুলি নানা উপায়ে বীজের ব্যবসা করছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তাদের আধিপত্য কায়েম করছে । এই বীজের বাজার এখনো সম্পৃক্ত হয়নি । আজও তৃতীয় বিশ্বের বহু চাষী প্রতিবছর চাষ করবার মত বীজ নিজেরাই তৈরী করে থাকেন । গরীবদেশের কৃষকরা প্রতিবছর ফসল তোলার পর কিছু ভাল বীজ পরের বছর জমিতে রোপন করার জন্য রেখে দেন । তাছাড়া তৃতীয় বিশ্বের অনেক চাষী দেশিজাত ও উচ্চফলনশীলের মধ্যে সংকরায়ণ ও নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন জাত তৈরীর চেষ্টা করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা সফলও হন । এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় এই ধরনের চাষীর

Dhaka University Institutional Repository

মোট সংখ্যা ১৪০ কোটি । ভারতের কৃষি জমিতে বার্ষিক প্রায় ৬০ লক্ষ টন বীজ ব্যবহার হয় এবং ৮৫% কৃষক এখনও নিজেরাই তৈরী করেন ।[৫৩] কৃষকদের এই বীজ তৈরীর অধিকার কাড়তে না পারলে বীজের বাজার সম্প্রসারণ সম্ভব নয় । তাই বাজার দখলের জন্যই এসেছে নতুন প্রযুক্তি । জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে এমন বীজ তৈরী হচ্ছে যার থেকে ফসল ফলবে কিন্তু সেই ফসলের বীজ হবে বন্ধ্যা । এসব গাছ থেকে পরেরবার আর ফসল ফলবেনা । এর নাম টার্মিনেটর বীজ। পৃথিবীর বড় জিন সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানী মনসান্টো টার্মিনেটর বীজ ভারতে এনেছে । আর এক আইনের নাম হচ্ছে প্লান্ট ভ্যারাইটি প্রটেকশন অ্যাণ্ড ফার্মার্স রাইট অ্যাক্ট | WTO-র নির্দেশানুযায়ী এই আইনটি তৈরী করা হয়েছে । এ আইনানুযায়ী কোন চাষী নতুন বীজ বাণিজ্যিকভাবে তৈরী করতে পারবেনা।[৫৪] প্রকৃতিতে কোন অস্তিত্বই ছিলনা এমন ধরনের শস্য জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে তৈরী করা সম্ভব হয়েছে । চাষের পদ্ধতিও কৃষকের জানা নেই । মনস্যান্টো কোম্পানী আগাছানাশক এক ধরনের বিষ বাজারে ছাড়ে যার নাম রাউণ্ড আপ। আগাছা মারতে গিয়ে ফসল মেরে ফেলার সম্ভাবনা থাকায় কৃষককে খুব সাবধানে এই বিষ ব্যবহার করতে হয় । মনস্যান্টো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে রাউন্ডআপের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য এমন এক জাতের ফসল তৈরী করেছে যা রাউণ্ডআপ জাতীয় বিষ সহ্য করতে পারবে । এ জাতীয় ফসলের নাম রাউণ্ডআপ রেডি ফসল । রাউণ্ডআপ রেডি ধান, সয়াবিন বা তুলার ক্ষেত্রে ইচ্ছামত ব্যবহার করা যাবে কারণ তাতে আগাছাসহ অন্যান্য গাছ মরবে কিন্তু রাউণ্ডআপ রেডি ফসল মরবেনা ।[৫৫]

কৃষকরা এই জাতীয় ফসল ব্যবহার করলে কোম্পানীর লাভ হবে । জমিতে বছরের পর বছর অতিরিক্ত রাউণ্ডআপ ব্যবহার করলে রাউণ্ডআপ রেডি ফসল ছাড়া আর কোন ফসল হবেনা সেই জমিতে । এতে কৃষিক্ষেত্রে ও কৃষি জমির উপর বহুজাতিক কোম্পানীর আধিপত্য কায়েম হবে । বর্তমানে কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে কৃষিক্ষেত্রে এর যে প্রভাব পড়ছে এর ফলে কৃষকরা প্রচণ্ড মানসিক চাপ ও অস্থিরতায় ভুগছে। এব্যাপারে নিম্নে একটি উদাহরণ তুলে ধরা হল ।

ভারতের অন্দ্রপ্রদেশের চাষীরা ১৯৯৭-৯৮ সালে বোলগার্ড তুলার চাষ করেছিল । কিন্তু পতঙ্গ প্রতিরোধী বলে খ্যাত এই তুলায় পতঙ্গের আক্রমণ বহুগুণ বেড়ে যায় । পতঙ্গের ভয়ানক আক্রমণে ঐ বছর তুলার উৎপাদন ৯৫% কমে যায় । কোম্পানীর বিজ্ঞাপনে ভুলে উচ্চফলনের আশায় কৃষকরা প্রচুর ঋণ করেও বোলগার্ড তুলার বীজ কিনেছিলেন । তাই ফলন মার খাওয়ায় আত্মহত্যা ছাড়া তাদের সামনে আর কোন পথ ছিলনা । এই কারণে শুধু ওয়ারাঙ্গেল জেলাতেই প্রায় ৫০০ চাষী আত্মহত্যা করেছিলেন।[৫৬]

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ঃ

ষাটের দশকে বিশ্বজুড়ে চীন বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত কৃষক অভ্যুত্থানগুলি সাম্রাজ্যবাদের কাছে ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছিল । তখন যেন তেন উপায়ে কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে কৃষক শ্রেণীকে প্রশমিত করার চেষ্টা করা হয় । আর এটাই ছিল সবুজ বিপ্লবের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ।

কৃষিতে কর্তৃত্ব কায়েমে জৈব প্রযুক্তি

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে যে নতুন ফসল তৈরী হচ্ছে সে সম্পর্কে সাধারণ চাষীদের কোন ধারণা না থাকায় নতুন ধরনের ফসল চাষ করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের জন্য চাষীকে ঐ ফসল সৃষ্টিকারী বহুজাতিক কোম্পানীর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। ফলে কৃষি প্রযুক্তির উপর শোষক শ্রেণীর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব কায়েম হচ্ছে । আর কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন সম্পর্ক ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব নতুন দিকে মোড় নিচ্ছে। কোম্পানীগুলো নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েমের জন্য জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে নিত্য নতুন আবিস্কার করেছে । যেমন জেনকো কোম্পানী আবিস্কার করেছে টার্মিনেটর প্রযুক্তি । টার্মিনেটর প্রযুক্তির মাধ্যমে মনস্যান্ট কোম্পানি এমন বীজ তৈরী করেছে যে বীজ থেকে উৎপন্ন ফসলের বীজ হবে বন্ধ্যা । অর্থাৎ চাষীকে প্রতিবছর নতুন করে বীজ কিনতে হবে । কিন্তু এই বীজ কিনে ঠকে গিয়ে যদি চাষী আর কিনতে না চায় সেজন্য টার্মিনেটর প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হবে । চাষীকে তখন একটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক দেয়া হবে যা স্প্রে করলে বন্ধ্যা বীজ থেকেও চারা গজাবে । এই প্রযুক্তির মাধ্যমে উদ্ভিদ জীবনের মূল ঘটনাগুলিকে (যেমন- অঙ্কুরোদগম, পাতা গজানো, ফুল ফোটানো, ফল পাকানো) নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এক একটি রাসায়নিক প্রয়োগের মাধ্যমে। এমন শস্য উৎপাদন করা যাবে যার বৃদ্ধি একটি স্তরে এসে আটকে যাবে । ধানগাছে শীষ আসবে কিন্তু কোম্পানীর নির্দিষ্ট রাসায়নিক স্প্রে না করা পর্যন্ত গাছে ধান হবেনা । নোভার্টিস কোম্পানির US 578914 নং পেটেন্টটিতে এই ধরনের প্রযুক্তির বর্ণনা দেয়া আছে ।[৫৭]

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার প্রায় ১৪০ কোটি গরীব চাষী এক বছরের বীজ পরের বছর চাষ করার জন্য সংরক্ষণ করে থাকেন। বর্তমানে নানারকম প্রযুক্তি ও আইন প্রয়োগ করে চাষীদের কাছ থেকে বীজ কেড়ে নেয়ার পায়তারা চলছে । কারণ কৃষকদের হাত থেকে যদি তাদের উৎপাদিত বীজ চলে যায় তাহলে বহুজাতিকের বীজের বাজার সম্প্রসারিত হবে। তখন বাধ্য হয়ে চাষীরা কোম্পানীর বীজ কিনবে । এতে কৃষি ব্যবস্থা বহুজাতিকের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় ।

Dhaka University Institutional Repository

বহুজাতিক সংস্থাগুলো নানা ধরনের ঠিকাদারী কার্যকলাপ চালু করছে । কারণ এর মাধ্যমে কৃষকদের উপর উৎপাদন সংক্রান্ত ঝুঁকি চাপিয়ে দেয়া যায় এবং অতিরিক্ত মুনাফা অর্জিত হলে কৃষককে বঞ্চিত করে তা কুক্ষিগত করার অধিকারটুকুও মেলে এই পন্থায় ।

সম্প্রতিককালে কৃষিনির্ভর দেশে Contract Farming এর উপরে গবেষণায় জানা যায় ... "চুক্তিবদ্ধ উৎপাদনের ফলে কৃষি উৎপাদন গরীবের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের বদলে রপ্তানিযোগ্য এবং অর্থকরী ফসল উৎপাদনের দিকেই ঝুঁকে পড়ে বেশী । এর ফলশ্রুতিতে খাদ্যবস্তু ও পণ্য সামগ্রীর দাম বেড়ে যেতে পারে । বিশেষতঃ সেইসব সাধারণ কৃষক বা শ্রমজীবী মানুষের কাছে যারা এর সঙ্গে যুক্ত না থাকায় সে সংক্রান্ত বেশী রোজগারের সুযোগ সুবিধা ভোগ করেনা " ।[৫৮]

কৃষিতে শ্রেণীদ্বন্দ্ব

বর্তমানে সারাবিশ্বের চাষীরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিশালী কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানীর কর্তৃত্বের মুখে পড়ায় সাম্রাজ্যবাদী কোম্পানীগুলো শ্রেণীশত্রু হিসেবে দেখা দিয়েছে কৃষকদের সামনে ।

বর্তমানে জমির মালিকানায় প্রতি কৃষকদের তীব্র আকাংখা কমেছে, কারণ শুধু জমিই কৃষি উৎপাদনের একমাত্র উপকরণ নয়, আরো অনেক কিছু যেমন জল, রাসায়নিক সার, উচ্চফলনশীল বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে । বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে বীজ, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি ও কীটনাশকের ব্যবসায়ীরা শক্তিশালী শ্রেণীরূপে আবির্ভূত হচ্ছে এবং তারাই বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর স্থানীয় মিত্রশক্তি । আর ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরাই সবচেয়ে আগে আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তির কুফল ভোগ করে । এই কৃষকরা নিজেরা নিজেরাই বীজ তৈরী করে বিক্রি করেন। কিন্তু বহুজাতিক বীজ কোম্পানি নিজেদের বাজারের স্বার্থে এই শ্রেণীর হাত থেকে সর্বাগ্রে বীজ তৈরীর অধিকার কেড়ে নিতে সচেষ্ট হয় । এর ফলে এই শ্রেণীই সবার আগে শিকার হয় বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর। তাই কোম্পানীগুলো শ্রেণীশত্রু হিসেবে দেখা দিয়েছে তাদের কাছে। ।

বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ঃ

গুটিকয় TNC কৃষিজ পণ্যের বাণিজ্যের একটা বিশাল অংশ নিয়ন্ত্রণ করে এবং উদারীকৃত বাণিজ্য সম্পর্কীত লাভের সিংহভাগও তাদের কাছে যায় । সংখ্যায় ৫টিরও কম কোম্পানী গম, কফি, দানাশস্য, চা, আনারস, তুলো, তামাক, পাট এবং বনজ সামগ্রী এগুলোর রপ্তানি বাজারের ৮০% এর বেশী নিয়ন্ত্রণ করে ।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন ঃ কার্গিল, কন্টিনেন্টাল গ্রেণ, Bunge, Luis, Drefys, Andre & Co. ছয়টি কোম্পানী বিশ্বের দানাশস্যের রাজারের মূল নিয়ন্ত্রণকারি । যে কোম্পানিগুলি পণ্য সামগ্রীর বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে তারাই সংরক্ষণ, পরিবহণ এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্পগুলোও নিয়ন্ত্রণ করে । WTO-র গঠন কাঠামোর মধ্যেকার উপায়গুলো বাস্তবায়িত করার প্রভাবে বিশ্বের খাদ্য উৎপাদন এবং বিপনণের পদ্ধতির Corporate body গুলোর নিয়ন্ত্রণ বেড়ে গেছে । এতে একদিকে যেমন কৃষি বাণিজ্যিক TNC গুলোর লাভ সীমা ছাড়িয়ে যায় অন্যদিকে বিশ্বের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশকে দুর্ভিক্ষ, পরিবেশগত অবনমন (degradation) দারিদ্র এবং দুঃখদুর্দশা গ্রাস করছে ।[৫৯]

উপসংহার ঃ

বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে যে আধুনিকায়ন হচ্ছে এবং ব্যবসায়িক স্বার্থে যে আধুনিক চিন্তা ধ্যান ধারণা প্রয়োগ করা হচ্ছে এর ফলে আজকের কৃষকরা উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, মানসিক চাপ ও অস্থিরতায় ভুগছেন । কৃষকদের বড় অংশ আজ দারিদ্র, দুঃখদুর্দশায় জর্জরিত । আর এই দারিদ্র, দুঃখদুর্দশা থেকেই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হচ্ছে । তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশেও এ অবস্থা থেকে মুক্ত নয় ।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

১. হোসেন উদ্দীন হোসেন, *বাংলার বিদ্রোহ*, ঢাকা : বিদ্যাপ্রকাশ, ১৯৯৯ইং, পৃ. ২৫

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭

৩. ব্লেয়ার বি ক্লিং, *নীল বিদ্রোহ, বাংলায় নীল আন্দোলন (১৮৫৯-১৮৬২)*,আই সি বি এস , ঢাকা : ১৯৯৫

৪ ব্লেয়ার বি ক্লিং, *নীল বিদ্রোহ , বাংলায় নীল আন্দোলন (১৮৫৯-৬০)*, অনুবাদঃ ফরহাদ খান,

৫. *Calcutta Review*, Vol. 36, p. 40

৬. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) , প্রথম খণ্ড , রাজনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০, পৃ. ১৫২

৭. হোসেন উদ্দীন হোসেন, *বাংলার বিদ্রোহ* , ঢাকা : বিদ্যা প্রকাশ, ১৯৯৯, পৃ. ২৪৮

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮

৯. সিরাজুল ইসলাম, ঐ, পৃ. ১৫২

১০. হোসেনউদ্দীন হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ.২৪৯

১১. ব্লেয়ার বি ক্লিং, ঐ, পৃ. ১৫৭

১২. Abhoy Chandray Das, *The Indian Ryot*, Land tax permanent settlement and the fami Howrah, Howrah Press, 1881, p. 282-84

১৩. Abhoy Chandray Das, op. cit., p. 242

১৪. Das, op.cit., p. 557

১৫. Sunil Sen, *Peasant Struggle in Pubna (1872-73) New age*, Feb. 1954

১৬. এম আজিজুল হক, *বাংলার কৃষক*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২, পৃ. ২৩৩

১৭ হোসেন উদ্দীন হোসেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৭

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৭-২৫৮

১৯. সিরাজুল ইসলাম, ঐ , পৃ. ১৪৩

২০. ড. মোহাম্মদ হান্নান, *বাঙালীর ইতিহাস*, ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী , জানুয়ারি, ১৯৯৮, পৃ. ৮৬

২১. বদরুদ্দীন উমর, *ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (২য় খণ্ড)*, ঢাকা : জাতীয় প্রকাশন, ১৯৯৫ইং, পৃ. ২৮৭

২২. কোকা আন্তোনোভা, গ্রিগোরি বোনগার্দ লেভিন, গ্রিগোরি কতভস্কি, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*,পৃ. ৫০০

২৩. আসহাবুর রহমান, *বাংলাদেশের কৃষিপ্রশ্ন, তত্ত্ব ও বাস্তবতা*, ঢাকা : ইউপি.এল. ১৯৯৭, পৃ.২৪

২৪. ঐ, পৃ. ২৫

২৫. Report of the land Revenue Administration Enquiry Committee 1962-63, Dacca : Government of East Pakistan, Revenue Department 1963. Qoted in Shaha, Saha, Bimal Kumar (1990) : 'Agrarian Struclure: Technological change and productivity : a comparetive study of Bangladesh and West Bengal Agriculture, (Ph D. Desertation) Economics Department , University of Calcutta, p. 56

২৬ Shaha , op. cit., p. 56

২৭. National Sample Survey(2nd round), Central Statistical Office, Economic Affairs Division, Government of Pakistan, 1960, Table: 39

২৮. Sobhan, Rehman (1968) : Basic Democracies, Works Programme and Rural Development in East Pakistan Dacca: Bureau of Economic Research, p. 10

২৯. Ibid, pp. 10-11

৩০. Sobhan, Rehman, op. cit., p. 11

Dhaka University Institutional Repository

৩১. বদরুদ্দীন উমর, *বাংলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন*, ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা, জুলাই, ১৯৯৮ইং, পৃ. ৩৮

৩২ লেনিন আজাদ, *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, রাষ্ট্র সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকা :ইউ.পি.এল., ১৯৯৭, পৃ.৮৯

৩৩. Sobhan, Rehman (1968): op. cit., pp. 141-43

৩৪. Ibid, p. 186

৩৫. Ibid, p. 87

৩৬. লেনিন আজাদ, ঐ, পৃ. ৯৮

৩৭. সিদ্দিকী কামাল(১৯৮১) , *বাংলাদেশ ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, ঢাকা: বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পৃ. ৪৪-৪৫

৩৮. বদরুদ্দীন উমর (১৯৭৮)ঃ *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার কৃষক* , ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ৪০

৩৯. লেনিন আজাদ, ঐ, ১০০

৪০. ইত্তেফাক, ২০০১/ নিউজ নেটওয়ার্ক ও এশিয়া উইক, বি.বি.সি

৪১. এস এম এইচ জামান, 'বাংলাদেশে ধানের ফলনের উপর রাসায়নিক সারের প্রভাব', *উন্নয়ন বিতর্ক দ্বিতীয় সংখ্যা*, জুন ১৯৯৯, পৃ. ৭২

৪২. বৃগিতে এরলার , সাহায্য না মরণাস্ত্র, উন্নয়নমূলক সাহায্য বিষয়ক একটি রিপোর্ট, ঢাকা : ইউপিএল, ১৯৯৫, পৃ.৭৪

৪৩. নাজমুন নাহার, 'সার সংকট ১৯৯৫ ঃ অর্থনীতিবিদদের লেখালেখি ও কৃষক বিদ্রোহ' ঃ *সমাজ নিরীক্ষণ* ৭৯, ফেব্রুয়ারি, ২০০১, পৃ. ৪৪

৪৪. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশ কৃষিপ্রশ্ন তত্ত্ব ও বাস্তবতা*, আসহাবুর রহমান সম্পাদিত, ঢাকা : ইউপিএল , ১৯৯৭, পৃ. ২০৪

৪৫. মাহবুব হোসেন, 'আধুনিক প্রযুক্তিও কৃষি উন্নয়নঃ বাংলাদেশের বাস্তবতা' ,*বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা* , নবম খণ্ড, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা , ফ্রেব্রুয়ারি, ১৯৯২

৪৬. রুচিরা তাবাসসুম নভেদ, 'বাংলাদেশের কৃষিতে প্রাকৃতিক উৎপাদিকা শক্তি ঃ অবক্ষয়ের বিবরণ' *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা* , ৮ম খণ্ড, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ঢাকা : ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১, পৃ. ১৫৪

৪৭. তপন চক্রবর্তী, *বিজ্ঞান ও প্রত্যাশা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : জুন, ১৯৯৪, পৃ. ৩৭

৪৮. আহমদ মুসাউদ্দীন, 'রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার সতর্কতা অপরিহার্য,' ৭ আগস্ট, ২০০১, ইত্তেফাক

৪৯. শেখ ম. শহীদুল্লাহ , *অনুন্নয়ন অভিশাপ, রাহুমুক্তির মনোসামাজিক দিকদর্শন*, ঢাকা : পরম প্রকাশনী, জুন ২০০০, পৃ.২৭

৫০. Bera P.K.: Change in the Pest Scenario after HYV introduction in West Bengal: Proceeding of the workshop on conservation and community copy rights of Folk crop variety, W.W.F., India, Eastern Rejion.

৫১. Gruzdyev G.S. Zinchenko v.A., Kalinin V.A & slovtsov R.I.: The chemical protection of Plant: MIR Publisher, Moscow (1983)

৫২. Prof. Brahmachary. R.L.: some Interesting properties of Folk Rice Variety : Proceeding of the workshop on conservation and community copyrights of Folk crop veriety, W.W.F. India Eastern

৫৩. Sahai sumin : Farmars` Right and Food Security, E.P.W. (Vol. XXXVN.-II) March 11-17, 2000

৫৪. ঐ,

Dhaka University Institutional Repository

৫৫. দেব দেবল ঃ *লুট হয়ে যায় স্বদেশ ভূমি* ঃ উৎস মানুষ,
৫৬. ঐ,
৫৭. ঐ এবং A, Ravishankar and Archek Sunil: Intellectual Property Rights and agricultural Technology Interplay and Implication for India, EPW. Vol. XXXV. No. 21, July 1-7, 2000
৫৮. Implications of Contract Farming : a Review of theory and Practice, Sukhpal singh. IRMA, 1999
৫৯. *'নতুন গণতন্ত্রের জন্য*, নভেম্বর, ২০০০ইং

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ৬

শিল্পে আধুনিকীকরণ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

শিল্প বিপ্লব ঃ

১৭৮০ থেকে ১৮৫০ সাল এই সময়ের মধ্যে সামাজিক বিপ্লব বিশ্বের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং চিন্তাধারায় একটা আমূল পরিবর্তন আনে । এর ফলে পৃথিবীর মৌল কাঠামোতে আসে পরিবর্তন, মানুষের জীবনাচারণ ও জীবন-যাপন রীতিতে আসে এক ভিন্নরূপ । এই সময়ের পরিবর্তনই ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্ববহ । ইতিহাস ও অর্থনীতির ভাষায় এসময়ের মধ্যে যে পরিবর্তন হয় তাকে শিল্প বিপ্লব বলে অভিহিত করা হয় ।

ইংল্যান্ড ও তার আশে-পাশের দেশসমূহের উৎপাদন ব্যবস্থায় ১৭৬০-'৭০ হতে ১৮৩০-৪০ সালের মধ্যে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটে । আগে কায়িক শ্রমে উৎপাদন হতো, সেখানে কায়িক শ্রমের পরিবর্তে এলো যন্ত্র । উৎপাদন যন্ত্রের এ আবির্ভাব উৎপাদন পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটায় । ইতিহাসে এ পরিবর্তনকেই শিল্প বিপ্লব বলে অভিহিত করা হয়।[১] শিল্পায়নের ফলশ্রুতি হচ্ছে শিল্প বিপ্লব । শিল্প বিপ্লব বলতে সেই অবস্থাকে বুঝায়, যা শিল্পায়নের ফলে সৃষ্টি হয় । তাই অধ্যাপক লেডী উইলিয়াম বলেন, 'অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায় থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায় পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তার প্রয়োগ পদ্ধতিতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয় তাই শিল্পবিপ্লব।[২] শিল্প বিপ্লব হল অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনাদি যা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কারখানা ব্যবস্থার সূচনায় ঘটেছে।[৩] ঐতিহাসিকদের মতে ১৭৬৯ সালে জেমস ওয়ার্টের বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের মাধ্যমে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয় । ইহার প্রযুক্তির ফল স্টিফেনসনের রেলওয়ে ইঞ্জিন; ঐ সালেই আকরাইটের শক্তি চালিত তাঁত বা Power Loom এই সকল উদ্ভাবন ও আবিষ্কার প্রাথমিক দিকে বস্ত্রশিল্পের আধুনিকীকরণে সহায়তা করেছিল । ইহার অব্যবহিত পরেই অন্যান্য শিল্পেও যন্ত্র প্রয়োগ সম্ভব হইল । ..... এই সকল আবিষ্কার উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটাইল।[৪] অমিত সেন বলেন, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুরোপুরি গড়ে উঠেছিল উৎপাদনের যে অবস্থার মধ্যে ইতিহাসে তার নাম দেয়া হয়েছে শিল্প বিপ্লব । আঠার শতকের ইংল্যান্ডে যার প্রকাশ, উনিশ শতকে তার পরিণতি । ইংল্যান্ড থেকে অন্যত্র; ক্রমে পৃথিবীর সর্বত্র তা ছড়িয়ে পড়ে।[৫]

উৎপাদনক্ষেত্রে শক্তিচালিত যন্ত্র প্রয়োগের ফলে এ বিপ্লব তরান্বিত হয়। তৎকালীন ইংল্যান্ডে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণই ছিল । যেমন - মূলধন, বিরাট সংখ্যক শ্রমিক, বিশ্বব্যাপী বাজার, কয়লা ও লোহার বিপুল সমাহার, যান্ত্রিক উদ্ভাবণ এবং উন্নত যানবাহন ব্যবস্থা প্রভৃতি। তাই শিল্প বিপ্লব

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে এক জটিল অবস্থা । যা উৎপাদন ক্ষেত্রে যান্ত্রিক প্রয়োগের ফলে তরান্বিত হয় এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে ও পরিবর্তনের সূচনা করে । বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করায় মানুষের আর্থসামাজিক পরিবর্তনের পাশাপাশি মনস্তাত্ত্বিক জগতেও পরিবর্তন সাধিত হয় ।

শিল্প বিপ্লবের ফলে বাষ্প চালিত ইঞ্জিন, রেললাইন, সূতাকাটা কল প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয় । ফলে মানুষ কল-কারখানার দিকে ঝুঁকে পড়ে । এতে কৃষকদের চেয়ে ব্যবসায়ীদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, নতুন চিন্তা চেতনার উদ্ভব হয় । শিল্প বিপ্লব - শিল্পায়নের ফলে সৃষ্ট এক নতুন ও জটিল অবস্থা যা মানবজীবনে যুগান্তকারী প্রভাব বিস্তার করে ।

সমাজ জীবনে শিল্প বিপ্লবের প্রভাব ঃ সমাজ জীবনে শিল্প বিপ্লবের ব্যাপক ও বহুমুখী প্রভাব পড়ে। উইলিয়ামস এর মতে, শিল্প বিপ্লব ও এতদ্বসংক্রান্ত নানামুখী উদ্ভাবন শ্রমিক শ্রেণীর জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে । তা একদিকে ইতিবাচক ধারায় সমাজের মানুষের জীবনধারাকে প্রভাবিত করে মানব কল্যাণের দিগন্ত উন্মোচন করেছে আর অন্যদিকে নেতিবাচক ধারায় ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জীবনকে প্রভাবিত করে সৃষ্টি করেছে অনেক অসহনীয় অবস্থা । A. Birnie শিল্প বিপ্লবের এরূপ দ্বিমুখী প্রভাব লক্ষ্য করে বলেন, "..... the change which it describes so far-reaching and profound, so tragic in their strange mixture of good and evil, so dramatic in their combination of material progress and social suffering that they may well be described as revolutionary"[৬]

শিল্প বিপ্লবের ইতিবাচক প্রভাবের ফলে বস্তুগত সম্পদের অধিকতর ব্যবস্থা হয়েছে ও মাথাপিছু আয় বেড়েছে । আর শিল্প বিপ্লবের নেতিবাচক প্রভাব যে সব পরিবর্তন সূচনা করে সে সম্বন্ধে নিমকফ ও অগবার্ন বলেন, 'শিল্প বিপ্লবের কারণে যে শিল্পায়ন হয়েছে সমাজে তার প্রভাব অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয় । তা মানুষের সাথে মানুষের, মানুষের সাথে পরিবারের, পরিবারের সাথে সমাজের, শহরের সাথে গ্রামের নানারকম মানবীয় পরিবর্তন সূচনা করে । তা কুটির শিল্পকে ধ্বংস করেছে। যৌথ পরিবারের ভাঙ্গণ সূচীত করেছে, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটিয়েছে'।[৭] শিল্প বিপ্লবের ফলে অর্থনৈতিক সাচ্ছন্দ আসলেও সামাজিক জীবনে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প বিপ্লব মুখ্যত যে সব সমস্যা সৃষ্টি করেছে সেগুলো হলো ঃ-

১. অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা (বেকারত্ব, দুর্ঘটনা, অসহায়ত্ব ইত্যাদি)

২. শিশু, বৃদ্ধ, এতিম প্রমুখদের নিরাপত্তাহীনতা বাড়ায়

৩. সামাজিক বন্ধনের শিথিলতা ও বিশৃংখলা ঘটায়

৪. শ্রমিক অত্যাচার ও তীক্ষ্ণ শ্রম শোষণ দেখা দেয়

৫. মানবীয় আচরণে অসামঞ্জস্যতা ও সামাজিক অনাচার বৃদ্ধি পায়

৬. নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ও নিষ্ক্রিয়তা দেখা দেয়

৭. পারিবারিক ভাঙ্গণ ও আত্মকেন্দ্রিকতা বাড়ে

৮. পানীয় জল, পয়ঃপ্রণালী ও সুস্বাস্থ্য লাভ সমস্যা বৃদ্ধি পায়

৯. জনবসতি স্থানান্তর ও বাসস্থান সংকট দেখা দেয়

১০. মানসিক জটিলতা, দুশ্চিন্তা ও নেশাগ্রস্থতা প্রকট হয়।

শিল্প বিপ্লব প্রথমত ইংল্যান্ডে সংঘটিত হলেও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ায় সমগ্র পৃথিবীর আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় । হস্তচালিত যন্ত্রের পরিবর্তে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের উদ্ভব ঘটায় উৎপাদন খরচ কম হয় এবং মুনাফা বৃদ্ধি পায় । এতে শিল্প সমাজের সৃষ্টি হয় ও ব্যবসায়ীদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় । তাছাড়া অর্থনৈতিক উন্নতিও তরান্বিত হয় ।

শিল্প বিপ্লবের ফলে বিরাট সংখ্যক শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হয় । কারণ কৃষি ব্যবস্থা লোপ পাওয়ায় শ্রমিকরা জমির আয় থেকে বঞ্চিত হয়। এভাবে ধীরে ধীরে কৃষি ও শিল্প আলাদা হয়ে যায় । ফলে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে ঝুঁকি ও নিরাপত্তাহীনতা বেড়ে যায় । কেননা শিল্প বিপ্লব কিছু লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করলেও অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান কেড়ে নেয় । এতে বেকারত্ব, দূর্ঘটনা ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা প্রভৃতি মানুষের সমাজ জীবনে নতুন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় ।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নত হয় । যাতায়ত ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় গতি আসে । সমাজ জীবনে বেগ বেড়ে যাওয়ায় মানুষের আবেগ ভীষণভাবে আহত হয় । এতে সামাজিক ও মানসিক দুরত্ব বৃদ্ধি পায় যা নতুন সামাজিক শ্রেণী সৃষ্টি ও সামাজিক বিদ্বেষ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয় । তাছাড়া অনেকক্ষেত্রে পারিবারিক ভাঙ্গন দেখা দেয় । শিশু, বৃদ্ধদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় । শিশুরা অযত্ন অবহেলা ও কুসংসর্গে পড়ে অপরাধ প্রবণ হয়ে উঠে ।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প-বিপ্লবের প্রভাবে মাধুর্যহীন শহর ও যন্ত্রিজীবনের জন্ম হয় । বাসস্থানের জন্য অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং চিত্তবিনোদনের অভাব মানুষের নৈতিক অধঃপতন ঘটায়। বিভিন্ন পটভূমির জনগণের সংমিশ্রনে হৃদয়াবেগ বিনষ্ট হয়। এভাবেই পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে যায় এবং সামাজিক শূন্যতা দেখা দেয় । তাছাড়া মানুষের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি লোপ পাওয়ায় পারস্পরিক সহযোগিতা বিনষ্ট হয় এবং অহেতুক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায় । সমাজ জীবন জটিল ও কষ্টকর হয় এবং মানুষ প্রচণ্ড মানসিক চাপের মধ্যে থাকে ।

শিল্পায়ন ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইংল্যান্ডে ব্যাপক শিল্পায়ন ঘটে । পরবর্তীকালে ইউরোপসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশেও শিল্পায়ন ব্যাপক প্রসার লাভ করে । শিল্পায়ন ও শিল্প বিপ্লব দু'টো পরস্পর ঘনিষ্ট প্রত্যয় । শিল্পায়নের ফলেই শিল্প বিপ্লব ঘটে । কাজেই শিল্পায়ন একটি প্রক্রিয়া এবং শিল্প বিপ্লব এর ফলশ্রুতি । শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে আরেকটি বিষয় অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত তা হচ্ছে শহরায়ণ । শিল্প বিপ্লব যে সমাজে ঘটে সে সমাজে শহরায়ণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দেয় । ১৯৪৭ সালের পর হতে আমাদের দেশে কিছু কিছু শিল্প গড়ে উঠলেও এখনও পর্যন্ত সত্যিকারের শিল্পায়ন ঘটেনি ।

সাধারণ কথায় শিল্প গড়ে উঠার প্রক্রিয়াকে শিল্পায়ন বলে । ইউনেস্কো কর্তৃক প্রকাশিত অভিধানে শিল্পায়নকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলা হয় ঃ Industrialization is a term covering in general terms (and without reference to any specific industrial revolution) the growth. In a society hitherts mainly agrarian of modern society with all its attendant circumstances and problems, economic and social`.[৮]

দুজন সোভিয়েত লেখক শিল্পায়নকে নির্দিষ্ট করে বলেন যে, শিল্পায়ন বলতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কেবলমাত্র একটি বিশেষ দিক (যন্ত্রশিল্প) বুঝায়না । উন্নত দেশগুলির যাবতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক উপায়ে এবং প্রযুক্তিবিদ্যার সহযোগে তাদেরকে শিল্পে পরিণত করা হচ্ছে । শিল্পায়ন প্রয়োগ অর্থে বুঝতে হবে এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা বৃহদায়তন উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির উন্নততর পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়, সমগ্র অর্থনীতির নবীকরণ হয় এবং শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৯]

শিল্পায়নের বৈশিষ্ট্য ঃ শিল্পায়নের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে । বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. উৎপাদন পদ্ধতিসহ জীবনের সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি ।

২. ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনের পরিবর্তে বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠিতকরণ ।

Dhaka University Institutional Repository

৩. উৎপাদনকর্মে নিয়োজিত কর্মীদের শ্রমনিয়োগ হবে মজুরী ভিত্তিক ।

৪. প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি করা।

৫. কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির পরিবর্তে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি সৃষ্টি করা।

৬. শ্রমবিভাগ ও কর্মে বিশেষীকরণ

৭. ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ সাধন ।

৮. সমাজ জীবনে বৈষয়িক চিন্তা-ভাবনার প্রসার লাভ

৯. শহুরে সভ্যতার জন্ম ও বিকাশ

১০. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব, ভূমিকা ও নিয়ন্ত্রণ পরিধির প্রসার লাভ ।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে শিল্পায়নের প্রভাব : শিল্পায়নের গভীর ও ব্যাপক প্রভাব রয়েছে সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে । অধ্যাপক জিসবার্টের মতে, শিল্পায়নের ফলে লোকসংখ্যার অভূতপূর্ব বৃদ্ধি, অসম বণ্টন, জীবন যাত্রার মানের উন্নতি, দুর্ভিক্ষের আশংকা অপসারণ এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটেছে । শিল্পায়নের আর একটি ফল যা সমাজে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা হলো : বেকার সমস্যা সৃষ্টি।[১০]

শিল্পায়ন একদিকে উৎপাদন বাড়ায়, জীবনযাত্রার মান উন্নত করে এবং উন্নয়ন নিশ্চিত করে, অন্যদিকে সৃষ্টি করে সামাজিক সমস্যা, সামাজিক সামঞ্জস্যহীনতা, বেকারত্ব, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাজনিত বিভিন্ন সমস্যা ।

শিল্পায়নের সুপ্রভাব : শিল্পায়ন সমাজ জীবনে যে সুফল আনে তা নিম্নে দেয়া হল ।

১. উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি লাভ হয় ।

২. জ্ঞান দক্ষতার বিকাশ সাধন ও প্রয়োগের ব্যবস্থা করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে । কারণ modern industry demands a large flexible, mobile and motivated labour supply.[১১]

৩. বস্তুগত সমৃদ্ধি লাভ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে ।

৪. যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয় ।

৫. সহজ বিনিময় মাধ্যম প্রচলন ও পণ্য বাজারজাতকরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ।

৬. মানুষকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন ও দূরদর্শী করে তোলে এবং সুশৃংখল ও পরিকল্পিত জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে ।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পায়নের কুপ্রভাব : শিল্পায়নের মাধ্যমে সমাজ জীবনে অনেক কল্যাণ সাধিত হলেও এর ফলে অনেক সমস্যারও সৃষ্টি হয় । টি.এন. হোয়াইটেহেট সামাজিক বঞ্চনা, অসন্তোষ, উদ্দেশ্যবিহীন জীবন, শ্রেণী বৈষম্য ও দ্বন্দ্ব, সামাজিক বিশৃংখলা ইত্যাদিকে শিল্পায়নের ফলশ্রুতি হিসেবে উল্লেখ করেন।[১২]

শিল্পায়ন যেমন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করে তেমনি নতুন বেকারত্বেরও সৃষ্টি করে। কারণ শিল্পায়ন মানুষকে কায়িক শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রশক্তির উপর নির্ভর করে তোলে । এতে কায়িক শ্রমদানকারী ব্যক্তিরা বেকার হয়ে পড়ে । তাছাড়া নতুন নতুন প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের ফলেও বেকারত্ব বাড়ে । শিল্পায়ন মানুষকে কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে বাধ্য করে । মানুষের এরূপ স্থানান্তরের কারণে যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবার গড়ে উঠে ফলে যৌথ পরিবারের উপর নির্ভরশীল লোকজন যেমন বৃদ্ধ, পঙ্গু, এতিম ও অসহায় প্রমুখ নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে । এছাড়াও পরিবারে মূল্যবোধগত পরিবর্তনের ফলে মানুষের জৈবিক, মনস্তাত্ত্বিক, বিনোদনমূলক ও শিক্ষামূলক কার্য বিঘ্নিত হয়। .... পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয় ও পারিবারিক নির্ভরশীলতা হ্রাস করে পারিবারিক ভাঙ্গন সূচীত করে।[১৩]

শিল্পায়ন মানুষকে কঠোর পরিশ্রমী, আত্মকেন্দ্রিক ও বৈষয়িক করে তুলে । মানুষের ভেতর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, সহযোগিতা, একাত্মবোধ ইত্যাদি মানসিক গুণাবলী লোপ পায় ফলে সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়। শিল্পায়িত সমাজে স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই জীবিকার জন্য ঘরের বাইরে যাওয়ার ফলে সন্তানের লালন-পালন ও যত্নে ব্যাঘাত ঘটে যা শিশুর সুষ্ঠু বিকাশকে ব্যাহত করে। শিশুরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে। ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে তারা সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়ে উঠেনা। শিল্পায়নে আবাসিক সংকট দেখা দেয়। কারণ শিল্প এলাকায় প্রচুর জনসমাগম ঘটে। নতুন আগত মানুষের জন্য শিল্প এলাকায় পরিকল্পিত আবাসস্থল না থাকায় অনেকেই বস্তি আর ঝুপড়ি গড়ে তুলে । কেউবা অনিশ্চিত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে। বাসস্থানের এই দুরাবস্থা স্বাভাবিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে অন্তরায়। অধিকসংখ্যক মানুষ একই স্থানে বসবাস করে বলে পয়ঃপ্রণালী নিষ্কাশনের সমস্যা দেখা দেয় । তাছাড়া কলকারখানা ও যানবাহনের ধুয়ায় পরিবেশও দুষিত হয় যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর । এতে বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি সহজে জন্ম নেয় ও বিস্তার ঘটে যা স্বাস্থ্যহীনতা ডেকে আনে । জীবনী শক্তি ক্ষয় হয়, শিল্পায়ন দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন আনে ফলে সমাজের স্থিতাবস্থা ভেঙ্গে পড়ে ও অস্থিরতা দেখা দেয় । জনগণও পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনা । তাই সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে জনগণের চিন্তাভাবনা ও আচরণেও সামঞ্জস্যহীনতা দেখা দেয় ।[১৪] শিল্পে নির্য়োজিত শ্রমিকদের যন্ত্রের সাথে কাজ করতে গিয়ে নানা দুর্ঘটনার শিকার হতে হয় । এতে অনেক শ্রমিকের শারীরিক অঙ্গহানি ছাড়াও মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে থাকে । ফলে শিল্প শ্রমিকদের পারিবারিক জীবনে অনিশ্চয়তা নেমে আসে ।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পায়নের ফলে সমাজ জীবনে শ্রমিক বিশৃংখলায় মত এক নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয় । শিল্পক্ষেত্রে শ্রম শোষণ ও বঞ্চনা দেখা দিলে শ্রমিক মালিকের মধ্যে বিরোধ বাধে। তাছাড়া চিন্তা-ভাবনা ও জীবন ধারণগত পার্থক্যের কারণে শ্রমিকের সাথে শ্রমিকের সংঘর্ষ দেখা দেয় । শ্রমিকদের এই বিশৃংখলা ও অসন্তোষ শিল্পের সাথে জড়িতদের ছাড়াও সমাজ জীবনে অনেক ক্ষতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে । অনেক সময় জাতীয় রাজনীতিকে অস্থিতিশীল করে তুলে । উদাহরণস্বরূপ, আদমজী পাটকল, চট্টগ্রাম বন্দরের শ্রমিক অসন্তোষের কথা বলা যায় ।

শিল্পায়ন মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে অনেক জটিলতা সৃষ্টি করে। কঠোর জীবন সংগ্রামের তাগিদে ও কর্মব্যস্ত জীবনের কারণে মানসিক জটিলতা দেখা দেয়। তাছাড়া আত্ম-কেন্দ্রিকতা, যান্ত্রিক মানসিকতায় নৈতিকতার অবনতি ঘটে। আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মানসে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের প্রবণতা দেখা দেয় যা নৈতিক অধঃপতন ডেকে আনে ।

শিল্পায়ন শহরায়ণকে তরান্বিত করে, আবার শহরায়ণে শিল্পায়নের সুযোগ তৈরী করে । অতএব শিল্পায়ন ও শহরায়ণ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত । শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার মানুষকে শহরমুখী করে তুলে । কারণ এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় ও পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা গড়ে উঠে । আমাদের দেশেও শহরায়ণের পেছনে এ দুটো দিকের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে । বাংলাদেশে মুখ্যত প্রশাসনিক ও শিল্প বাণিজ্যের সুবিধাকে কেন্দ্র করে শহর গড়ে উঠেছে । শহরে কর্মসংস্থান লাভ ও আধুনিক জীবনযাত্রা নির্বাহের আশায় শহরে মানুষের ভীড় বেড়ে চলেছে । কিন্তু বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের আশায় শহরমুখী জনস্রোত বেড়ে চললেও শহর আর কর্মসংস্থানের সুযোগ দিতে পারছে না ।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নের সারণীসমূহে শহরায়ণের একটি চিত্র তুলে ধরা হলঃ

সারণী : ৬.১ বাংলাদেশে শহরায়ণ

সাল	মোট জনসংখ্যা (কোটি)	শহর জনসংখ্যা (কোটি)	শহর জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার
১৯০১	২.৮৯	০.০৬	-
১৯৪১	৪.২০	০.১৩	২.০
১৯৬১	৫.৪৫	০.২১	২.১
১৯৭৪	৭.৬৪	০.৬৮	৯.৫
১৯৮১	৯.০০	১.৩৫	১০.৩
১৯৮৫	১০.০০	১.৭৫	৬.৫
১৯৯০	১১.৩৭	২.২৯	৫.৪
১৯৯৫	১২.৬৮	২.৯৪	৫.০
২০০০	১৪.১১	৩.৭৩	৪.৮

উৎস ঃ বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ রিপোর্ট ।

২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের শহর এবং গ্রাম এলাকার লোকসংখ্যা যথাক্রমে ২,৮৮,০৮,৪৭৭ এবং ৯,৪৩,৪২,৭৬৯ জন। নিম্নের সারণীতে তা দেখানো হল।

সারণী ৬.২

এলাকা	লোকসংখ্যা	শতকরা হার%
শহর	২,৮৮,০৮,৪৭৭	২৩.৩৯%
গ্রাম	৯,৪৩,৪২,৭৬৯	৭৬.৬১%
মোট	১২,৩১,৫৯,২৪৬	১০০.০০%

Source : Preliminary Report Population Cencus 2001.

Dhaka University Institutional Repository

আদমশুমারী ১৯৯১ এবং আদমশুমারী ২০০১ এর শহর ও গ্রাম ভিত্তিক জনসংখ্যার তুলনা নিম্নের সারণীতে তুলে ধরা হল।

সারণী ৬.৩ ঃ আদমশুমারী ১৯৯১ এবং আদমশুমারী ২০০১ এর শহর ও গ্রামভিত্তিক জনসংখ্যার তুলনা ।

এলাকা	আদমশুমারী ২০০১	আদমশুমারী ১৯৯১	পরিবর্তনের শতকরা
শহর	২,৮৮,০৮,৪৭৭	২,০৮,৭২,২০৪	৩৮.০২%
গ্রাম	৯,৪৩,৪২,৭৬৯	৮,৫৪,৪২,৭৮৮	১০.৪২%
মোট	১২,৩১,৫৯,২৪৬	১০,৬৩,১৪,৯৯২	১৫.৮৪%

Source : Preliminary Report Population Census 2001

চিত্রলেখ ঃ ৬.১

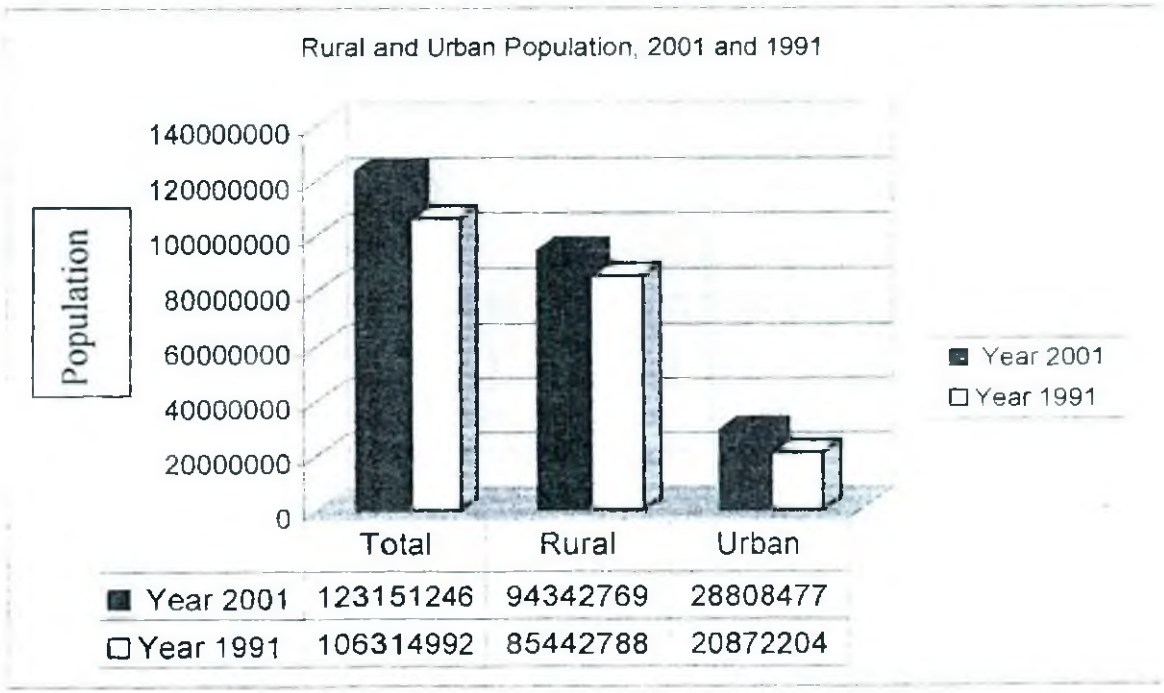

Rural and Urban

Source : BBS

উৎস ঃ Preliminary Report Population Census, 2001

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.৪ : DHAKA ZILA AT A GLANCE

Items	1991	1981	Growth Rate (%)	
			Decadal	Annual
1. POPULATION	58,39,642	40,23,838	45.13	3.79
Male	32,29,716	22,59,439	42.94	3.64
Female	26,09,926	17,64,399	47.92	3.99
Rural	697087	10,58,229	(-) 34.13	(-) 4.09
Male	344966	5,36,284	(-) 35.67	(-) 4.32
Female	352121	5,21,945	(-) 32.54	(-) 3.86
Urban	51,42,555	29,65,609	73.41	5.66
Male	28,84,750	17,23,155	67.41	5.29
Female	22,57,805	12,42,454	81.72	6.16
2. URBAN POPULATION (%)	88.06	73.70	19.48	1.80

Source : BBS

সারণী ৬.৫ : INTERCENSAL GROWTH RATE OF URBAN POPULATION, 1901--1981.

Census years	Population		Variation		Annual growth rate (Exponential)
	Number	Percent	Number	Percent	
1901	702035	2.43	--	--	--
1911	807024	2.55	104989	14.95	1.39
1921	878480	2.64	71456	8.85	0.85
1931	1073489	3.02	195009	22.20	2.00
1941	1537244	3.66	463755	43.20	3.59
1951	1819773	4.33	282529	18.38	1.69
1961	2640726	5.19	820953	45.11	3.75
1974	6273602	8.78	3632876	137.57	6.62
1981	13228163	15.18	6954561	110.85	10.63

Source : BBS

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.৬ : PERCENT AND RANK OF URBAN POPULATION BY DISTRICT IN CENSUS YEARS 1961-1981.

Division/District	1981		1974		1981	
	Percent	Rank	Percent	Rank	Percent	Rank
Bangladesh	5.19	-	8.78	-	15.18	-
Chittagong Division	4.69	-	7.54	-	15.00	-
Bandarban	-	-	11.49	4	21.56	5
Chittagong H T	5.92	4	9.78	5	30.44	3
Chittagong	12.49	2	20.98	2	31.14	2
Comilla	3.17	12	4.24	15	8.13	18
Noakhali	1.44	18	2.15	21	10.79	11
Sylhet	2.03	16	2.77	19	8.74	16
Dhaka Division	7.01	-	13.60	-	19.99	-
Dhaka	14.79	1	29.57	1	38.52	1
Faridpur	2.47	14	2.87	18	6.94	21
Jamalpur	4.34	7	4.64	13	8.75	15
Mymensingh	1.11	19	5.95	8	10.04	13
Tangail	1.59	17	5.24	11	7.56	19
Khulna Division	4.28	-	7.39	-	14.36	-
Barisal	3.49	10	3.93	16	11.96	7
Jessore	3.44	11	5.43	10	10.82	10
Khulna	7.04	3	14.63	3	22.41	4
Kushtia	5.42	5	8.30	6	14.55	6
Patuakhali	1.03	20	2.50	20	9.02	14
Rajshahi Division	4.20	-	5.31	-	10.08	-
Bogra	2.98	13	3.71	17	7.44	20
Dinajpur	4.21	8	4.41	14	8.56	17
Pabna	5.08	6	7.62	7	11.65	8
Rajshahi	2.28	15	5.78	9	10.34	12
Rangpur-	4.20	9	4.82	12	10.90	9

Source : BBS

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন ইংল্যান্ডে কারখানার জীবন : শিল্পবিপ্লবের পরবর্তী সময়ের ইংল্যান্ডের কারখানার জীবন সম্পর্কে কিছু তুলে ধরা হল । শিল্প বিপ্লবের ফলে গৃহভিত্তিক কারখানার বিলুপ্তি ঘটে এসেছে সুসংগঠিত শ্রমিকদল নিয়ে বৃহৎ কারখানা। কিন্তু সেগুলোর পরিবেশ ছিল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। মালিকরা তাদের মুনাফার ব্যাপারেই বেশী সচেতন ছিল । ল্যাঙ্কশায়ারের পুরোনো বস্ত্র কারখানাগুলোর ছাদ ছিল অত্যন্ত নীচু। জানালাহীনভাবে মেশিনের পাশে শ্রমিকের নিঃশ্বাসকষ্ট নিয়ে মালিকরা ভাবতোনা। Redcliff এ সম্পর্কে লিখেছেন, "পুরনো ধাচের কারখানা বাড়িগুলো আজ পড়ে আছে আমাদের পূর্ব পুরুষদের নির্মমতার সাক্ষী হয়ে। শ্রমিকের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের কথা কেউই ভাবেননি। যাদেরকে বলা হত আধুনিক ইংরেজ সভ্যতার জনক, স্বদেশী শ্রমিকদের প্রতি তাদের নির্দয়তার তুলনা মেলা ভার । শ্রম বাঁচানোর যে যন্ত্র আবিষ্কার হলো, সেটাই চালাতে শ্রমিকের নাক দিয়ে প্রতিদিন যাচ্ছে প্রচুর কয়লার ধোঁয়া, জীবনীশক্তি হচ্ছে ক্ষয়" ।[১৫] ১৭৯৫ সালে ড. এ্যাইকেন লিখেন যে, " যন্ত্রের আবিষ্কার শ্রম বাঁচিয়েছে ঠিকই, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে পরিবার থেকে শিশুকেও ।"[১৬]

ইংল্যান্ডের শিল্পপতিরা একসময় দরিদ্র দেশগুলোতে পেশাদার দালাল পাঠিয়ে নামমাত্র খাওয়ার বিনিময়ে নিজেদের কারখানার জন্য শিশু শ্রমিক আনাত । যখনই তারা কারখানার মালিকের হাতে অর্পিত হতো, " তারা হতো নামে মাত্র এ্যাপ্রেনটিস্। কিন্তু বাস্তবে ছিল ক্রীতদাস, যারা কোনো পারিশ্রমিক পেতোনা । এমনকি ঠিকমত কাজ করতে না-পারলে প্রতিদিনের নূন্যতম খাবার ও পরিচ্ছদ পেতোনা । কারণ তারা ছিল একেবারে নগণ্য দামে কেনা এবং ইচ্ছে করলেই মালিক আবার অতি অল্প মূল্যে অন্য কাউকে খরিদ করতে পারতো । এই শিশুরা রাতের বেলায় তাদের কারখানার বিছানায় বসেও কাজ করতো, যাতে তাদের বিছানাটা উষ্ণ থাকে । তাদের শীতবস্ত্র দেয়া হতোনা বললেই চলে । ইংল্যান্ডের সংসদের রিপোর্টে পাওয়া যায় যে, একজন শিশু শ্রমিককে দিনে কমপক্ষে দশবার প্রহার করা হতো । যে শিশু শ্রমিক কাঁচের কারখানায় কাজ করতো, তার সামান্য অমনোযোগের পুরস্কার হিসেবে পেতে হতো মালিকের হাতের গণগনে গরম লোহার রডের আঘাত । পাঁচ বছরেরও কম বয়সের শিশু কাজ করতো খনিতে, আলপিনের কারখানায় দশ বছর বয়সের বালক বারো ঘন্টা কাজ করতো আহার ও নগণ্য বাসস্থানের বিনিময়ে । প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকের জীবন শিশু শ্রমিকের জীবনের চেয়ে খুব ভয়াবহ ছিলোনা । পুরুষ ও মহিলা শ্রমিককে শরীরের শেষ সামর্থ অনুযায়ী সারাদিন কারখানায় কাজ করতে হতো । যেহেতু কারখানার আবহাওয়া ও পরিবেশ ছিলো মারাত্মক অস্বাস্থ্যকর । তাই অসুখ ও অঙ্গহানি শ্রমিকদের মধ্যে খুব সাধারণ ব্যাপার ছিলো" ।[১৭] ১৮৩৩ সালে একটি সংসদের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় "আবদ্ধতা, তাপ,

Dhaka University Institutional Repository

বদ্ধ বাতাস, ফুসফুসে দূষিত বায়ু প্রবেশ, সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা, সারা সময় পায়ের নীচে ভেজামাটি, অতি দ্রুত আহার করা, তাপমাত্রার ত্বরিৎ উঠানামা, অতিরিক্ত যান্ত্রিক দুর্ঘটনা, যৌন রোগের আধিক্য, পরিচ্ছন্নতার অভাব, বদ্ধ ঘরে শীতে গ্যাসের বাতি ইত্যাদি কারখানার শ্রমিকের জীবনের প্রতিদিনের নারকীয় সাথী । এর দ্রুত পরিসমাপ্তি অপরিহার্য" ।[১৮]

ম্যানচাস্টারের একজন লেখক লিখেছেন: I never behold a poor factory child, but I instinctively picture to myself the misery which this cursed system (factory) entails upon the human family. I was once in the habit of visiting the hand loom weavers, about ten or twelve years ago, and I invariably forced them a happy and contended people; their cottages were comfortable homes; they had hours of relaxation and gardens for profit and amusement but now factory at work in those districts in which they resided, and poverty wretchedness, and discontent are the inmates of every dwelling".[১৯]

১৭৮৯ সালে ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে যন্ত্রের প্রবর্তন হয় । মানুষ যতোদিন নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস, দ্রব্যাদি হাতে তৈরী করতো, মেশিন আসেনি অথবা রেলগাড়ী প্রবর্তন হয়নি ততোদিন মানুষের আবাস পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন হয়নি । তাদের জ্ঞান নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাই পাড়া প্রতিবেশী ছাড়া বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তাদের তেমন কোন সম্পর্ক ছিলনা, কিন্তু যন্ত্রের সঙ্গে এলো বিজ্ঞানের যুগ । তাঁত ও চরকা হলো অকেজো, আর বেকার মানুষেরা চাকুরীর আশায় দল বেঁধে ভিড় জমাতে লাগলো যন্ত্রের মালিকের কাছে। তৎকালীন ইংল্যাণ্ডে কারখানা ভিত্তিক শহর গড়ে উঠায় শ্রমিকদের সামগ্রিক জীবনে পরিবর্তন আসে । ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে ১৭৭০-১৮০০ সালের মধ্যে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তার সংখ্যা ১৯,৫৯,৫৯০ জন বা ২৭.১ শতাংশ এবং ১৮০০ সাল থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত ৫০,২৪,২০৭ জন বা ৫৬.৬ শতাংশ । এসময় দেশের উত্তরাংশে প্রচুর পরিমানে লোক আবাস স্থাপন করে । এদের বেশীরভাগই ছিল শ্রমিক । ফলে এখানে শিল্পনগরী গড়ে উঠে ।

শিল্প বিপ্লবের বড় বৈশিষ্ট্য হলো গ্রামগুলোর উপর শহরের বিরাট আধিপত্য । গ্রামের মানুষ ১৭৬০ সালের পর কীভাবে শহরে এসেছে এবং শ্রমিকের জীবন বেছে নিয়ে ওরকম জীবন যাপন করেছে তার

Dhaka University Institutional Repository

একটি চিত্র নিম্নের সারণীতে তুলে ধরা হল ঃ

সারণী ৬.৭ ঃ শহর ও গ্রামের জনসংখ্যা।

সাল	১৮৬১	১৮৭১	১৮৮১	১৮৯১
শহরের জনসংখ্যা	৬২.৩	৬৪.৮	৬৬.৬	৭১.৭
গ্রামের জনসংখ্যা	৩৭.৭	৩৫.২	৩৩.৪	২৮.৩

উৎস ঃ আবেদীন কাদের, শিল্প বিপ্লব, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. ৫৮।

বিদ্রোহ প্রেক্ষাপট ইংল্যান্ড :

তৎকালীন ইংল্যান্ডে শ্রমিকের দুর্দশা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে অসহায় অবস্থার মধ্যেও তারা বিদ্রোহ প্রকাশ করতে লাগল। বিভিন্ন কারখানায় যন্ত্রপাতি ভাঙচুর ও পোড়ানোর ঘটনা ঘটতে লাগল। উত্তর ইংল্যান্ডের পুরোটা জুড়েই অস্থিরতা ও সামাজিক অশান্তির সৃষ্টি হল। ১৮১৯-এ হ্যাবিয়াস কর্পাস নীতি রহিত করে এবং সরকার নতুন কিছু কঠোর নীতি জারি করে । এক পর্যায়ে এটা পরিস্কার হলো যে বেঁচে থাকার নূন্যতম প্রয়োজনীয়তাও শ্রমিক তার মজুরি থেকে মেটাতে পারছেনা ।

ইংল্যান্ডের ১৮০২ সালে প্রণীত শিল্পনীতিটি প্রণয়ন করা হয়েছিল পুঁজিপতিদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করে । কিন্তু ততোদিনে সকল শিল্পনগরী এবং বিশেষকরে শ্রমিকদের বাসস্থানগুলো রোগ ও অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল । তাই শিল্পনীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয় । এ বিদ্রোহে রাজনীতিবিদ সমাজসেবীসহ সকলেই শ্রমিকদের পক্ষে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন । সরকার ১৮০২ সালে শ্রমিক অস্থিরতা, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকদের দাবির চাপে সরকারি শিল্পনীতির কিছুটা পরিবর্তন করে। শ্রমিকদের পক্ষে রবার্ট পিল অবিরাম সংগ্রাম করছিলেন। তারই প্রচেষ্টায় শিশুদের শ্রমের সময় সপ্তাহে বাইশ ঘন্টায় নেমে এসেছিল এবং যেসব শিশু শ্রমিকরা বাড়ীর কাছের কারখানায় কাজ করতো তারা তাদের পিতামাতার সাথে রাতে থাকার অনুমতি পেয়েছিল, বছরে তাদের জন্য একজোড়া গরম বস্ত্রও বরাদ্দ করা হয়েছিলো । ১৮১৫ সালে রবার্টওয়েন যিনি নিপীড়িত ইংরেজ শ্রমিকদের বন্ধু, দেশের শিল্পনীতির বিরুদ্ধে শ্রমিকদের পক্ষে সোচ্চার প্রতিবাদ জানান। প্রথমেই তিনি অতিরিক্ত করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং শিল্পপতিদের এক সভায় শ্রমিকদের দুর্দশা লাঘবের জন্য কিছু প্রস্তাব রাখেন। ওয়েন তিনটি প্রস্তাব রাখেন, প্রস্তাবগুলি হল;

১. " বারো বছরের নীচের কোন শিশুকে বস্ত্র বা অন্য কোন কারখানায় শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা যাবেনা;

Dhaka University Institutional Repository

২. আহারের সময় দেড় ঘন্টাসহ কোন কারখানায় শ্রমের সময় বারো ঘন্টার বেশী হতে পারবেনা;

৩. নির্দিষ্ট বয়সসীমা পার হবার পর কোন শিশু শ্রমিক যদি লিখতে পড়তে না জানে বা সাধারণ গণীতের প্রথম চতুর্থ অধ্যায় না জানে আর মেয়েরা যদি নিজেদের পরিধেয় বস্ত্রাদি নিজেরাই সেলাই করতে না পারে তাহলে তাদেরকে কারখানায় শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা যাবেনা" ।[২০]

চার বছর যাবৎ ওয়েন লন্ডনে থেকে পার্লামেন্টের সব সভায় উপস্থিত থেকে শ্রমিকের শিক্ষাহীনতা দারিদ্র ও মালিকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়েন। পরবর্তীতে এব্যাপারে আইন পাশ হয় । ওয়েনের মূল খসড়াকে অনেক কাটাছেঁড়া করে ১৮১৯ সালে পার্লামেন্টে আইন প্রণীত হয় । ওয়েন লিখেছেন ঃ " My intimate aquaintance with there proceedings for the four years during which this Bill was under the consideration of both Houses opened my eyes to the conduct of public men and to the ignorant., vulger self-interest, regardless of means to accomplish their object of trading and mercantile men even of the high standing in the commercial world. No means were left entried by these men to defeat the object of the Bill in the first session of its introduction and through four years in which under one futile pretence and another it was kept in the House of Commons."[২১]

নতুন আইনানুযায়ী নয় বছরের নীচে কাউকে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করা যাবেনা এবং কাজের সময় ১২ ঘন্টায় নির্ধারিত হয়। এরপরই মানুষের মনে চৈতন্য দেখা দেয় যে মানুষই মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন ও নির্ধারণ করতে পারে। নতুন শিল্পনীতির পরও শিল্প শ্রমিকদের জীবনে অনাহার, রোগ এবং মানসিক হতাশা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য রয়ে গেলো।ফলে সামাজিক অস্থিরতা এবং শ্রম অসন্তোষও রয়েই গেলো।

তৎকালীন বাংলাদেশে শিল্প বিপ্লবের প্রভাব : আবদুল্লাহ্ ফারুক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস বইয়ে লিখেছেন, " ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলের উপর কতটা তীব্রভাবে হইয়াছিল তাহার একটি ধারণা পাওয়া যায় সেকালের একটি সংবাদপত্রের খবর হইতে। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ৭ই মে একটি সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ঢাকা শহরের লোক অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে । ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকা শহরে ২১,৩৬১ টি পরিবার ছিল এবং ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এই সংখ্যা কমিয়া ১০,৭০৮ হইয়াছিল (১৯৬১ সালে ঢাকা শহরে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ) । কারণ ঢাকার বস্ত্র শিল্পে মন্দা দেখা দিয়াছিল । ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী ও অন্যান্যরা ঢাকায় দাদন দিয়াছিল ২৫ লক্ষ টাকারও বেশী । ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে দাদন এই টাকার অর্ধেক অপেক্ষাও কমিয়া যায় । ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে ঢাকার কাপড় চালান

Dhaka University Institutional Repository

হওয়া প্রায় বন্ধ হইয়া যায় এবং ফরাসী ও ওলন্দাজ কুঠিগুলি ইহার পূর্বেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল । মলমলের বাজার নষ্ট হইবার ফলে বিশেষতঃ স্ত্রীলোকগণ বেকার হইয়া পড়ে । কারণ মলমলের জন্য সূতা কাটা যে ধরণের সুক্ষ্ম কাজ ছিল উহার জন্য অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোকগণই উপযুক্ত ছিলেন " ।[২২] তিনি আরো লিখেছেন, "বাংলাদেশের রফতানী দ্রব্যের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীতে রং প্রস্তুতের জন্য উৎপন্ন গাছ গাছড়া একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করিয়াছিল । নীলের চাষ ছাড়াও 'কুসুম' (Safflower) নামক একটি গাছের বীজ হইতে তৈল সংগ্রহ করা হইত এবং এই গাছ হইতে রং উৎপন্ন করা হইত । ১৮৭৩-'৭৪ খৃষ্টাব্দে কুসুম হইতে উৎপন্ন রং ১৩,০০০ হন্দর বাংলাদেশ হইতে বাহিরে রফতানি করা হইয়াছিল, যাহার মূল্য ছিল সাড়ে সাত লাখ টাকা । 'আল' (Al) নামক এক জাতীয় গাছ হইতে লাল রং প্রস্তুত করা হইত । ..... বিগত ১৫০ বৎসরে পৃথিবীতে রাসায়নিক প্রকৌশলের উন্নতির ফলে রং প্রস্তুতের পদ্ধতিতে যে বিপ্লব সাধিত হইয়াছে তাহারই ফলে এই দেশের এই ' আল' রং হিসাবে মূল্যহীন হইয়া পড়ে । আধুনিক শিল্প বিপ্লবের ফলে বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ইহা আর একটি উদাহরণ" । [২৩]

শ্রমিক সংঘ (Trade union) : শিল্পায়নের সাথে ট্রেড ইউনিয়ন শব্দটি জড়িত, তাই ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে আলোচনা করা হল । সাধারণভাবে শ্রমিক সংঘ বা ট্রেডইউনিয়ন বলতে বুঝায় শ্রমিক-কর্মীদের দ্বারা গঠিত সংগঠন যা মূলত এর সদস্যগণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নিয়োজিত থাকে । এডউইন বি.ফিলিপ্পোর মতে, " শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে এর সদস্যরা যৌথ দর কষাকষি প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক, সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করে" ।[২৪] সিডনী ও ওয়েবের মতে, " শ্রমিক সংঘ মজুরী উপার্জনকারীদের একটি স্থায়ী ও ধারাবাহিক সমিতি যার মাধ্যমে তারা কার্য শর্তাদি নির্ধারণ, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করে" ।[২৫]

শ্রমিক সংঘের উদ্দেশ্য (OBJECTIVES OF TRADE UNION) : শ্রমিক সংঘের উদ্দেশ্য হচ্ছে মালিকপক্ষের নিপীড়ন, নির্যাতন অন্যায় আচরণ হতে রক্ষা করা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক অধিকার আদায় ও সমুন্নত রাখার চেষ্টা করা । নিম্নে শ্রমিক সংঘের উদ্দেশ্যাবলী তুলে ধরা হল ঃ

১. দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবন যাত্রার মানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত মজুরী প্রদানের মাধ্যমে তাদের উন্নত আর্থিক মর্যাদা দান করা ।

২. ব্যবস্থাপকদের স্বজনপ্রীতি , অসদাচরণ ইত্যাদি রোধ করা;

৩. শ্রমিক কর্মীদের মধ্যে আত্মসম্মান ও মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলা;

৪. শ্রমিকদের কাজের সময়কাল নির্ধারণ, ছুটি ও উৎসব ভাতাদির ব্যবস্থা করা এবং শ্রমিক স্বার্থ

Dhaka University Institutional Repository

সংরক্ষণ ও কল্যাণ সাধন নিশ্চিত করার জন্য শ্রমিক প্রতিনিধিদের রাষ্ট্রীয় আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করা;

৫. শ্রমিকদের বর্তমান ও ভবিষ্যত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করা । বর্তমান নিরাপত্তা যেমন ঃ চাকরিচ্যুতি, অর্থনৈতিক মন্দা প্রভৃতি থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করা এবং ভবিষ্যতের নিরাপত্তা যেমনঃ পেনশন, ভবিষ্যৎ তহবিল, গ্যাচুইটি প্রভৃতি আর্থিক সুবিধাদির ব্যবস্থা করা;

৬. প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব পরিবর্তন করা এবং উত্তম মানবীয় সম্পর্কের পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা ।

শ্রমিক সংঘের কার্যাবলী (Functions of Trade Union) :

অর্থনৈতিক কার্যকলাপ : শ্রমিকদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য শ্রমিক সংঘ শিল্প কারখানার মালিকের সাথে শ্রমিকদের মজুরি হার বাড়ানো, কার্যশর্তাদির উন্নয়ন, চাকরির নিরাপত্তা বিধান ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য আলাপ-আলোচনা করে থাকে । প্রয়োজনে ধর্মঘট, হরতাল ঘেরাওসহ বিভিন্ন আন্দোলনও করে থাকে ।

সামাজিক কার্যকলাপ : শ্রমিক কর্মচারীদের সামাজিক প্রয়োজনাদি মিটানোর জন্য শ্রমিক সংঘ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে । শ্রমিকদের শিক্ষা-দীক্ষা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ, সমাজ সেবামূলক কর্মসূচী তথা শ্রমিক শ্রেণীর জীবনের মান উন্নয়নের জন্য মালিকপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করার পদক্ষেপ নিয়ে থাকে । শ্রমিক কর্মীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে তহবিল গঠনসহ শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করে থাকে ।

রাজনৈতিক কার্যকলাপ ঃ শ্রমিক কর্মীদের স্বার্থ সংরক্ষণে বিভিন্ন সুবিধা প্রদানের জন্য শ্রমিক সংঘ সরকারের নিকট সুপারিশ করে থাকে । শ্রমিক নিয়োগ আইন, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন, ট্রেড ইউনিয়ন অ্যাক্ট , শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ, মজুরি পরিশোধ আইন, কারখানা আইন প্রভৃতি শ্রমিকদের স্বার্থে সংশোধনের জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে থাকে । কখনো কখনো শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে পার্লামেন্ট শ্রমিক প্রতিনিধিত্বের দাবীতে রাজনৈতিক আন্দোলনের আশ্রয় নেয়া হয় ।

ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম (১৯৮৪-৮৫ থেকে ১৯৮৮-৮৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) : ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ অনুসারে শ্রম পরিচালক সমগ্র বাংলাদেশের রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়নের দায়িত্ব পালন করে থাকেন । বিভাগীয় যুগ্ম শ্রম পরিচালকগণও নিজ নিজ বিভাগের রেজিষ্টার অব ট্রেড ইউনিয়নের দায়িত্ব

Dhaka University Institutional Repository

পালন করে থাকেন উল্লিখিত আইনের আওতায় । রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন যে সব বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকেন সেগুলো হল ট্রেডইউনিয়ন সমূহের রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও বাতিলকরণ, ট্রেড ইউনিয়ন অফিস পরিদর্শন, ইউনিয়ন সমূহের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও রিটার্ণসমূহ পরীক্ষা, যৌথ দর কষাকষি, প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠান, ইউনিয়ন-সমূহের মধ্যে বিরাজমান দলগত বিরোধ নিষ্পত্তি ইত্যাদি ।

১৯৮৪ সালে ১৭১ টি ইউনিয়ন বাতিল, ৫১৯টি ইউনিয়ন রেজিস্টার্ড এবং ১৪টি ইউনিয়ন পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল । এতে ১৯৮৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর ইউনিয়নের সংখ্যা ২,৪৮৮টি এবং সদস্যের সংখ্যা ১০,৭৫,৪৯৬-তে দাঁড়ায় । এছাড়া ১৯৮৪ সালে ৫১৯টি ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে ৯টি ফেডারেশন রেজিস্টার্ড করা হয়েছিল । ১৯৮৫ সালে ১টি ইউনিয়ন বাতিল ও ১০৬টি নতুন ইউনিয়ন রেজিস্টার্ড করা হয় । ১৯৮৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইউনিয়নের সংখ্যা ২,৫৯৩ এবং সদস্যের সংখ্যা ১০,৯০,৩৩৮-এ উন্নীত হয়েছিল ।

১৯৮৬-৮৭ সাল পর্যন্ত ৩,৩০৩টি ট্রেড ইউনিয়নকে রেজিস্টার্ড করা হয়। সদস্য সংখ্যা ১১,৮২,০৬৭ জনে দাঁড়ায় । ১৯৮৭-৮৮ অর্থ বছরে মোট ২৯৮ টি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয় এবং মোট সদস্য সংখ্যা ৬৯,৪১৪ জন হয় । এই বছর শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ এর বিধান লংঘনের জন্য শ্রম আদালতের অনুমোদন ও নির্দেশক্রমে ৪৬টি ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয় এবং এগুলোর সদস্য সংখ্যা ছিল ৭,২৯৯ জন । ফলে ১৯৮৭-৮৮ সালে মোট ৩,৫৫৫টি ট্রেড ইউনিয়ন ও সেগুলির সদস্য-সংখ্যা ১২,৪৪,১৯০-তে উন্নীত হয় ।

১৯৮৮ -৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৩,৭৭৭ টি ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্টার্ড করা হয় এবং এদের মোট সদস্য সংখ্যা ১২,৮৮,৮৬৪ জনে পৌছে । নিম্নের সারণীতে তা তুলে ধরা হল।

সারণী ৬.৮ ট্রেড ইউনিয়ন সমাচার

অর্থ বছর	বছরের প্রারম্ভে রেজিস্টার্ড ইউনিয়ন		নতুন রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন		বাতিলকৃত ট্রেড ইউনিয়ন		মোট ট্রেড ইউনিয়ন	
	সংখ্যা	সদস্য-সংখ্যা	সংখ্যা	সদস্য-সংখ্যা	সংখ্যা	সদস্য-সংখ্যা	সংখ্যা	সদস্য-সংখ্যা
১৯৮৬-৮৭	২,৯৯২	১০,০৮,০৯৮	৪০৯	১,৮০,০৫০	৯৮	৬,০৮১	৩,৩০৩	১১,৮২,০৬৭
১৯৮৭-৮৮	৩,৩০৩	১১,৮২,০৬৭	২৯৮	৬৯,৪১৪	৪৬	৭,২৯১	৩,৫৫৫	১২,৪৪,১৯০
১৯৮৮-৮৯ ফেব্রুয়ারি	৩,৫৫৫	১২,৪৪,১৯০	২৬৭	৫৭,২৫৬	৪৫	১২,৫৮২	৩,৭৭৭	১২,৮৮,৮৬৪

উৎসঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম পরিদপ্তরের ১৯৮৮-৮৯ সালের বার্ষিক কার্যাবলীর প্রতিবেদন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.৯ ঃ ১৯৮৪ এবং ১৯৮৫ সালের বিভাগ ভিত্তিক রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের বিবরণী ।

ক্রমিক নং	বিভাগীয় অফিসের নাম	ইউনিয়নের সংখ্যা		সদস্য- সংখ্যা	
		১৯৮৪	১৯৮৫	১৯৮৪	১৯৮৫
১	ঢাকা বিভাগ	৩০৫	৫১	৬১,৬৯২	৭,৩৯০
২	চট্টগ্রাম বিভাগ	৯৫	১৯	২৭,৬৮২	৩,৪৯০
৩	খুলনা বিভাগ	৫৭	১৫	১২,৬৮৫	২,৫৪১
৪	রাজশাহী বিভাগ	৭৬	১৭	৯,৭৩৭	১,৬৩৬
মোট		৫৩৩	১০২	১,১১,৭৯৬	১৫,০৫৭

উৎস ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালের বাংলাদেশের শ্রম জার্নাল ।

সারণী - ৬.১০ ঃ

সদস্য-সংখ্যা অনুযায়ী ১৯৮৪ এবং ১৯৮৫ সালের ট্রেড ইউনিয়নের শ্রেণী বিন্যাস ।

	ইউনিয়নের সংখ্যা		সদস্য-সংখ্যা	
	১৯৮৪	১৯৮৫	১৯৮৪	১৯৮৫
৫০ পর্যন্ত	১৬৪	৩৫	৪,৮৬৮	১,০৪৬
৫১-১০০	১২২	২৩	৮,৩১৯	১,৭৪৮
১০১-৫০০	২০০	৩৮	৪০,৯৯৫	৭,৬৩৯
৫০১-১০০০	২১	৫	১৪,৭০৯	৩,১২০
১০০১-২০০০	১৯	১	২৪,০৫৩	১,৫০৪
২০০১-৫০০০	৬	--	১৩,৮০২	--
৫০০০ এর উপর	১	-	৫,০৫০	--
মোট	৫৩৩	১০২	১,১১,৭৯৬	৫,০৫৭

উৎস ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালের বাংলাদেশ শ্রম জার্নাল থেকে সংগৃহীত ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৬.১১ ঃ ১৯৮৪ এবং ১৯৮৫ সালের শিল্পভিত্তিক রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়নের বিবরণী ।

ক্রমিক নং	শ্রেণীভিত্তিক শিল্পের নাম	ইউনিয়নের সংখ্যা		সদস্য-সংখ্যা	
		১৯৮৪	১৯৮৫	১৯৮৪	১৯৮৫
১	জুট টেক্সটাইল	৩০	৩	২৫,৬৭৪	১,৯০৪
২	কটন টেক্সটাইল	৪৮	২	১০,৭৮৯	--
৩	চিনির কল	৩	--	৬৩০	--
৪	ম্যাচ	১	--	৬২	--
৫	প্রকৌশল(ওয়ার্কশপসহ)	৫০	১১	৩,০৬৯	৬৪৭
৬	কৃষি	৬	১	২,০৩৮	৮৫
৭	সিগারেট	১৪	৩	৩,৫৮৯	৬৭৭
৮	অ্যালুমিনিয়াম, এনামেল সিরামিক এবং গ্লাস	১১	--	৭৫০	--
৯	পরিবহণ	৪৫	১৭	৯,০৫৬	৪,০৯২
১০	কেমিক্যাল ফার্মাসিউটিক্যাল	২১	৩	১,৭০০	১৬৭
১১	ব্যাংক	২২	৩	১৫,০০৯	৫২৮
১২	ছাপাখানা	১১	৫	১,৩১৮	৫২০
১৩	সিনেমা (চলচ্চিত্রসহ)	৬	১	২৩২	৯
১৪	বৈদ্যুতিক	৮	১	১,১৫৭	৭৯
১৫	সরকারি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা (ওয়ার্কশপ ছাড়া)	৫০	১১	১১,৬৬৬	৯৬৫
১৬	তৈল, গ্যাস ও পরিশোধন	১	--	১০৩	--
১৭	হোটেল, রেস্তোরাঁ ও খাদ্য	২৩	৫	২,১৫৬	৩৭৮
১৮	ট্যানারী	২	--	৪৭	--
১৯	জুট প্রেস	৯	১	১,২৩৯	৪২৩
২০	ডক ও বন্দর	২	--	২০৩	--
২১	দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান	৪৮	১১	৪,৬২৪	১,৩৬০
২২	করাত কল	--	১	--	৩১
২৩	বিবিধ শিল্প	১২২	২৩	১৬,৬৮৫	৩,৩৪২
২৪	মোট	৫৩৩	১০২	১,১১,৭৯৬	১৫,০৫৭

উৎস ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শ্রম পরিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালের বাংলাদেশ শ্রম জার্নাল ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়নের দুর্বলতার কারণসমূহ

বাংলাদেশের শ্রমিকসংঘ আন্দোলন এখনও পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা যুক্তরাজ্যের ট্রেড ইউনিয়নসমূহের তুলনায় বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়নসমূহ অনেকটা অনগ্রসর রয়েছে । এই অনগ্রসরতার কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক দলসমূহের প্রভাব, একতার অভাব, অর্থসংস্থানের অপ্রতুলতা, শিক্ষার অভাব,নেতৃত্বের অভাব, মালিক বা ব্যবস্থাপনার অসহযোগিতা ইত্যাদি । সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও বিকাশে প্রতিবন্ধকতার ফলে শ্রমিক কর্মীদের যৌথ দর কষাকষির পন্থা বিঘ্নিত হয় । ফলে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী আদায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়না । সেজন্য শিল্প বিরোধ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে আলাপ আলোচনার পরিবর্তে আইন আদালতের আশ্রয় নিতে হয় । সুষ্ঠু ও কার্যকর ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা থাকা দরকার ।

বদরুদ্দীন উমর বলেন,

"ট্রেড ইউনিয়নকে ঠিকমত কাজ চালিয়ে যেতে না দিলে একদিকে যেমন শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্থ হন তেমনি অন্যদিকে তাঁদের বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকার ফলে রাজনীতি ক্ষেত্রেও তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। অর্থাৎ ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের রাজনীতিকরণ হতে থাকে । আমাদের দেশে এ ধরনের দৃষ্টান্ত আমরা পাকিস্তানী আমলে দেখেছি ।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসন আমলে ট্রেড ইউনিয়নের উপর অনেক নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখা হয় । সেই সব নিষেধাজ্ঞার ফলে শ্রমিকরা ধর্মঘট এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের দাবী দাওয়ার আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারতেন না । ধর্মঘট শ্রমিক আন্দোলনের সব থেকে শক্তিশালী হাতিয়ার । তাই ধর্মঘট নিষিদ্ধ থাকায় শ্রমিকরা আইনসম্মত ভাবে আন্দোলন করতে পারতেন না, যদিও ধর্মঘট পুরোপুরি ঠেকিয়ে রাখা সে সময়েও সরকারের পক্ষে সম্ভব হতোনা ।

পাকিস্তানী আমলে শেষ পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়নের উপর এইভাবে নিষেধাজ্ঞা জারী থাকার ফলে শ্রমিকরা বিশেষ কোন দাবী দাওয়া আদায় করতে পারেন নি । কিন্তু সেটা তাঁরা করেছিলেন ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের দিকে ঘেরাও আন্দোলনের মাধ্যমে। সে সময় আইয়ুব সরকার বিরোধী গণ আন্দোলন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে এবং সেই রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখেই শ্রমিকরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কলকারখানার মালিকদেরকে ঘেরাও করে নিজেদের দাবী দাওয়া কিছুটা আদায় করতে সক্ষম হন । ..... সরকার ট্রেড ইউনিয়ন আইন ভঙ্গ করার ফলেই শ্রমিকরাও বাধ্য হয়েছিলেন ধর্মঘট ইত্যাদি আইনসম্মত পথে অগ্রসর হতে না পেরে সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে দাবী আদায় করতে । ..... আইয়ুব খানের সামরিক শাসন আমলে যেমন তাঁরা আন্দোলনের জন্য ব্যবহার করেছিলেন ঘেরাও পদ্ধতিকে । তেমনি এখন তাঁরা গ্রহণ করেছেন রেলপথ-রাজপথ অবরোধের পদ্ধতি।

Dhaka University Institutional Repository

..... শ্রমিকদের অবরোধ আন্দোলন যে ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ম বহির্ভূত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে কারণেই এই আন্দোলনকে রাষ্ট্রবিরোধী, দেশীয় স্বার্থবিরোধী ইত্যাদি আখ্যা দেয়া চলেনা । কারণ শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আইন ও রীতি বিরোধী কাজ সরাসরিভাবে মালিক পক্ষ এবং সরকারের ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ম বিরোধী কাজেরই প্রতিক্রিয়া মাত্র । মালিকপক্ষ এবং সরকার যদি সঠিক এবং যথাযথভাবে ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ম কানুন চালু রেখে ট্রেড ইউনিয়নের সাধারন কার্যক্রম আইনসম্মতভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা রাখতো তাহলে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নগুলিও আইন অনুযায়ী আন্দোলন এবং দর কষাকষি চালিয়ে যেতে পারতো । কিন্তু তাদের জন্য সে সম্ভাবনার দরজা বন্ধ করা এবং অন্যদিকে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন দ্রুতগতিতে খারাপ হতে থাকা এবং দুর্বিষহ হওয়ার কারণে রাজপথ-রেলপথ অবরোধের পথ অনুসরণ করা ছাড়া তাদের সামনে আর কোন বিকল্প নেই।[২৬]

তিনি আরও বলেন, "পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে ট্রেড ইউনিয়নের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভের জন্য ঐতিহাসিকভাবে শ্রমিক শ্রেণীকে অনেক সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে । পুঁজিবাদী বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রমিকরা ছিলেন একেবারে অধিকারহীন। কাজের নির্ধারিত সময়, মজুরী ও কাজের নিশ্চয়তা, কাজের শর্ত ইত্যাদি বলতে কিছুই ছিলনা । এ সব নিয়ে দাবী তুলতেই শ্রমিকদের উপর নির্যাতন আসতো, তাঁদেরকে সহজেই ছাঁটাই করা হতো ।

শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার জন্য কোন আইন না থাকায় শ্রমিকদেরকে নিজেদের দাবী দাওয়ার আন্দোলন প্রথমদিকে বেআইনীভাবেই শুরু করতে হয়েছিল। বলা চলে, এভাবেই শুরু করতে তারা বাধ্য হয়েছিলেন। এক পর্যায়ে শ্রমিক আন্দোলন যখন শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হলো এবং বেআইনীভাবেই মালিকদের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করলো তখন মালিক শ্রেণী উৎপাদন অব্যাহত এবং সেই সঙ্গে নিজেদের মুনাফা নিশ্চিত ও নিরাপদ রাখার জন্য বাধ্য হলো ট্রেড ইউনিয়নকে আইনগত স্বীকৃতি দিতে । ট্রেড ইউনিয়নকে শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠন হিসাবে স্বীকৃতি প্রদানের পর বুর্জোয়া শ্রেণী এমনভাবে আইনের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে, যাতে করে শ্রমিক আন্দোলনকে বিপ্লবী আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে না দিয়ে তাকে পুঁজিবাদী উৎপাদন কাঠামোর মধ্যেই আটকে রাখা যায়"।[২৭]

বাংলাদেশে শিল্পে শ্রমবিরোধ :

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে শিল্পায়নের সাথে সাথে দুটি শ্রেণীর জন্ম হয় । (১) মালিক শ্রেণী (২) শ্রমিক শ্রেণী । এ ধরনের অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধনীকে আরও ধনী করা । ধন সম্পদ ও সামাজিক ক্ষমতা কিছু লোকের হাতে কুক্ষিগত হয় । শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করার ফলে শ্রেণী চেতনা ও শ্রেণী সংগ্রামের জন্ম হয় । তাই উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিবাদ চলছে । শ্রমিকরা চায় অধিক সুযোগ-সুবিধা ও

Dhaka University Institutional Repository

পারিশ্রমিক; আর মালিক শ্রেণী যতদুর সম্ভব তা কম প্রদান করতে চায় । এতে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিবাদ -বিসংবাদ দেখা দেয় । যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ধর্মঘট, ধীরে চলা, লক-আউট প্রভৃতির মাধ্যমে ।

অর্থনৈতিক বা অন্য কোন বিষয় নিয়ে মালিক পক্ষ এবং শ্রমিকের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব বা বিরোধ দেখা দেয় তাকেই শিল্পবিরোধ বলে । শ্রমিকদের নিজেদের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব বা কলহও এই বিরোধের পর্যায়ে পড়ে। শ্রমবিরোধ চরম রূপধারন করলে শ্রমিকরা অবাঞ্ছিত উপায়ে তাদের দাবী-দাওয়া আদায়ে সচেষ্ট হয়। তখন ধর্মঘট ও লক-আউটের মত ঘটনা ঘটে থাকে। এক কথায় মালিক ও শ্রমিক, শ্রমিক ও শ্রমিকের মধ্যে কার্য, কার্যশর্ত বা কার্যের অবস্থাবলী নিয়ে যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত দেখা দেয় তাকেই শিল্প বিরোধ বলে ।

শ্রম অসন্তোষের কারণ : নিম্নে শ্রম-অসন্তোষের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হল ।

অর্থনৈতিক কারণ : শিল্প শ্রমিকদের যে স্বল্প মজুরি দেয়া হয় তাতে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়না। দীনতা, হীনতা, অর্ধভুক্ত কিংবা অভুক্ত থাকার ফলে তাদের আক্রোশ মালিকের উপর পড়ে এবং মজুরী বৃদ্ধির জন্য যৌথভাবে দাবী উঠায়। দাবী আদায় না হলে আন্দোলনের আশ্রয় নেয়, কখনো ধর্মঘট, আবার কখনো তারা জঙ্গীরূপ ধারন করতে কুন্ঠাবোধ করেনা । মালিকরা ইচ্ছে করলেই কাজের নির্ধারিত সময়ের পরে শ্রমিকদের দিয়ে শ্রম আদায় কবতে পারেনা। এর ব্যতিক্রম যেখানে হয়েছে সেখানেই শিল্পবিরোধ ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ ১৮৮৬ সালেব যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে সৃষ্ট শ্রমিক অসন্তোষের বিষয়টি উল্লেখ করা যায় । এই বিপ্লবের মাধ্যমে সারা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের জন্য দৈনিক আট ঘন্টা করে বাধ্যতামূলক শ্রমদান নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । বাংলাদেশের অধিকাংশ কলকারখানায় নিয়োগবিধি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ উপায়ে হয় তাই এ নিয়মের বিরুদ্ধে প্রয়োজনের সময় সচেতন শ্রমিকরা আন্দোলন গড়ে তুলে । শিল্পে আধুনিকীকরণ করার ফলে নতুন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয় ফলে পুরাতন ও অদক্ষ শ্রমিক ছাঁটাইয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয় । বিশেষকরে অদক্ষ শ্রমিকদের ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থা নিলে অসন্তোষ দেখা দেয় । কারখানায় কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনাজনিত কোনো মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শ্রমিক মালিকের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে । শ্রমিকরা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর ক্ষতিপূরনের জন্য নানা দাবি তুলে । মালিকপক্ষ দাবির প্রতি অনীহা প্রকাশ করলে বিরোধ দেখা দেয় । শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারীদের বাৎসরিক উৎসব বোনাসের দাবিতেও বিরোধ সৃষ্টি হয়ে থাকে ।

রাজনৈতিক কারণ : স্বীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য শ্রমিকরা সংঘে যোগদান করে থাকে । কর্তৃপক্ষ শ্রমিক সংঘকে অনুমোদনদানে অস্বীকৃতি জানালে অথবা শ্রমিকদের সংঘে যোগদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চাইলে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয় । প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক

Dhaka University Institutional Repository

কারণেও অনেক সময় শিল্পে সংঘর্ষ হয়ে থাকে । শ্রমিক সংঘ প্রায় ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দলগুলোর সমর্থনপুষ্ট হওয়ায় কোন রাজনৈতিক দল বা নেতার সমর্থনে শ্রমিকরা প্রতীক ধর্মঘটের মাধ্যমে তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করে থাকে ।

সামাজিক কারণ : কারখানার বাইরের ও আভ্যন্তরীণ নোংরা পরিবেশ, কারখানার নির্গত ধোঁয়া, স্বাভাবিক বায়ু চলাচলের পথ, নিরাপত্তার ব্যবস্থা, শ্রমিকদের বিশ্রামাগার, ক্যান্টিন টয়লেট ইত্যাদির সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সরাসরি নির্দেশ ও আইন থাকা সত্ত্বেও প্রায় ক্ষেত্রে সেগুলো রাখা হয়না । ফলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা থাকে । ভাল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মালিকপক্ষ গাফলতি করলেই শ্রমিক-মালিকের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় যা যে কোন সময় চরমাকার ধারন করতে পারে । তাছাড়া জরুরী বিভাগে নিয়োজিত কর্মচারীদের আবাসগৃহের জন্য দাবি তোলা হয়। কর্তৃপক্ষকে বার বার অনুরোধ জানিয়ে ব্যার্থ হলে দিনে দিনে ক্ষোভ জমা হয়ে একপর্যায়ে বিরোধের সৃষ্টি হয় । শ্রমিকদের এ ধরনের দাবি সাধারণত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসমূহে বেশী দেখা যায় । যাতায়াতের ব্যবস্থা করার জন্য শ্রমিকদের পক্ষ থেকে দাবি উঠতে পারে । কিন্তু কর্তৃপক্ষ উদাস হলে বিরোধ দেখা দেয় । বড় বড় শিল্পকারখানাগুলোতে সাধারনত এ ধরনের দাবি উঠে । মনস্তাত্ত্বিক কারণেও অনেক সময় শিল্পক্ষেত্রে শ্রমবিরোধ দেখা দেয় ।

বাংলাদেশের শিল্প শ্রমিক : বাংলাদেশ শিল্পক্ষেত্রে অনুন্নত হওয়ায় মোট শ্রমশক্তির মাত্র শতকরা ৬ থেকে ৭ ভাগ বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও কলকারখানায় নিয়োজিত আছে । দেশের অধিকাংশ শিল্প শ্রমিক গ্রামে পরিবার পরিজনকে রেখে অস্থায়ীভাবে কারখানায় কাজ করতে আসে । এজন্য আমাদের দেশে প্রকৃত শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা অত্যন্ত কম । শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা যেমন কম তেমনি তাদের দক্ষতাও কম। জাপান, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের তুলনায় শিল্প শ্রমিকের কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনক্ষমতা অনেক কম ।

বাংলাদেশে শিল্প শ্রমিকদের স্বল্প দক্ষতার কারণ : (১) অতীত ঐতিহ্য ও বংশগত অভিজ্ঞতার অভাব (২) ঘন ঘন পেশা পরিবর্তন (৩) শারীরিক দুর্বলতা (৪) প্রতিকূল আবহাওয়া (৫) শিক্ষার অভাব (৬) কারিগরি জ্ঞানের অভাব (৭) দক্ষ পরিচালকের অভাব (৮) ত্রুটিপূর্ণ নিয়োগ পদ্ধতি (৯) প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশ (১০) স্বল্প মজুরি (১১) প্রশিক্ষণের অভাব (১২) আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব (১৩) শ্রমিক সংঘের অভাব (১৪) সুযোগ-সুবিধার অভাব (১৫) কারখানার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ । এই সকল কারনে বাংলাদেশের শ্রমিকদের দক্ষতা অনেক কম হয়ে থাকে ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে শ্রমশক্তি শোষণ : ১৮৮৬ সালের ১লা মে থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রমিকরা ৮ ঘন্টা কর্মসময় নির্ধারনের জন্য অনেক সংগ্রাম করেছিলেন এই সংগ্রামের পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত ৮ঘন্টা কর্ম সময় শুধু নয়, সপ্তাহে দুইদিন মজুরীসহ ছুটির দাবীও পুঁজি মালিক শ্রেণী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল । এইভাবে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এখন সাপ্তাহিক কর্মসময় হচ্ছে ৪০ ঘন্টা । বাংলাদেশের শ্রমিকদের শ্রম-শক্তি শোষণের অন্যতম দিক হচ্ছে ৮ ঘন্টা কাজের পরিবর্তে শ্রমিকদেরকে আরও দীর্ঘ সময় নিয়মিত কাজ করতে বাধ্য করা । বাধ্য করা হয় দুভাবে। (১) ৮ ঘন্টার বেশী কাজ করানো (২) ওভারটাইম বা অতিরিক্ত শ্রমশক্তি দিতে শ্রমিকদেরকে পরোক্ষভাবে বাধ্য করা ।

কাজের সময় ৮ ঘন্টা নির্ধারিত থাকলেও অধিকাংশ ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প কারখানাতে শ্রমিকদেরকে ৮ ঘন্টার পরিবর্তে দশ/বারো এমনকি চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত কাজ করতে হয় । এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য তাদেরকে কোন অতিরিক্ত মজুরী দেওয়া হয়না । কল-কারখানার মালিকরা একরকম বেপরোয়াভাবেই শ্রমিকদেরকে শোষণ করে থাকে । এক্ষেত্রে আইন লংঘন করে চলা সত্ত্বেও সরকারও তেমন কোন পদক্ষেপ নেয়না ।[২৮]

বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, "বড় কারখানা মালিকদের থেকে ছোট এবং মাঝারি কারখানা মালিকরাই এ কাজ বেশী করে থাকে । এর কারণ এইসব কারখানায় শ্রমিকদেরকে কোন নিয়োগপত্র সাধারণত দেওয়া হয়না এবং সেগুলিতে শ্রমিকদের কোন ইউনিয়নও থাকেনা। ইউনিয়ন গঠনের চেষ্টা কেউ করলে মালিক সেই শ্রমিককে ছাঁটাই করে দেয়। .... সরকারী এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন বড় কলকারখানাতে শ্রম সময় ৮ ঘন্টা থাকলেও সেগুলিতে ওভারটাইম কাজের নিয়মিত ব্যবস্থা থাকে । এই ওভারটাইম বা অতিরিক্ত কাজ করতে শ্রমিকদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায়। এই ওভারটাইম ব্যবস্থা শ্রমিকদের শ্রমশক্তি অতিরিক্ত শোষণের একটি ব্যবস্থা মাত্র ।.....

..... ওভারটাইম ব্যবস্থা আসলে ৮ ঘন্টা শ্রমদিবস সম্পর্কিত আইনের এক সুচতুর লংঘণ । এক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে যা করা হয় সেটা হলো ৮ ঘন্টা কাজের বিনিময়ে প্রাপ্য মজুরী ৮ ঘন্টা কাজ করিয়ে না দিয়ে আরও ২ বা ৪ ঘন্টা অতিরিক্ত কাজ করিয়ে দেওয়া । বাঙলাদেশে এই ধরনের শ্রমশক্তি শোষণ একটি প্রচলিত, গৃহীত ও স্বীকৃত ব্যাপার। .... নারী-পুরুষ একই কাজ করলেও নারী শ্রমিকদের মজুরী দাঁড়ায় পুরুষের মজুরীর দুই-তৃতীয়াংশ, অর্ধেক, এমনকি অর্ধেকেরও কম । মাটিকাটা থেকে শুরু করে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মধ্যে নারী শ্রম শক্তির এই মাত্রাতিরিক্ত শোষণ বাঙলাদেশের সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায়" ।[২৯]

তিনি আরও লিখেছেন, "একথা সাধারণভাবে জানা নাই যে, বাঙলাদেশে শিশু শ্রমিকদের দশ বারো ঘন্টা এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে তার থেকে বেশী সময় কাজ করতে হয় । এই কাজের শেষে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

নড়াচড়ার ক্ষমতা পর্যন্ত আর থাকেনা। প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং যথেষ্ট রাত্রির বিশ্রামের অভাবের পরদিন তাদেরকে আবার শুরু করতে হয় সেই দশ বারো ঘন্টা কাজ । এই দীর্ঘ সময় সত্ত্বেও শিশু শ্রমিকদের মজুরী একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শ্রমিকের মজুরীর এক তৃতীয়াংশ থেকে এক পঞ্চমাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। যেহেতু তাদের কাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দিন মজুরের মতো, সে কারণে অসুখ বিসুখে তাদের মজুরী বন্ধ থাকেই, তাছাড়া চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাও হয়না। এই শিশু শ্রমিকদের মধ্যে এ কারণে নানারকম অকাল ব্যাধি ও মৃত্যু প্রায়ই ঘটে থাকে । তাদের কোন ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের প্রশ্ন উঠেনা কারণ তাদেরকে বেআইনীভাবেই নিয়োগ করা হয়ে থাকে এবং যেকোন ধরনের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের অর্থ দাঁড়ায় কর্মচ্যুতি বা ছাঁটাই"।[৩০]

এখানে উল্লেখ করতে হয় যে বর্তমানে বাংলাদেশে ৬০ লাখেরও বেশী শিশু শ্রমিক রয়েছে এবং এর সংখ্যা দিন দিন আরো বাড়ছে ।[৩১]

সারণী ৬.১২ ঃ Working children Aged 5 to 14 years by Major Industry and sex 1995-96

Major occupation	Bangladesh			Urban			Rural		
	Both sex	Male	Female	Both sex	Male	Female	Both sex	Male	Female
Total	6304	3771	2533	1060	598	462	5244	3173	2071
Agriculture	4122	2529	1593	234	131	103	3888	2398	1490
Manufacturing	514	336	178	222	133	89	292	203	89
Transport/ Communication	114	112	2	41	41	-	73	71	2
Other services	647	542	105	249	213	36	398	329	69
Household services/others	907	252	655	314	80	234	593	172	421

Source : CLS Report, 1995-96.

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.১৩ ঃ Employed Population (10 years+) by Industry.

Industry	All area			Rural			Urban		
	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female
Bangladesh	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Agriculture	50.3	67.6	4.6	54.8	73.1	5.1	12.7	17.4	1.3
Mining	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Manufacturing	3.8	4.6	1.6	3.1	3.9	1.0	9.6	11.0	6.5
Water/Gas	0.1	0.1	0.02	0.05	0.06	0.01	0.4	0.5	0.07
Construction	0.6	0.7	0.1	0.4	0.5	0.1	2.0	2.7	0.3
Business	9.2	11.8	1.0	7.5	9.9	0.9	20.8	28.6	2.2
Transport	2.4	3.3	0.1	1.8	2.4	0.1	8.0	11.1	0.6
Real Estate	0.4	0.5	0.1	0.2	0.3	0.1	2.0	2.6	0.6
Com/S.Ser.	31.3	9.9	89.8	30.3	8.4	90.2	41.7	23.5	85.5
N.E.C.	1.8	1.4	2.6	1.7	1.3	2.6	2.7	2.5	3.0

Source : BBS , Socio-Economic and Demografic, Report August 1999

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.১৪ : AVERAGE WAGE RATES FOR INDUSTRIAL WORKERS IN BANGLADESH

(Nominal wage in Taka)

Sl. No.	Industry	Type of labour	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002		
								Nov.	Dev.	Jan
1. (i)	Medium & Large Scale Industry. Cotton textile	Skilled Unskilled	80.97 69.17	100.24 76.10	100.24 76.10	107.77 85.50	107.77 85.50	107.77 85.501	107.77 85.50	107.77 85.50.
(ii)	Jute textile	Skilled Unskilled	80.97 69.17	100.24 76.10	100.24 76.10	107.77 85.50	107.77 85.50	107.77 85.50	107.77 85.00	107.77 85.50
(iii)	Match	Skilled Unskilled	80.97 69.17	100.24 76.10	100.24 76.10	107.77 85.50	107.77 85.50	107.77 85.80	107.77 85.50	107.77 85.50
(iv)	Engineering (fitter)	Skilled Unskilled	96.39 79.28	111.40 88.75	119.72 93.38	135.75 96.66	153.75 106.25	163.75 106.25	168.75 106.25	168.75 110.90
(v)	Edible oils	Skilled Unskilled	78.82 70.42	93.61 80.65	93.19 83.92	93.44 87.40	106.25 91.25	110.42 92.00	110.42 92.00	110.42 92.00
2.	Small & Cottage Industry.	Skilled Unskilled	70.66 51.42	75.94 58.63	81.94 59.25	86.82 ...	96.25 ...	101.00 ...	102.00 ...	103.00 ...
3.	Construction	(weaver) Skilled Unskilled (helper)	111.79 69.55	131.19 70.72	141.44 78.55	148.31 82.81		164.75 84.00s	165.50 84.50	166.25 84.50

Note The averages are based on data collected from 4 centres viz. Chittagong, Rajshahi and Khulna.

Source : National Accounting Wing. BBS

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.১৫ ঃ WAGE RATE INDICES BY MAJOR SECTORS IN BAGLADESH

(Base : 1969-70 = 100)

		Nominal Indices					Indices deflated by country CPI		
Period	General	Agirculture	Fishery	Manufac-turing Industry	Construction	Country CPI of industrial workers	General	Manufacturing industry	Construction
1996-97	1989	1804	1974	2161	1848	1663	120	130	111
1997-98	2141	1870	2053	2395	1990	1748	122	137	114
1998-99	2259	1950	2138	2522	2163	1921	118	131	113
1999-2k	2390	2037	2220	2701	2286	1973	121	137	116
2000-01	2489	2141	2292	2832	2356	2032	122	139	116
2000-01									
Jan	2490	2136	2296	2828	2360	1997	124	141	118
Feb	2496	2146	2300	2838	2360	1993	125	142	118
Mar	2503	2155	2304	2848	2361	2002	125	142	118
Apr	2516	2159	2308	2871	2369	2004	126	143	118
May	2525	2172	2315	2882	2376	2006	126	144	118
Jun	2541	2189	2328	2902	2385	2108	127	145	119
2001-02									
Jul	2554	2194	2339	2921	2393	2011	127	145	119
Aug	2565	2210	2345	2936	2397	2013	127	146	119
Sep	2577	2210	2357	2955	2405	2017	128	147	119
Oct	2594	2225	2375	2978	2412	2019	128	147	119
Nov	2610	2239	2390	3001	2419	2021	129	148	120
Dec	2626	2253	2403	3023	2428	2023	130	149	120
Jan	2642	2266	2417	3045	2438	2027	130	150	120

Source : National Accounting Wing, BBS

সারণী ৬.১৬ : Employment indices of industrial Workers in Selected Industries

(Base: 1988-89= 100)

	Jute			Cotton	paper		Steel		Cement		Fertilizer		Petroleum		Paints & Varnish	
Period	Population Workers	All employees	Population Workers	All employees	Population Workers	All employees	Population Workers	All employees	Population Workers	All employees	Population Workers	All employees	Population Workers	All employees	Population Workers	All employees
1991-92	88.26	89.21	108.04	108.04	99.89	[illegible]	98.73	98.68	96	103	159	150	99	110	80	83
1992-93	85.61	86.14	109.35	108.28	96.81	98.78	96.60	96.57	93.68	97.05	113.71	112.19	105.99	109.11	102.67	91.86
1993-94	81.08	80.51	91.56	90.83	87.28	91.78	90.84	91.47	45.17	92.59	110.62	110.34	113.35	113.58	108.02	95.10
1994-95	78.80	77.25	82.56	80.81	82.08	88.56	76.10	75.51	422.34	96.90	107.55	110.45	115.80	115.21	113.36	[illegible]
1995-96	76.70	74.37	72.97	72.72	79.84	86.38	75.11	74.30	113.18	108.53	108.05	109.64	122.07	118.45	113.90	108.84
1996-97	75.42	72.70	72.20	71.88	77.05	83.24	39.04	39.24	112.08	104.83	106.90	107.90	118.80	118.25	125.13	[illegible]
1997-98	75.50	73.10	72.33	72.10	74.55	80.53	37.45	37.93	121.42	117.60	108.78	107.77	116.89	117.76	133.68	124.64
1998-99	75.39	72.68	71.26	71.41	72.58	78.60	35.32	35.74	146.97	139.82	180.57	107.44	110.62	117.42	139.03	[illegible]

Source : BBS

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমশক্তি শোষণ, শ্রমিক অসন্তোষ এবং অস্থিতিশীলতা ঃ

শিল্পায়নের সামগ্রিক প্রভাব সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে । সবচেয়ে বেশী যেটির প্রভাব সমাজ ও রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করে তুলে সেটি শ্রমিক অসন্তোষ । বর্তমানে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে এর বিরুদ্ধে শ্রমিকরা প্রায়ই আন্দোলন করে থাকে। Wage rights এর দাবি করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলনে যাচ্ছে । ফলে স্থিতিহীনতা ঘটছে। গার্মেন্টস শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রচণ্ডভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে । নিম্নের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি অনুধাবন করা যায় ।

স্বাধীনতার পর আধুনিক ম্যানুফেকচারিং সেক্টরের সাফল্যের কারণ হচ্ছে রেডিমেট গার্মেন্ট শিল্প।[৩২] এই সেক্টরের শুরু ১৯৭০ দশকের শেষ ভাগে। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিস্ময়কর বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার। দেড় দশকের মধ্যেই এই সেক্টরের বিশাল বিস্তৃতি ঘটে এবং শিল্প সেক্টরের মধ্যে গার্মেন্ট কোম্পানিগুলিই সবচেয়ে বেশী মজুরি শ্রমিক নিয়োগ করে । পোশাক উৎপাদনের কারখানাগুলি ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে রয়েছে এবং শ্রমশক্তির প্রধান অংশই নারী । এই সেক্টরের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নারীর ব্যাপক সংখ্যাধিক্য। ১৯৯১ সালের শ্রম দফতরের আদমশুমারি অনুযায়ী পাটকলে নারী শ্রমিকের সংখ্যা খুবই অল্প। আড়াইলক্ষ কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ৫৭৩ জন নারী শ্রমিক। পাটকলের মালিকরা পুরুষ শ্রমিক নিয়োগ করতে চায় অন্যদিকে কমবয়সী মেয়েদের নিয়োগ করতে চায় গার্মেন্ট ফ্যাক্টরির মালিকরা । শ্রমিকদেরকে সময়ের হিসেবে মজুরি দেয়া হয় । তাদের কাজ হচ্ছে সেলাই মেশিনে ট্রাউজার ও সার্ট সেলাই করা । বাংলাদেশের ইতিহাসে নারীরা সর্বপ্রথম কারখানায় দলবদ্ধভাবে শ্রমিক হিসেবে ব্যাপকভাবে নিয়োজিত হতে পেরেছে এই সেক্টরের অভ্যুদয়ের ফলেই । প্রতি উৎপাদনী ইউনিটে শ্রমিকদের সংখ্যা ১০০ অথবা ১৫০ থেকে ১৫০০ অথবা তারও বেশী হয়ে থাকে । আর এই উৎপাদন মূলত রপ্তানীর জন্য করা হয়ে থাকে । বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত থেকে বলা যায়, আধুনিককালে তৃতীয় বিশ্বের প্রচুর নারী (কম বয়সী) বিশ্ব বাজার কারখানায় নিয়োজিত এবং শোষণের লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে তারা । মার্কস তার অর্থনৈতিক শোষণের তত্ত্ব নির্মাণ করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর বৃটেনের কারখানার অবস্থার উপর ভিত্তি করে। আজকের বাংলাদেশী কারখানাসমূহের অবস্থার সঙ্গেও তার অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায় । এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়, উন্নত বিশ্বের কোম্পানিগুলি তাদের দেশের উচ্চতর মজুরি এড়ানোর জন্যই তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে শিল্পকেন্দ্র স্থানান্তর করে । দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হংকং এর নগর রাষ্ট্র টেকসটাইল ও গার্মেন্টকে কেন্দ্র করে রপ্তানীমুখী শিল্প গড়েছিল। কিন্তু মজুরির মান সেখানেও অনেক বেশী হবার কারণে

Dhaka University Institutional Repository

বড় বড় কোম্পানীগুলি দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে উৎপাদন কেন্দ্র সরিয়ে আনে এবং এই অঞ্চলে বেশী বেশী অর্ডার দিতে থাকে। ডাচ গবেষণা কেন্দ্র সোমোর (somo) রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৮৪--১৯৯১ এর মধ্যে হংকং এর গার্মেন্ট ও টেক্সটাইল সেক্টরে ৭০ হাজার নারী শ্রমিক চাকুরী হারিয়েছিল। ৮০'র দশকের মধ্যভাগে উৎপাদনের বড় বড় কেন্দ্রগুলি চীনে নতুন করে স্থাপিত হতে থাকে। এখন চীনকে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান কাপড় ও টেক্সটাইল সেক্টরের অধিকারী বলা হচ্ছে।[৩৩] ইন্দোনেশিয়া থেকে পাকিস্তান পর্যন্ত প্রত্যেকটি দেশে টেক্সটাইল ও গার্মেন্ট সেক্টর রয়েছে এবং সেখানে লক্ষ লক্ষ নারী শ্রমিক কাজ করছে । যাদের শোষণ করা সহজ এবং খুব সহজেই শ্রমশক্তি পাওয়া যায় ।

১৯৭৬ সালে বাংলাদেশে প্রথম কারখানা স্থাপিত হবার পর গার্মেন্ট সেক্টর খুব দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করে । ১৯৮৪ সালে গার্মেন্ট ফ্যাক্টরির সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭৭-এ। বাংলাদেশ গার্মেন্ট উৎপাদক ও রপ্তানীকারক সমিতি (Bangladesh Garment Manufactures and Exporters Association) কর্তৃক প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী ১৯৯২ সালে এই ফ্যাক্টরির সংখ্যা ১১০০ -তে উন্নীত হয়। অধিকাংশ কারখানাই বাংলাদেশীদের মালিকানাধীন । তবে কিছু কিছু কারখানা যৌথ-মালিকানাধীন।

সারণী ৬.১৭ ঃ বাংলাদেশে রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে রেডিমেট গার্মেন্টের স্থান

বাণিজ্য অর্জন

বাংলাদেশের শীর্ষ পাঁচ রফতানি

মার্কিন ডলার মিলিয়ন	জুলাই-ডিসে. '৯৩	জুলাই-ডিসে.'৯২
গার্মেন্টস	৬৯২.৫	৬১৮.৭
পাটজাত দ্রব্য	১৪৫.৩	১৬১.৫
হিমায়িত খাদ্য	১২৪.৭	৮৯.৫
চামড়া	৭৬.৪	৭৭.৪
হোসিয়ারি/নিটওয়ার	৮৩.৪	৭৭.১
সব রফতানি	১,২৮৭.২	১,২০৫.৭

সূত্র ঃ মেট্রোপলিটান চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইন্ডাস্ট্রি।

সূত্র ঃ Far Easter Economic Review (1994)

Dhaka University Institutional Repository

চিত্রলেখ ৬.২ ঃ বাংলাদেশের গার্মেন্ট রপ্তানির মূল্যের পরিমাণগত বৃদ্ধি

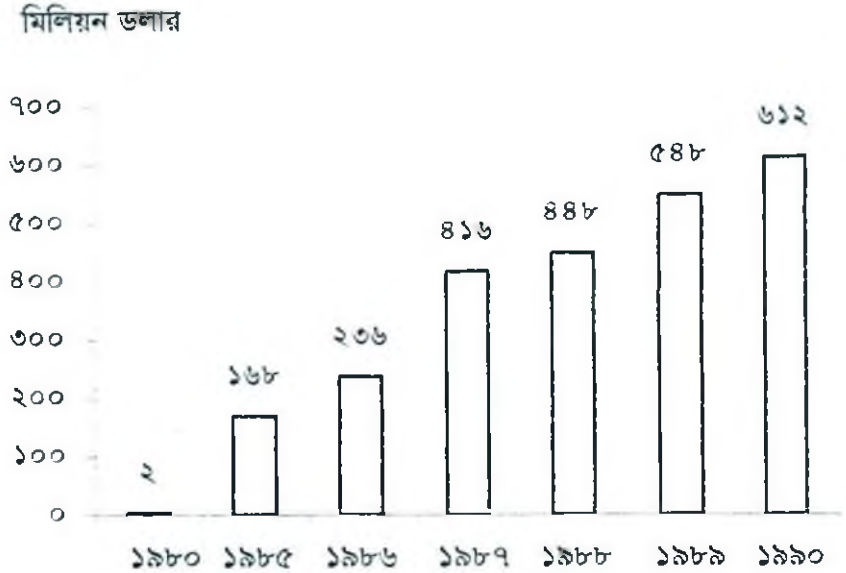

সূত্র ঃ গ্যাট ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড - ১৯৯০ - ১৯৯১

বাংলাদেশের রপ্তানী আয়ের ক্ষেত্রে গার্মেন্ট শিল্পের অবদান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে । গ্যাট (GATT) প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশ ১৯৮০ সালে পোশাক রপ্তানী করে আয় করেছিল মাত্র ২০ লক্ষ ডলার । মাত্র ১০ বছর পর এই আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ তিনশত গুণ বৃদ্ধি । পরবর্তী বছরে এক বিলিয়ন (শত কোটি) মার্কিন ডলারের বেশী আয় হয়েছে, অর্থাৎ একবছরে ৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে । তবে, উপরোক্ত হিসাবগুলিকে নিট আয় বলে বিবেচনা করা যাবেনা, কারণ ঐ আয়ের দুই-তৃতীয়াংশই চলে যায় বিপুল পরিমাণ বস্ত্র ও অন্যান্য উপাদান আমদানি করতে।[৩৪]

বাংলাদেশের মোট রপ্তানী আয়ের ক্ষেত্রে তৈরী পোশাক বিরাট ভূমিকা রাখছে । ৭০'-এর দশকের মাঝামাঝির দিকে পাটজাতদ্রব্য থেকেই আসত বাংলাদেশের রপ্তানী আয়ের ৭৫%। এখন রপ্তানী আয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্থান দখল করেছে গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিগুলি । এই খাত থেকেই দেশের রপ্তানী আয়ের অর্ধেকের বেশী আসছে ।[৩৫]

যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের বড় বড় ফার্মের কাছ থেকে বেশীর ভাগ অর্ডার আসে বাংলাদেশে। ঐ সব ফার্ম আন্তর্জাতিক গার্মেন্ট সেক্টরে যে উৎপাদন পিরামিড রয়েছে, তার সবচেয়ে উঁচুতে অবস্থান করছে । যুক্তরাজ্যের মার্কস এ্যান্ড স্পেনসার (Mark and Spencer) এবং নেদারল্যাণ্ডের সি এ্যান্ড এ (C & A) এর আছে বিপুল পুঁজি যার তুলনায় বাংলাদেশী মালিকদের পুঁজি খুবই অল্প । দেশের শ্রমিকদের

Dhaka University Institutional Repository

পরিশ্রমের বিনিময়ে যে মুনাফা অর্জিত হয়, তার মূল অংশ ঐ বিদেশী কোম্পানিগুলি ভোগ করে । কানাডার অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক মাইকেল চসুডোভস্কির (Micheal Chossudovski) হিসাব হতে বাংলাদেশের তৈরী সার্ট উন্নত বিশ্বে আমদানি দামের ৫-১০ গুন বেশী দামে বিক্রি হয়।[৩৬]

চিত্র লেখ ৬.৩

টেক্সটাইল/গার্মেন্ট সেক্টরে তীব্র প্রতিযোগিতায় রয়েছে কম মজুরির দেশগুলি।

LAREDOUTABLE CONCURRENCE DESPAYS A BASSALAIRES Conuts horaires, charges comprises, 1993-Textile et habillement

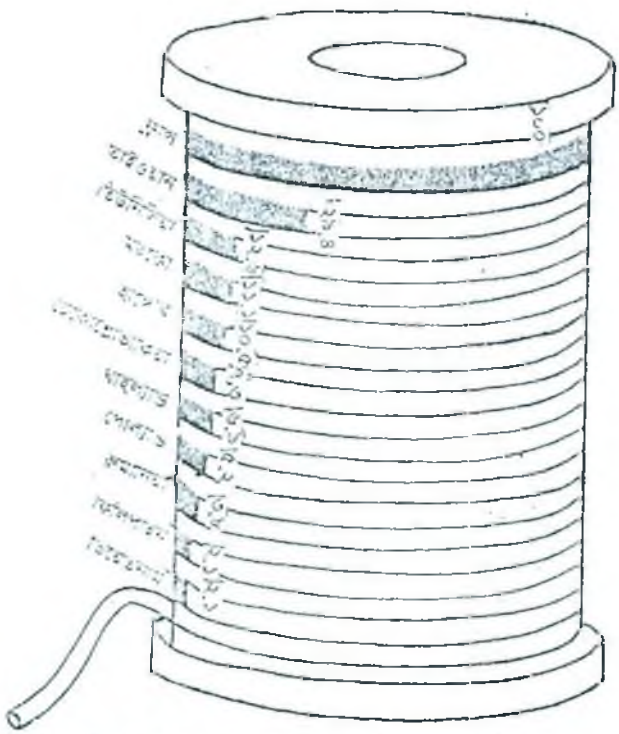

সূত্র : *Le Monde Diplomatique, December 1993*

তুলনামূলক পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে, পোশাক উৎপাদনের স্থান বাংলাদেশে চলে আসার মূল কারণ হচ্ছে এখানকার নিচু মানের মজুরি । ১৯৮৪ সালে যেখানে মার্কিন গার্মেন্ট শ্রমিকের

Dhaka University Institutional Repository

(১জন) ঘন্টা প্রতি গড় মজুরি ছিল ৭.৫৩ ডলার সেখানে বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিকের প্রতি ঘন্টা মজুরি ০.২৫ ডলারের বেশী নয়। অর্থাৎ বাংলাদেশী শ্রমিক মার্কিন শ্রমিকের শতকরা ৩ ভাগ মজুরি পেয়ে থাকে । বাংলাদেশের মজুরীর মান হংকং এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মত ব্যাঘ্র দেশের চেয়েও অনেক কম । এশিয়ার দেশগুলিতে প্রদত্ত মজুরির হারের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সবচেয়ে নীচে রয়েছে ।

গার্মেন্ট শ্রমিক শোষণ ঃ এই শিল্পে প্রায় ১৫ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হলেও বিভিন্নভাবে তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে । আনু মুহাম্মদ লিখেছেন, "এইখাতে নিয়োজিত শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশী নারী। কিশোরী তরুণী । তাদের কোন ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নেই, অধিকাংশের পরিস্কার কোন নিয়োগপত্র নেই, সাপ্তাহিক কোন ছুটি নেই । দিনে ১২/১৪ ঘন্টা কাজ করা বাধ্যতামূলক । কখনো কখনো শিপমেন্ট এর চাপ থাকলে রাতেও কাজ করতে হয়। ওভারটাইমতো বটেই নিয়মিত মজুরি প্রায় প্রতিষ্ঠানেই কমপক্ষে ২ থেকে ৩ মাস বকেয়া থাকে । কারও চাকুরী চলে গেলে বকেয়াও আর পাওয়া যায়না । সাম্প্রতিক এক হিসেবে দেখা গেছে, শুধুমাত্র গার্মেন্টস শিল্পে বকেয়ার পরিমাণ ১৫০ কোটি টাকারও বেশী । শ্রমিক নারী বলে তার নিরাপত্তাহীনতার আরেকটি মাত্রাও আছে । মালিকীয় হুমকি বা নিপীড়নের মধ্যে যৌন নিপীড়ন অনিবার্য ঘটনা । শ্রমিকদের পাওনা পয়সা পরিশোধ না করলেও পয়সা দিয়ে পোষা মাস্তানদের প্রধান কাজ এই শ্রমিকদের শায়েস্তা করা"।[৩৭] মার্কস তার 'পুঁজি' গ্রন্থে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের বৃটিশ শিল্পে শ্রম পরিবেশের যে বিবরণ দিয়েছেন তার সঙ্গে ঢাকা, চট্টগ্রাম ইত্যাদি প্রধান শহরের গার্মেন্ট ফ্যাক্টরির শ্রম পরিবেশের অনেকদিক দিয়েই মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মার্কসের মতে, " পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত আন্তর্জাতিক বাজারের মধ্যে জনগণকে যতবেশী করে টেনে আনা হচ্ছে, যত বেশী করে বৈদেশিক রপ্তানীর মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ই হয়ে উঠছে উদ্যোক্তাদের প্রধান লক্ষ্য, ততবেশী করে জোর করে বেশী খাটানোই সাধারণ নিয়মে পরিণত হচ্ছে । সর্বোচ্চ মুনাফার এই যে ইচ্ছা তাই প্রতিফলিত হচ্ছে শ্রম দিবসকে বাড়িয়ে নেবার এই নিষ্ঠুর প্রচেষ্টার মধ্যে"।[৩৮]

বাংলাদেশের গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিগুলো ১৯৬৫ সালের ফ্যাক্টরি এ্যাক্ট (Factory Act of 1965) বিভিন্নভাবে লঙ্ঘন করে চলেছে । ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিবাদ সত্ত্বেও বেশীর ভাগ ফ্যাক্টরির মালিক এ্যাক্টের ধারামতো শ্রমিকদের সাপ্তাহিক ছুটি দেয়না, তাছাড়া বিশ্রামের সময়কে ১৫ মিনিট এগিয়ে আনার রেকর্ড আছে । বিভিন্ন মানবাধিকার সংক্রান্ত সংগঠনসমূহের অনুসন্ধান এবং ট্রেডইউনিয়নের সূত্র থেকেও জানা

Dhaka University Institutional Repository

যায়, মালিকরা কিভাবে সাপ্তাহিক ও দৈনিক শ্রমঘন্টা সংক্রান্ত বিধান লঙ্ঘন করে চলছে। একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে । Commission for peace and Justice এর অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ৫২.৯% গার্মেন্ট ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে প্রতি সপ্তাহে অতিরিক্ত শ্রম ঘন্টার পরিমাণ হচ্ছে ২১ অথবা তার চেয়েও বেশী। শ্রমদিবসকে বাড়িয়ে নেয়া এই সেক্টরের বিশেষ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট অনুযায়ী কাজের সময় সকাল ৭ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা পর্যন্ত। এই সময়ের বাইরে কোন নারীকে কাজে নিয়োগ করার বিধান নেই । কিন্তু অসংখ্য গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিতে রাত ৮ টার পরও কাজ করানো হয়। কোন কোন ফ্যাক্টরিতে নারী শ্রমিকদের সারারাত ধরেই সেলাই মেশিন চালাতে বাধ্য করা হয় । ট্রেড ইউনিয়ন সূত্র ও স্বাধীন গবেষকরা এই তথ্য জোরের সাথে উল্লেখ করেছেন । ফিলিপ গেইনের মতে, এমনও বহু ঘটনা আছে, যখন নারী শ্রমিকরা বাধ্য হয়ে বিরতিহীনভাবে ৪৮ ঘন্টা, ৭২ ঘন্টা এমনকি তার চেয়ে বেশী সময় ধরে শ্রম দেয়। ফিলিপ গেইন (Philip Gain) অনেক ফ্যাক্টরি মালিকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলে দুজন মালিক স্বীকার করেন যে, ফ্যাক্টরিতে অতিরিক্ত সময় কাজ করা বাধ্যতামূলক। একজন মালিক, মুহাম্মদ বিল্লাহ্ বলেন, তার ফ্যাক্টরিতে প্রতিমাসে অতিরিক্ত ৭০ ঘন্টা কাজ করতে শ্রমিকদের বাধ্য করা হয় । এই বিধি লঙ্ঘনের জন্য তার মধ্যে কোনো প্রকার শাস্তির ভয়ভীতি ছিলনা।

১৯৬৫ সালের ফ্যাক্টরি এ্যাক্টের ৫৮ ধারায় অতিরিক্ত শ্রমের ব্যাপারে যে বিধান আছে তা হলো, অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য সাধারণ সময়ের মজুরির চেয়ে দ্বিগুণ প্রদান করতে হবে।[৩৯] তবু গার্মেন্ট মালিকরা প্রায়ই অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য দ্বিগুণ মজুরি প্রদান করেন না । বেশ কিছু কারখানায় এ কারনেও ধর্মঘট হয়েছে।[৪০] উদাহরণস্বরূপ রপ্তানীমুখী ফ্লিন্ট গার্মেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের (Flint Garment Private Limited) কথা উল্লেখ করা যায়। ঢাকায় অবস্থিত এই ফ্যাক্টরিতে ২৫০ জন শ্রমিক কাজ করে, তার মধ্যে ২৩০ জনই নারী । এই ফ্যাক্টরির শ্রমিকরা ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তিন মাসের বকেয়া বেতন ও পাঁচমাসের অতিরিক্ত সময় কাজের (Overtime) জন্য পাওনা বেতনের দাবিতে ধর্মঘট করেছিল।[৪১]

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারি ফেডারেশন (Bangladesh workers and Employees Federation) মনে করে-অতিরিক্ত সময়ের কাজের জন্য দেয়া বেতনের ব্যাপারে অনেক অনিয়ম আছে। " প্রথমত অতিরিক্ত সময় কাজের কোনো হিসাব রাখার সুযোগ আমাদের নেই । মালিকপক্ষের পরিচালকরা রেজিস্টার রক্ষা করে, কিন্তু আসলে অতিরিক্ত সময়ের কাজের জন্য যা পাওনা তার মাত্র এক তৃতীয়াংশ প্রদান করা হয় । দ্বিতীয়ত, অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য যা পাওনা তা দুই তিন মাস পর্যন্ত বকেয়া রাখা

Dhaka University Institutional Repository

হয় । বিলম্বে বেতন প্রদান করা আইনের বরখেলাপ। তৃতীয়ত, অতিরিক্ত সময়ের কাজের জন্য আইন অনুযায়ী স্বাভাবিক ঘন্টা প্রতি মজুরি শতকরা ২০০ ভাগ অর্থাৎ দ্বিগুণ দেবার বিধান থাকলেও আসলে যা দেয়া হয় গড়পড়তা হিসাবে তা হচ্ছে স্বাভাবিক ঘন্টা প্রতি মজুরির শতকরা ৪০ থেকে ৬০ ভাগ।[৪২]

বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে নারী শ্রমিকের উপর জরিমানা চাপানো হয় । ১৯৯২ সালে কয়েকজন ট্রেড ইউনিয়নকর্মীর সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় "একজন শ্রমিক একটা ভুল করলে, ৪/৫ শত শ্রমিককে শাস্তি প্রদান করা হয় । তাদেরকে অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য পাওনা দেয়া হয় না।[৪৩] ট্রেড ইউনিয়ন থেকে প্রাপ্ত আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, এক মালিক ছুটির দিন শুক্রবারে এক শ্রমিক কারখানায় হাজির হয়নি বলে তার মজুরি কেটে রাখে । এটা সম্পূর্ণরূপে অবৈধ । কারণ ফ্যাক্টরি এ্যাক্ট অনুযায়ী মালিকরা শ্রমিকদেরকে সপ্তাহে একদিন ছুটি দিতে বাধ্য । কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা মান্য হয়না এবং শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।[৪৪]

এইভাবে অবৈধ পন্থায় অর্থাৎ জরিমানার দ্বারা মালিক উদ্বৃত্ত শ্রম আদায় ও আত্মসাৎ করে শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে তুলছে। শিশু শ্রমিকদের মজুরি ও কাজের সময়কে ভিত্তি করেই অবৈধ শোষণের একটা পরিমাপ করা যায়। কোন শিশুর বয়স ১৪ বছর বা তারচেয়ে কিছু কম বা বেশী হলেও তাদেরকে প্রাপ্ত বয়স্ক নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের মতো একই পরিমাণ সময় কাজ করতে হয়। অসংখ্য রিপোর্টেই উল্লেখ আছে যে, ১৪ বছর বয়স্ক বালক বালিকাদের মাঝে ১০০ ঘন্টার মতো অতিরিক্ত সময় কাজ করতে হয়েছে।[৪৫] এ থেকে বুঝা যায় শিশুদের শোষণের মাত্রা কত তীব্র ও নির্মম। ১৯৬৫ সালের ফ্যাক্টরি এ্যাক্ট অনুযায়ী শ্রমিকের বয়স ১৪ বছর হলেই কেবল কাজে নিয়োগ করা যাবে এবং তাও দৈনিক ৫ ঘন্টার বেশী নয়।[৪৬]

মার্কিন সিনেটর হারকিন ১৯৯২ এর আগস্টে বাংলাদেশী গার্মেন্টে ব্যাপকহারে শিশুশ্রম নিয়োগের বিষয়টি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরেন। "Child labour Deterance Act" (শিশু শ্রম নিরোধক এ্যাক্ট) নামে একটি বিল মার্কিন কংগ্রেসে উত্থাপিত হয় । যে যে কোম্পানিগুলো ১৫ বছর বয়সের নিচের শিশুকে দিয়ে কাজ করিয়েছে সেগুলোর উৎপাদিত দ্রব্য আমদানি নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয় এই আইনে । আইনের খসড়া প্রণয়নের সময় বাংলাদেশের গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিগুলোতে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, কারণ ৪০০ ফ্যাক্টরি যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানির উপর নির্ভরশীল ছিল । কয়েক মাসের মধ্যেই ৩০টি ফ্যক্টরিতে ব্যাপক হারে লে-অফ (ছাঁটাই) করা হয় । একজন মালিকের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তার কারখানায় ৩৫০ জন শ্রমিকের মধ্যে ৩০০ ছিল শিশু।[৪৭] সেজন্য তাকে ৮০% শ্রমিককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হয়েছিল। বাংলাদেশে শিশু

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিকদের মাসে যে মজুরি দেয়া হয় তাকে সঙ্গতভাবে অতিশোষণ (Super exploitation) বলে অভিহিত করা যায় । মাসে মজুরি দেয়া হয় ২০০ থেকে ৩০০ টাকা অর্থাৎ ৫ থেকে ৭ মার্কিন ডলার যা যুক্তরাষ্ট্রের একজনের প্রতিঘন্টা মজুরির সমান । আনু মুহাম্মদ বলেন, " আই এল ও কনভেনশন শুধু নয়, ৬৫ সালের কারখানা আইন অনুযায়ীও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারসহ নিয়োগপত্র, স্থায়ীকরণ, সাপ্তাহিক ছুটি, নারী শ্রমিকদের বিশেষ অধিকার, নিরাপত্তা, কাজের পরিবেশ ইত্যাদির যেসব অধিকার শ্রমিকদের ক্ষেত্রে স্বীকৃত সেগুলো গার্মেন্টসহ বাংলাদেশের অধিকাংশ শ্রমিকের বেলায় অস্বীকৃত। গার্মেন্টসহ বেশীরভাগ শিল্পকারখানায় শ্রমিকদের জীবন ও শ্রম সম্পর্ক বুর্জোয়া আইনি কাঠামো থেকেও অনেক দূরে । প্রায় দাস ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনীয় এসব প্রতিষ্ঠানে মজুরি সরকার স্বীকৃত নূন্যতম মজুরিও (যা প্রকৃত অর্থে গত ৩০ বছরে এক তৃতীয়াংশে নেমে এসেছে) বাস্তবায়ন হয়নি । এর ফলে মজুরিতে অবিশ্বাস্য রকম স্বেচ্ছাচারিতা চলতে পারে, চলতে থাকে ।এই স্বেচ্ছাচারিতাকে বৈধ করার জন্য প্রতিযোগিতাশীলতা (Competitiveness) বৈদেশিক মুদ্রা আয়, শিল্প টিকিয়ে রাখা ইত্যাদি যুক্তি দেয়া হয়।[৪৮]

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিকাশ ঃ এই সেক্টরে ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের বিকাশ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছি । ১৯৯০ এর ২৭ ডিসেম্বর ঢাকা শহরের 'সারকা' নামক এক ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে । সরকারি বিধান অনুযায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় আগুন লেগেছিল। ফলে ২৫ জন নারী ও শিশুর মৃত্যু ঘটে এবং অনেকেই আহত হয়। এ খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে কয়েকদিনের মধ্যে গার্মেন্ট নারী শ্রমিকদের মধ্যে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ঢাকার রাস্তায় হাজার হাজার গার্মেন্ট শ্রমিক মিছিল করে সারকা অগ্নিকাণ্ডের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করে । এই স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোধ থেকেই সর্বপ্রথম ব্যাপকভিত্তিক ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটেছিল । মালিকদের ভীতি প্রদর্শনের কারণেই ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠতে পারেনি । শ্রমিকরা প্রতিবাদ করলেই তাদেরকে দৈহিকভাবে ভয় দেখানো ছাড়াও ইউনিয়ন গঠনের উদ্যোগ নিলে ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত সকলকেই চাকুরিচ্যুত করা হতো । কিন্তু এবার নানা বাধা দেয়া সত্ত্বেও নারী শ্রমিকরা সংগঠিত হবার সিদ্ধান্তে দৃঢ় রয়েছিল।[৪৯]

১৯৯১ সাল থেকেই ট্রেডইউনিয়নসমূহ সদস্য রিক্রুট করার ক্ষেত্রে নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করা ছাড়াও কারখানা পর্যায়ে কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি উদ্যোগ নেয়ার কথা বলা যায়, এটি সুনির্দিষ্ট ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সম্ভাব্য ব্যাপকতম সংহতি তৈরীর প্রচেষ্টা নেয়া হয় ১৯৯১ সালে । ১৯ মার্চ বেক্সিমকো কোম্পানির মালিক তাদের একটি কারখানা, কমট্রেড এপারেল বন্ধ ঘোষণা (লক আউট) করলে শ্রমিকরা কারখানা গেটের সামনে ১৩ দিন ধরে অবস্থান ধর্মঘট করা ছাড়াও জনগণের

Dhaka University Institutional Repository

সহানুভূতি অর্জনের জন্য অন্যান্য কর্মসূচীও গ্রহণ করেছিল । ফলে কারখানা পুনরায় চালু করা হয় এবং সে সব ইউনিয়ন কর্মীকে চাকুরিচ্যুত করা হয়েছিল, তাদেরকে চাকুরিতে পুনর্বহাল করা হয় । ১৯৯১ এর ২১ অক্টোবর মালিক দ্বিতীয় দফায় লক আউট ঘোষণা করলে শ্রমিকরা গার্মেন্ট মালিক সমিতির অফিস ঘেরাও করা ছাড়াও মশাল মিছিল বের করে । তাদের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়ন, 'ঐক্য পরিষদ' গার্মেন্ট শিল্পে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে । ঢাকা গার্মেন্ট ফ্যাক্টরিগুলির শতকরা ৮০ ভাগে ধর্মঘট সফল হয়েছিল।[৫০]

আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য কারখানা গেটে সশস্ত্র পুলিশ পাহারা বসানো ছাড়াও লক আউট অব্যাহত থাকে এবং আন্দোলনও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে শ্রমিকরা অন্যান্য শিল্পসেক্টরের শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে নুতন করে ধর্মঘটের চেষ্টা করেন । সে সময় বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল যে শর্ত আরোপ করেছিল তার ফলশ্রুতিতে পাটকল ও কাপড়কলের শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক ছাঁটাইয়ের ভীতি সঞ্চারিত হয়েছিল । তখন এই দুই সেক্টরের শ্রমিকরা রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানা ব্যক্তিগত খাতে হস্তান্তর ও প্রস্তাবিত ছাঁটাই নীতির প্রতিবাদে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ও রেলপথ-রাজপথ অবরোধের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল । এসময়, গার্মেন্ট সেক্টরের ট্রেডইউনিয়নগুলিও এসব আন্দোলনে যোগ দেয় । তারা জাতীয় ভিত্তিক সাধারণ দাবির সঙ্গে গার্মেন্ট সেক্টরের শ্রমিকদের নিজস্ব দাবিকে সংযুক্ত করে আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল ।

গার্মেন্ট সেক্টরেও মে দিবসকে ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করার দাবিতে ' জাতীয় গার্মেন্ট শ্রমিক ফেডারেশন' ঢাকার রাস্তায় মিছিল করে । অন্যান্য শিল্প সেক্টরের ন্যায় গার্মেন্ট সেক্টরেও বোনাস প্রদানের জন্য তারা প্রচারাভিযান চালায় । এই ফেডারেশন নারী শ্রমিকদের সংগ্রামকেও সমর্থন করেছিল। অবৈধভাবে কারখানা বন্ধ ঘোষণা, বকেয়া বেতন প্রদান না করা, অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য কোনো মজুরি না দেয়ার বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদি হয়ে উঠেছিলো। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফেডারেশন ফ্যাক্টরি মালিকদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করতে সক্ষম হয়। এতে শ্রমিকদের দাবি পুরোপুরি বা আংশিক মেনে নেয়া হয়। ফ্লিন্ট গার্মেন্টের ক্ষেত্রে দেখা যায়,পুলিশ লাগিয়েও কারখানা গেটে নারী শ্রমিকদের অবরোধ ভাঙানো যায়নি । তারপরই শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ও অতিরিক্ত কাজের জন্য প্রাপ্য মজুরি প্রদান করতে মালিককে বাধ্য করা হয়।[৫১]

এই সেক্টরে যেভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে এবং নির্মম শোষণ চলে আসছে, তাকে প্রতিরোধ করার মতো ক্ষমতা এখনও আন্দোলন অর্জন করতে পারেনি । তবে উল্লেখ করতে হয় যে নারী

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিকদের ইতিপূর্বে ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের কোনো অভিজ্ঞতাই ছিলনা, সেই নারী শ্রমিকদের মধ্যে এখন জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে ।

নরসিংদীর বিসিক শিল্প এলাকায় ডিসেম্বর ২০০০ইং একটি গার্মেন্ট কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে বহু শ্রমিক নিহত ও আহত হওয়ায় শ্রমিকরা উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ সৃষ্টি করে । শ্রমিকরা হতাহত হওয়ার পর শুধু চৌধুরী নিটওয়ার এর শ্রমিকরাই নয়, পার্শ্ববর্তী শিল্প কারখানার শ্রমিকরাও সেই কারখানা ঘেরাও দিয়ে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যাতে মালিকপক্ষ, শিল্পমন্ত্রী, সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটির ১৩ জন সদস্য, বিজিএমই সভাপতি ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ শেষ পর্যন্ত সেখানে উপস্থিত হতে বাধ্য হন এবং ক্ষতিপূরণসহ শ্রমিকদের কিছু দাবিদাওয়া তাদেরকে মেনে নিতে বাধ্য করা হয় ।

আনু মুহাম্মদ লিখেছেন, " ইপিজেডেও নিয়োগ, স্থায়ীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নেই । কাজের ঘন্টা ৮ থেকে ১৪ ঘন্টা । ছুটির দিনেও প্রয়োজন থাকলে কাজ করতে হয় । মজুরি নূন্যতম ৮০০ টাকা, সর্বোচ্চ প্রায় ২০০০ টাকা । ইপিজেড-এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, এটি বাইরের জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এখানের কোন অনিয়ম, নির্যাতন বাইরে আসেনা, পত্রিকাতেও ছাপা হয়না । সাভার ইপিজেড-এ দীর্ঘদিনের অনিয়মের ফলাফল হিসেবে একটি ছোটখাট বিদ্রোহ হয়েছিল। বিএনপি-আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপে সেই বিদ্রোহ ও বিদ্রোহী দমন করা হয়েছে । সংবাদপত্রে প্রকৃত ঘটনা আসেইনি । সর্বশেষ খবর সাভার ইপিজেড-এ মজুরি বিষয়ে দাবি উঠাতে গেলে ২৫ জন শ্রমিক ছাঁটাই হন এবং তা নিয়ে আন্দোলন করবার অপরাধে ৩ মে,২০০০ পুলিশের গুলিতে ২ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এই ইপিজেড-এ ট্রেডইউনিয়ন অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্প্রতিককালে সরকারের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের চাপ সৃষ্টির ফলে নানাবিধ বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে।[৫২]

২২ জুন,২০০২ইং তারিখে ডিইপিজেডের নিকট নিটওয়্যার গার্মেন্টস ও টেরিওয়্যার গার্মেন্টের বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা সকাল থেকে ফ্যাক্টরীর কাজ বন্ধ করে তাদের তিন মাসের বকেয়া পাওনা আদায়ের দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে আন্দোলন শুরু করে এবং ঐ সময় নবীনগরে কালিয়াকৈর সড়কে শ্রমিকদের অবস্থানের ফলে সকাল ৯টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে । পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । তাছাড়া ঐদিন রপ্তানিমুখী নিটওয়ার, টেরিটাওয়েল ও স্থানীয় বস্ত্রনির্ভর পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের বিভিন্ন দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলনের অংশ হিসেবে সকাল ১০টায় সংশ্লিষ্ট পোষাক শিল্প কারখানার মালিক শ্রমিকরা একঘন্টা প্রতীক অবস্থান ধর্মঘট পালন

Dhaka University Institutional Repository

করে । নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ায় প্রায় ৭৫ হাজার মালিক-শ্রমিক কর্মচারী বৃষ্টিতে ভিজে একত্রে অবস্থান ধর্মঘট পালন করে । এছাড়া সাভারের ডিইপিজেড, জয়দেবপুরের কালিয়াকৈর রোড, কোনাবাড়ি, মিরপুর, সাভার রোড, রামপুরা, তেজগাঁও টঙ্গী, রোকেয়া সরণী, শ্যামলী, নরসিংদী রোড ও কাঁচপুরে প্রতীক অবস্থান ধর্মঘট পালিত হয়েছে।[৫৩]

গাজীপুরে ২০ আগস্ট ২০০২ মঙ্গলবার বিকালে সদর উপজেলার ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক সংলগ্ন ছয়দানা হাজীর পুকুর এলাকায় অবস্থিত দি বটন কালেকশন লিঃ (গার্মেন্ট) এর শ্রমিকরা তিন মাসের বকেয়া বেতনের দাবীতে বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে মহাসড়কে অবরোধ সৃষ্টি করলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে ১ জন গার্মেন্টস শ্রমিক নিহত এবং ১০ জন পুলিশ ও কমপক্ষে ৪০ জন শ্রমিক আহত হয়। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা পুলিশের একটি ভ্যানসহ ৩০/৪০টি গাড়ী ভাংচুর করে এবং পুলিশের শর্টগান ছিনিয়ে নেয় । সংঘর্ষ চলাকালে সন্ধ্যা ৬ টা থেকে রাত পৌনে ৯ টা পর্যন্ত ঐ মহাসড়কে সকল প্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে । সংঘর্ষের সময় পার্শ্ববর্তী গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীসহ স্থানীয় লোকজন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের সাথে যোগ দিলে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারন করে । উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন ।

শ্রমিকদের প্রতিরোধ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরাসরি পুলিশ ও সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়ে থাকে। ২০০০ সালে ঢাকার শ্যামপুরে গার্মেন্ট ও অন্যান্য শ্রমিকদের সাথে সংঘর্ষ এবং শ্রমিকদের দ্বারা পুলিশের গাড়ীতে অগ্নিসংযোগের মত ঘটনা ঘটেছিল । শ্রমিকদের এসব আন্দোলন যে ক্রমশঃ রাজনৈতিক চরিত্র লাভ করবে এ থেকে তাই-ই বুঝা যায়। শ্রমিকদের প্রতিরোধ আন্দোলন যে শুধু ঢাকাতেই হচ্ছে তাই নয় বাঙলাদেশের অন্যান্য শহরের শ্রমিকরাও প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন। শ্রমিকদের প্রতিরোধ অন্যান্য শ্রেণীর লোকজনের চেয়ে জঙ্গী হয়ে থাকে । তবে এই প্রতিরোধ স্বতস্ফূর্ত হয়, কোন সুষ্ঠু সাংগঠনিক নেতৃত্ব ছাড়াই নানা প্রকার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

শ্রমিক অসন্তোষের আরও উদাহরণ ঃ

পাকিস্তান আমলের শ্রমিকদের অবস্থা ও আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু তুলে ধরা হল । তখন সাধারণ শ্রমিকদের উপর নির্যাতন চালান হত । সরকারী শিল্প কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের অত্যন্ত নিম্নমানের ও ভেজাল মিশ্রিত রেশন সরবরাহের কারণে এক পর্যায়ে শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয় । বাসস্থানের সংস্থান করা হতনা। বিনা কারণে হাজার হাজার শ্রমিককে ছাঁটাই করা হত । এ ধরনের নির্যাতনের ফলে

Dhaka University Institutional Repository

শ্রমিকরা প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ করে । সরকারের একান্ত অনুগত শ্রমিক সংগঠনগুলিও সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছিল । সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ শ্রমিকদের ক্ষোভ বৃদ্ধি পাবার ফলে শ্রমিক সংগঠনগুলির ভিতরেও তার প্রতিফলন ঘটতে থাকে। এভাবে ভাষা-আন্দোলনের পূর্বেই পূর্ববাংলার শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিশেষত রেল শ্রমিক-কর্মচারীদের মাঝেও একটি নতুন বিন্যাস ঘটে ।

ডাক ও তার কর্মচারীদের সংগঠন প্রাথমিকভাবে প্রতীক ধর্মঘট দিয়ে আন্দোলন শুরু করলেও পরে তা পূর্ণাঙ্গ ধর্মঘটে রূপ নেয় । সরকার তাদের ব্যাপারে কর্ণপাত না করলেও কর্মচারীরা হতাশ না হয়ে পূর্ণোদ্যমে ধর্মঘট চালিয়ে যেতে থাকে । তাদের আপোষহীন সংগ্রামের এক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনার মাধ্যমে শুধুমাত্র অপেক্ষাকৃত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া আংশিকভাবে মেনে নেয়া হয়। ভাষা আন্দোলনের প্রাক্কালে এই সংগঠনটি আপোষহীণ আন্দোলন চালিয়ে যাবার ঘোষণা দেয় । এ উদ্দেশ্যে কর্মচারীদের দুর্গতি ও সরকারের নীতিহীন কার্যকলাপের উল্লেখ করে একটি ইস্তেহারও প্রকাশ করা হয়।[৫৪]

চট্টগ্রাম বন্দরে হাজার হাজার ডক শ্রমিক চরম দুরবস্থার মধ্যে দিন যাপন করছিল । তাদের চাকুরী অস্থায়ী ছিল । নিয়মিত পোর্ট শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও যেদিন কাজ থাকতনা সেদিন খুব সামান্য পরিমাণে মজুরী দেয়া হত । তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা না থাকায় অধিকাংশ শ্রমিক পরিবারকে খোলা জায়গায় ঘুমাতে হত । ডকে এসে কাজ নিয়েছিল ছিন্নমূল পরিবারগুলি যারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধের কারণে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল । এখানে তাদের গোসল করার এমনকি খাবার পানিরও ব্যবস্থা ছিলনা। দুর্ঘটনায় আহত বা নিহত শ্রমিকদের কোন সাহায্য করা হ'তনা । প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিলনা । স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির কারণে শ্রমিদের অবস্থা আরও করুণরূপ ধারণ করেছিল । এরকম অবস্থায় চট্টগ্রাম পোর্ট নেরিনাস এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে শ্রমিকদেরকে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয় । তখন শ্রমিকরা খুব সঙ্গত দাবি নিয়ে আন্দোলন করেছিল ।

পূর্ববাংলায় চা-শ্রমিকের সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক । চা-বাগানের মালিক ও নেতা কর্মচারীরা নিষ্ঠুর নির্যাতনের মাধ্যমে চা শ্রমিকদের দিয়ে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করাতে বাধ্য করত । একেকটি পরিবারের নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর সবাই মিলে কাজ করেও বেঁচে থাকার নূন্যতম নিশ্চয়তাও পেতনা । এক সময় চা-শ্রমিকদের রেশনের মাধ্যমে চাল পরিবেশন ব্যবস্থা বাতিল করে দেয়ায় শ্রমিকরা আরো দুর্বিষহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। সবকিছু মিলিয়ে চা শ্রমিকরা প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে । ভাষা-আন্দোলনের প্রাক্কালে তারা

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপক আন্দোলনের প্রস্তুতি নেয়। ফলে এক পর্যায়ে তাদের দাবি আংশিকভাবে মেনে নেয়া হলেও পাকিস্তান সরকারের প্রতি তাদের বিক্ষোভ ও অসন্তোষ কমেনি ।

বার্মা অয়েল কোম্পানি (বিওসি)-তেও শ্রমিকদের ওপর শোষণ নির্যাতন চলত। তাদের কোন অধিকারের প্রতিই গুরুত্ব দেয়া হ'তনা। কোম্পানীর কর্মচারীরা দুর্নীতিগ্রস্থ ছিল। এসবের বিরুদ্ধে উক্ত ইউনিয়ন সংগঠিত হয়ে দুই সপ্তাহের মতো ধর্মঘট চালিয়ে যাবার পর কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের মূল দাবিগুলিই স্বীকার করে নেয়। পূর্ববাংলার বিভিন্ন কলকারখানায় শ্রমিকদের আন্দোলনগুলির মধ্যে সবচেয়ে সাফল্যজনক ছিল বিওসি শ্রমিকদের এই ধর্মঘট।[৫৫]

আর একটি সফল আন্দোলন করেছিল 'বাটা' জুতো কারখানার শ্রমিকরা। ১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় পশ্চিমবাংলা থেকে ৩৫০০ জন বাটা শ্রমিক পরিবার পরিজনসহ পূর্ববাংলায় আসার পর তাদের জন্য বাসস্থান কিংবা কর্মসংস্থানের কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি । বাটা কোম্পানি ও সরকারের কাছে বার বার আবেদন-নিবেদন করেও কোন লাভ হয়নি । তারপর এসব উদ্বাস্তু বাটা শ্রমিকরা বাটার জুতো বয়কটের আন্দোলনের নামে এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল । যুবলীগ এ আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল । বাটা শ্রমিকগণ কালো ব্যাজ ধারণ করে বাটা জুতোর দোকানগুলির সামনে দাঁড়িয়ে থাকত এবং ক্রেতাদের কাছে তাদের দুরবস্থার কথা জানাত । তাদের উদ্দেশ্য ছিল আর একটি বাটা কোম্পানি না করা পর্যন্ত এ আন্দোলনকে অব্যাহত রাখা । এই আন্দোলনের ফলে বাটার জুতা বিক্রয়ের পরিমাণ সাংঘাতিকভাবে কমে গিয়েছিল এবং কোথাও কোথাও বিক্রি একেবারে বন্ধই হয়ে যায়। আর একটি বাটার কারখানা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থা চলছিল।[৫৬]

স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৮৪ সালের মে মাসে প্রথম বড়োধরনের আন্দোলন গড়ে উঠে । সে সময় তৎকালীন শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) ২২ ও ২৩ মে ৪৮ ঘন্টার এক ধর্মঘটের কর্মসূচী ঘোষণা করে। কিন্তু তার আগেই ২১ মে স্কপ, সরকার ও মালিকপক্ষ বৈঠকে বসে চুক্তির মাধ্যমে শ্রমিকদের দাবীগুলি আংশিকভাবে মেনে নেয়। মজুরি সামান্য বৃদ্ধি ছাড়া এ দাবীগুলোর মধ্যে অন্য বিশেষ কিছুই ছিলনা। ১৯৮৬ সালে স্কপ দুইভাগে বিভক্ত হলেও পরবর্তীতে আবার ঐক্যবদ্ধ হয় এবং শ্রমিকদের মজুরীসহ অন্যান্য দাবী-দাওয়া নিয়ে ৪৮ ঘন্টা, ৭২ ঘন্টা ইত্যাদি ধর্মঘটের কর্মসূচী বার বার ঘোষণা করে । কিন্তু প্রত্যেকবারই ধর্মঘট শুরুর পূর্ব মুহূর্তে মালিকপক্ষ ও সরকারের সাথে বসে কিছু মৌখিক আশ্বাস বা লিখিত চুক্তির ভিত্তিতে, ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয়।[৫৭]

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে বার বার ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়ে শ্রমিকদের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকার ফলে স্কপের বিরুদ্ধে স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকদের কিছু বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং স্কপের প্রতি শ্রমিকদের আস্থা অনেক কমে আসে । ১৯৯৩ সালের মার্চ মাসে স্কপ এবং পাট, চিনি, বস্ত্র শ্রমিক ফেডারেশন ৪৮ ঘন্টার ধর্মঘটের কর্মসূচী নেয় এবং মালিকপক্ষ ও সরকারের কাছে তাদের প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য দাবী জানায় । তখন স্কপ ও অন্যান্য শ্রমিক ফেডারেশনগুলির সাথে মালিক ও সরকার পক্ষের আলোচনা ব্যর্থ হয় এবং ১৫ ও ১৬ মার্চ ৪৮ ঘন্টার এক লাগাতার ধর্মঘট পালিত হয়। শ্রমিকদের তখন দাবী ছিল জাতীয় ভিত্তিতে তাঁদের নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ ও নিশ্চিত করা, শিল্প কারখানায় তাঁদের কাজের নিশ্চয়তা বিধান অর্থাৎ তাঁরা যাতে ছাঁটাই হতে না পারেন তার ব্যবস্থা করা । ১১ থেকে ১৩ই মে বাঙালাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ঐক্যপরিষদ এবং পাট, বস্ত্র, চিনি ও পরিবহণ শ্রমিক ফেডারেশনের আহ্বানে ৭২ ঘন্টার একটানা ধর্মঘট পালিত হয় । শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ ধর্মঘটের সাফল্যকে একটা অগ্রগতি হিসেবে ধরা যায় । কারণ এ ধর্মঘটকে সাফল্যমন্ডিত করতে গিয়ে অনেক বাধাবিঘ্ন এবং টানাপোড়ন পেরিয়ে আসতে হয়।[৫৮]

শ্রমিক আন্দোলনের কালপঞ্জি ঃ

এখানে ১৯২০ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল ।

জল পরিবহণ শ্রমিকদের ধর্মঘট (১৯২০) : বাংলাদেশের সীমানায় বরিশালের জলপরিবহণ শ্রমিকরা প্রথম দুটি ধর্মঘট করে। মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে তারা ধর্মঘট করেছিল ।

চা-বাগান শ্রমিকদের আন্দোলন (১৯২১) : চা বাগান শ্রমিকদের আন্দোলনের সাথে তৎকালীন আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ও বেঙ্গল স্টীম নেভিগেশনের শ্রমিকরা সংহতি প্রকাশ করে ধর্মঘট করেছিল এবং ধর্মঘটের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন জাতীয়তাবাদী নেতারাও ।

সূতা ও বস্ত্রকল শ্রমিকদের ধর্মঘটসমূহ (১৯৩৯-৪৬) : ১৯৩৯ সালে লক্ষ্মীণারায়ণ ও ঢাকেশ্বরী কটনমিলে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে শ্রমিকরা প্রায় মাসব্যাপী সফল ধর্মঘট পরিচালনা করে এবং আগস্ট, ১৯৪২ সালে নাগ্‌গী ভাতা ও অন্যান্য দাবির প্রেক্ষিতে ঢাকেশ্বরী ১ নম্বর মিলে ধর্মঘট পালন করা হয় । এতে মালিকরা শ্রমিকদের দাবিসমূহ মেনে নেয় । নারায়ণগঞ্জের সূতাকল শ্রমিকরা ১৯৪৩ সালে আন্দোলন করে । নারায়ণগঞ্জের সূতাকল শ্রমিকরা ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে প্রায় তিন মাস ধরে অন্যায়ভাবে ছাঁটাই ও ১৭-দফা দাবির ভিত্তিতে বীরত্বপূর্ণ আন্দোলন পরিচালনা করে ।

Dhaka University Institutional Repository

সিমেন্ট শ্রমিক আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৫১) : ছাতকে অবস্থিত আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কোম্পানির শ্রমিকরা এই সময়কালে বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন পরিচালনা করেছিল ।

ডক শ্রমিক আন্দোলন (১৯৪৯-৫১) : চট্টগ্রামের ডক শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবী-দাওয়া নিয়ে এসময়ে আন্দোলন করেছিল ।

ডাক ও তার শ্রমিক আন্দোলন (১৯৪৯-৫১) : বেতন বৃদ্ধি ও অন্যান্য দাবি-দাওয়া নিয়ে শ্রমিকরা আন্দোলন করে ।

পাদুকা শ্রমিক আন্দোলন (১৯৫০) : বাটা স্যু কোম্পানির শ্রমিকরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে এই সময় আন্দোলন পরিচালনা করেছিল ।

তৈল শ্রমিক আন্দোলন (১৯৫১) : এ সময় চট্টগ্রামের বিএসও তেল কোম্পানির শ্রমিকরা বেতন বৃদ্ধিসহ অন্যান্য দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন সংঘটিত করেছিল ।

শ্রমিকদের অন্যান্য আন্দোলনসমূহ (১৯৪৭-৬৯) : ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত শ্রমিকরা ২৬টি ধর্মঘট পালন করে। এতে ১২,০৯১ জন শ্রমিক অংশগ্রহণ করে এবং কারখানা ধর্মঘটের কারণে বন্ধ থাকে । ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলনের শহীদদের উদ্দেশ্যে গায়েবানা জানাজায় ২২ ফেব্রুয়ারী শ্রমিকরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিল এবং ঐদিন রেল শ্রমিকরাও ধর্মঘট পালন করে । ১৯৪৮-১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ২২৫টি শ্রমিক ধর্মঘট হয়। এতে ১ লাখ ৩২ হাজার ৮৪৩ জন শ্রমিক অংশগ্রহণ করে। ১৯৫৪-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ২৪২টি ধর্মঘট হয় এবং ২ লাখ ৭৯ হাজার ৩৭২ জন শ্রমিক অংশ নেয় । ১৯৫৮ সালে ২৫ হাজার বিদ্যুৎ শ্রমিক ধর্মঘট করেছিল । ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ পর্যন্ত ২৯টি শ্রমিক ধর্মঘট হয় এবং ৩৩ হাজার ৩৮ জন শ্রমিক অংশগ্রহণ করে । ১৯৬২-৬৩ সালে সুতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘট উল্লেখযোগ্য । এই সময় ২০ হাজার সুতা শ্রমিক ৪৫ দিন ধর্মঘট পালন করেছিল । ১৯৬৪ সালে জুলাই মাসে ৩০ হাজার এবং পরে ১ লাখ পাটকল শ্রমিক ধর্মঘট পালন করে । ১৯৬৪ সালে সর্বমোট ৭২টি ধর্মঘট হয় এবং ১ লাখ ৫৮ হাজার ৬১৪ জন শ্রমিক অংশ গ্রহণ করে । ১৯৬২ -১৯৬৯ সাল পর্যন্ত ৪০৫টি ধর্মঘট হয় এবং এতে ৬ লাখ ৫৫ হাজার ৪৬০ জন শ্রমিক অংশ নেয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে, ১৯৫৮-র সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানএবং ১৯৭১-এ স্বাধীনতা যুদ্ধে শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিল ।

Dhaka University Institutional Repository

আদমজী জুটমিল : বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ পাটকল 'আদমজী জুটমিল' বন্ধ হয়ে গেছে তাই সে প্রসঙ্গে কিছু তুলে ধরা হল।

তৎকালীন পাকিস্তানের ২২ পরিবারের অন্যতম গুল মোহাম্মদ আদমজীর উদ্যোগে ১৯৫১ সালে শীতলক্ষ্যার পাড়ে তিনশত একর জমির ওপর তিনি আদমজী মিলটি স্থাপন করেন । প্রাথমিক পুঁজি ছিল ৫ কোটি টাকা । এই মিলে কাজ হয় বহু শত শ্রমিক কর্মচারীর এবং তারা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয় । শেষ পর্যন্ত স্থায়ী -অস্থায়ী মিলিয়ে আদমজীতে কর্মসংস্থান হয়েছিল প্রায় ২৫ হাজার মানুষের । এদের মধ্যে ১৭ হাজার স্থায়ী এবং অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ৭ হাজার । তাছাড়া কর্মকর্তা কর্মচারী মিলিয়ে প্রায় ২০০০ লোক এখানে কর্মরত ছিলেন।[৫৯]

আদমজীর ৪টি উৎপাদন ইউনিটসহ সম্পদের পরিমাণ ছিল ৮৫৬ কোটি টাকা, লোকসানসহ মোট পুঞ্জীভূত দেনার পরিমান প্রায় ১৩শত কোটি টাকা ।[৬০] ১৯৭৪ সালে আদমজী জুটমিল জাতীয়করণ করে কর্পোরেশনের অধীনে ন্যাস্ত করা হয় । জাতীয়করণের পর গত ৩১ বছরে মিলটি প্রায় ১১শ ৫ কোটি টাকা লোকসান দেয় । সরকারি সূত্র অনুযায়ী এত লোকসান ও লুটপাটের পরও বর্তমানে মিলের সম্পদের পরিমাণ ১শ কোটি টাকা।[৬১]

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আদমজী মিলটিকে রাষ্ট্রায়ত্তখাতে নিয়ে আসা হয়। তখন থেকেই দুর্নীতি এবং অব্যবস্থাপনা দেখা দেয় । জানা যায় পাট ক্রয় থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সীমাহীন দুর্নীতি, অপচয় ও অব্যবস্থাপনা, আদমজীকে ক্রমান্বয়ে চরম বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয় । এক শ্রেণীর শ্রমিকনেতা এবং তথাকথিত শ্রমিক বিনা কাজে বছরের পর বছর মিল থেকে মজুরী নিয়েছে। অভিযোগ আছে যে, কমপক্ষে ২ হাজার শ্রমিক নামধারী লোক তথাকথিত স্পেশাল হাজিরা দিয়ে বিনা কাজে বেতন নিয়েছে । তারাই আদমজীর শ্রমিকের নামে সন্ত্রাস করেছে। বিঘ্নিত করেছে কাজের পরিবেশ। আদমজীকে পরিবেষ্টন করে একশ্রেণীর বিবেকহীন মানুষ যে কী অপচয় করেছে তা আদমজী নগরের সাধারণ মানুষেরও অজানা ছিলনা।[৬২]

হাসান মামুন লিখেছেন, গত প্রায় একদশক ধরে অদ্ভুতভাবে বেঁচেছিল আদমজী। ক্রনিক সংকটে জর্জরিত প্রতিষ্ঠানে যেটা হয় নৈরাজ্য ও সন্ত্রাস, তাও তীব্র হয়ে উঠেছিল। একটা সময়ে আদমজী হয়ে উঠলো ঢাকা শহরে জনসভা, হরতাল, মারামারি বা জমি দখল ইত্যাদিতে লোক সরবরাহের উৎস ।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা পূর্বকালে ব্যক্তি মালিকানায় থাকার সময় এর যতো গৌরবই থাক সরকারী মালিকানায় আসার পর কিন্তু এর বদনামই বেড়েছে । লোকসান ও বদনাম কেনো বাড়ছে সে ব্যাপারে কোনো উৎকণ্ঠাও দেখা যায়নি কোন মহলে । আদমজী বন্ধের সময় এটি ছিল উদ্ভ্রান্ত জনপদের কেন্দ্র ।[৬৩]

গত বছর বেসরকারীকরণ কমিশন বেসরকারীকরণ নীতিমালা ২০০১ এর যে খসড়া তৈরী করেছিল সেখান থেকে জানা যায় স্বাধীনতার পর হতে সরকারী শিল্প ও বাণিজ্যখাতে ৬০ হাজার কোটি টাকা লোকসান দিতে হয়েছে । শিল্প বাণিজ্যের সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি দিনের পর দিন দুর্নীতি, অপচয় ও লোকসানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় ।[৬৪] তাই আদমজী মিলটিকে ২০০২ সালে বন্ধ করে দেয়া হয় ।

১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ জুটমিল আদমজী বন্ধ করে দেয়ার কারণ হচ্ছে এর অব্যাহত লোকসান। জাতীয় সংসদে পাটমন্ত্রী জানান স্বাধীনতার পর হতে ঐ সময় পর্যন্ত মিলটি লোকসান দিয়েছে ১ হাজার ১০৬ কোটি টাকা । সূত্রানুযায়ী, প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে মিলটি লাভজনক হিসেবে বিবেচিত হত । স্বাধীনতার পর হতে ৩১ বৎসরে আদমজী জুটমিল ৪ বার লাভের মুখ দেখেছে । ১৯৭২-৭৩, ১৯৭৪-৭৫, ১৯৭৪-৭৫, ১৯৭৮-৭৯ এবং ১৯৮৫-৮৬ অর্থবছরে সর্বমোট লাভের পরিমাণ ছিল ৬৭ কোটি টাকা। ১৯৮৫-৮৬ অর্থবৎসরের পর হতে আদমজী জুটমিল আর কখনই লাভ করতে পারেনি ।[৬৫]

এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকার আদমজী জুটমিল বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে । ৩০ জুন ২০০২ইং সন্ধ্যায় আদমজী জুটমিলের মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) স্বাক্ষরিত একটি নোটিশ টাঙ্গানো হয় । নোটিসে বলা হয়, "এতদ্বারা অত্র মিলের শ্রমিক কর্মচারীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মিলে ক্রমাগত শ্রমিক অসন্তোষ, বিবাদমান শ্রমিকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় পুঞ্জিভূত লোকসানের পরিপ্রেক্ষিতে চরম আর্থিক সংকটের কারণে মিলটি চালু রাখা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত হয়ে পড়েছে । দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে পাট মন্ত্রণালয়ের ২৯/৬/২০০২ তারিখের স্মারক ..... এবং বিজেএমসি ২৯/৬/২০০২ তারিখের কস/আদমজী ..... পত্রের নির্দেশানুযায়ী ১৯৬৫ সালের নিয়োগ স্থায়ী আদেশের ৬(১) ধারা মোতাবেক অদ্য ৩০ জুন ২০০২ কর্মদিবস শেষে মিলের কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হল । উক্ত আইনের ১২ ধারা মতে আদমজী জুটমিলের সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ও কর্মচারীদের ১লা জুলাই ২০০২ তারিখ হতে চাকুরী থেকে ছাঁটাই করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ও কর্মচারীগণ আইন মোতাবেক পাওনা ছাড়াও সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের আওতায় অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধাও পাবেন' ।[৬৬]

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যে, শ্রমিকদেরকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তা রাশেদখান মেননের নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে অনুধাবন করা যায় । আদমজি বন্ধের নোটিসে বর্ণিত ক্রমাগত শ্রমিক অসন্তোষ এবং বিবাদমান শ্রমিকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ব্যাপারে তিনি বলেন -

"আদমজী জুট মিলের শ্রমিকদের নিয়ে এই সংঘর্ষের খেলা নতুন নয় । পাকিস্তান আমলে চক্রান্তকারী কেন্দ্রীয় সরকার আদমজীতে বিহারী-বাঙালী যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে । আয়ুব-মোনেম শাসনে আদমজীকে দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে । আর বাংলাদেশ আমলের প্রথম থেকেই আদমজীসহ সকল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক শ্রমিক নেতৃত্বকে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় হটিয়ে দিয়ে ক্রমাগত সেখানে শাসকদলের দখলদারিত্ব কায়েম করা হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শ্রমিক লীগের লাল বাহিনীর দৌরাত্মের কাহিনী কার না জানা ? আর জিয়াউর রহমান তার সময়টা শাসনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে এদেশে চালু করেছিলেন সিবিএ হাইজ্যাক এর ঐতিহ্য। পরবর্তী শাসককূল এরশাদ, খালেদা, হাসিনা সবাই একই পথ অনুসরণ করেছেন। শাসকদলের সাথে সাথে আদমজীর সিবিএর দল বদল হয়েছে । আর এই দখলদারিত্ব ও দলবদলের পালায় নামধারী মাস্তানদের হামলা- সংঘর্ষে নিহত হয়েছে সাধারণ শ্রমিক। সিবিএর এই দল বদলের সর্বশেষ ঘটনা ছিল আদমজীর নির্বাচিত সিবিএ-র শ্রমিকদলে যোগদান। ..... মিল বন্ধের আগে শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষে সাধারণ শ্রমিকদের প্রাণহানি ঘটলেও বিডিআর পুলিশের কোন কার্যকারিতা দেখা যায়নি । কিন্তু মিল বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগেই আদমজীতে বিডিআর-পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তারা বাইরের মানুষ দূরে থাক, শ্রমিক-কর্মচারীদের মিল এলাকায় ঢুকতে দেয়নি । আর শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা আদমজী জুটমিলসহ সমস্ত পাটশিল্পে ঘটেছে, সেটা হলো শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন-ভাতা পাওয়া না পাওয়া নিয়ে । প্রতি ঈদে কোরবাণীতে শ্রমিকদের আন্দোলন ছাড়া পাওনা মিলতনা। আদমজী জুটমিল যখন বন্ধ করে দেয়া হয় তখনও শ্রমিকদের চার সপ্তাহের মজুরী, বাড়ী ভাড়া ও অন্যান্য ভাতা বাকী ছিল । শ্রমিকরা পাওনা টাকা আর পাবেনা অনেকখানি এই ভয়েই আন্দোলনের পথে নামেনি । কারণ সরকার এ যাবৎ যে তেত্রিশটি শিল্প ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দিয়েছে তাদের শ্রমিকরা অদ্যাবধি পাওনা বুঝে পায়নি । ..... শ্রমিকরা তাদের দেনা পাওনা নিয়ে যদি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে থাকে তবে দোষ কার।[৬৭]

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিক্রিয়া :

আদমজী বন্ধ সম্পর্কে পাটমন্ত্রী বলেন, " শ্রমিকদের কল্যাণ ও স্বার্থের কথা বিবেচনা করেই সরকার এতদিন পাটকল বন্ধ করেনি । তবে যেভাবে মিলটি প্রতিনিয়ত লোকসান দিয়ে যাচ্ছে তা দেশের অর্থনীতির জন্য এক বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে । তাই সরকার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে" ।[৬৮] আদমজী বন্ধ করা হবে এ ঘোষণার পর শ্রমিকদের মধ্যে থমথমে অবস্থা বিরাজ করলেও কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি ।

আদমজী বন্ধ হবে এ সিদ্ধান্তটি ঘোষিত হবার পর কিছু অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করলেও পরিস্থিতি তেমন প্রকট আকার ধারণ করেনি । আদমজী জুটমিল বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে জাতীয় শ্রমিকজোটের উদ্যোগে ১৮ জুন ২০০২ নগরীর মুক্তাঙ্গনে মানববন্ধন, সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এতে ঘোষণা করা হয় আদমজী জুট মিল বন্ধের প্রতিবাদে ৩০শে জুন,২০০২ইং প্রতিবাদ দিবস পালন করা হবে । ২৮ শে জুন বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল বাসদের উদ্যোগে এক বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করা হয় । ২৯ জুন ২০০২ রবিবার আদমজীনগরী ছিল তুলনামূলকভাবে অশান্ত। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শ্রমিকরা মিছিল মিটিং করেছে। বিশাল শ্রমিক সমাবেশে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগানসহ অর্থমন্ত্রী ও পাটমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেন। বদলি শ্রমিকদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল । মিলের বিভিন্ন স্থানে কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। কয়েকজন সাংবাদিক সমাবেশ স্থলে উপস্থিত হলে ক্ষিপ্ত শ্রমিকরা তাদের উপর হামলা চালান । বিবিসির সাংবাদিকসহ কয়েকজন সাংবাদিককে তারা লাঞ্ছিত করেন । পুলিশ বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের হাত থেকে তাদেরকে উদ্ধার করে । অপরদিকে ১১ দলও আদমজী জুট মিল বন্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সমাবেশ করে।[৬৯]

মিল বন্ধের সিদ্ধান্তে আদমজীর শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে তাৎক্ষনিক কোন প্রতিক্রিয়াও হয়নি । কারণ প্রায় এক দশক ধরে শ্রমিকরা শুনে আসছে যে লোকসান জর্জরিত ও নানারকম পাওনা পরিশোধে অক্ষম মিলটি বন্ধ হয়েই যাবে । সব পাওয়ার পার্টিই বলে আসছিল যে, জনগণের কর থেকে কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি জুগিয়ে এর শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন দিতে হচ্ছে । সুতরাং সুবিধামত সময়ে এটা বন্ধ করে দেয়া হবে । তাছাড়া আদমজীতে যে ট্রেডইউনিয়নিজম ছিল, তার শ্রমিক স্বার্থবিরোধী চরিত্রও তাদের জানা ছিল । শ্রমিক কর্মচারীরা এটাও জানতো দাতাগোষ্ঠী এবং দেশে বলিষ্ট হয়ে ব্যবসায়ীরাও চাচ্ছে যে যত দ্রুত সম্ভব লোকসানী প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেয়া হোক বা বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হোক আর এসব

Dhaka University Institutional Repository

পরিস্থিতিই বোধ হয় আদমজীর শ্রমিকদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তুলেছিল; তাই 'ভায়োলেন্ট' কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি । তাছাড়া শ্রমিকদের পাওনা সব সময়মত পরিশোধ করা হবে সরকার থেকে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল । একসাথে টাকা পেলে সবধরনের শ্রমিক কর্মচারীরাই সেটা কাজে লাগাতে পারবে এসব কারণেও বড় ধরনের কোন শ্রমিক অসন্তোষ হয়নি ।

তবে ১৯৯২ ও ১৯৯৪ সালের দিকে আদমজী জুটমিল বন্ধ করে দিতে চাইলে প্রচণ্ড শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল । ১৯৯২ সালে পাটকল বন্ধ করে দেয়ার ব্যাপারে দাতাগোষ্ঠীর সাথে বর্তমান অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের বৈঠক হয়েছিল। ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে আদমজী পাটকল বন্ধ করে দেয়ার ব্যাপারে নিউয়র্কে চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন তৎকালীন বি.এন.পি. সরকার। সেখানেই দাতাগোষ্ঠী স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিল আদমজী বন্ধ করে দিতে হবে কিন্তু পরবর্তীকালে শ্রমিকদের প্রচণ্ড প্রতিরোধ, বিক্ষোভ এবং রক্তাক্ত হাঙ্গামার পরিপ্রেক্ষিতে এতদিন পর্যন্ত আদমজী পাটকল বন্ধ করা যায়নি।

প্রভাব : আদমজী বন্ধ করে দেওয়ায় যে মানবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা বেদনাদায়ক নিঃসন্দেহে। এই পাটশিল্পের সাথে দেশের লাখ লাখ পাটচাষী জড়িত এবং জড়িত দেশের লাখ লাখ পাটশ্রমিক। আদমজী বন্ধ হওয়ায় কেবল আদমজীর শ্রমিক-কর্মচারী চাকরী হারায়নি, আদমজীর সাথে অস্তাচলে গেল পাটচাষীর ভাগ্যও। পনের লাখ মণ পাটের সরবরাহ বন্ধ করার প্রতিক্রিয়া পাটের বাজারে কি প্রভাব পড়তে পারে তার প্রমাণ মেলে পাটের মণ প্রতি মূল্য ৫০০ টাকা থেকে ২০০ টাকায় নেমে যাওয়ায় । আদমজীর সাথে পাঁচটি উপ-জেলার যে অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল, গড়ে উঠেছিল হাট-বাজার, দোকানপাট, স্কুল কলেজ সবকিছুই বন্ধ হয়ে যাবে।[৭০]

আদমজি বন্ধ করে দেয়ার ফলে ২০ হাজার শ্রমিক বেকার হবে। ৭ হাজার শ্রমিক কেউ পয়সা পাবেনা। এলাকার শত শত দোকানদার ও বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়বে । তাদের আয়-রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। আদমজীতে স্কুল কলেজ পড়ুয়া পাঁচ হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন অনিশ্চিত হবার সম্ভাবনা । এই এলাকার লাখ লাখ মানুষ নিস্ব হয়ে যাবে।[৭১] মুহাম্মদ আয়েনউদ্দীন লিখেছেন, পাট ব্যবসায়ী , ঠিকাদার, দোকান-পাটের মালিক ও নৌকা মাঝিসহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত দেড় লাখ পরিবারের প্রায় দশ লাখ লোকের জীবিকার পথ বন্ধ হবে । প্রকট বেকার সমস্যার সাথে যুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হল আরো ত্রিশ হাজার বেকার শ্রমিক। এর ফলে ত্রিশ হাজার পরিবারের প্রায় দুই লাখ লোকের জীবিকা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গেল ।[৭২]

এসবের প্রভাবে সামাজিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়াই স্বাভাবিক। উপরের আলোচনা থেকে অনুধাবন করা যায় আদমজী জাতীয় রাজনীতিকে অস্থিতিশীল করে তুলেছিল এবং এর প্রভাবে সামাজিক অস্থিতিশীলতাও দেখা দেয়।

বাংলাদেশে শিল্পের ক্রমবিকাশের সামগ্রিক পর্যালোচনা (প্রাক ১৯৪৭ইং) :

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে তৎকালীন বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্প তেমন কিছুই ছিলনা। শুধুমাত্র মাঝারি ধরনের কয়েকটি বস্ত্রকল, চিনিকল এবং একটি ছোট সিমেন্টের কারখানা ছিল। ১৯৪৭ সালের পূর্বে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত এবং ভারত থেকে আমদানিকৃত তুলার উপর ভিত্তি করে ছোট ও মাঝারি ৮টি বস্ত্র সূতাকল স্থাপিত হয়। বাংলাদেশে প্রচুর ইক্ষু চাষ হত তাই ইক্ষু ব্যবহার করে ১৯৪৭ সালের আগেই ৫টি চিনিকল স্থাপিত হয়েছিল । সিলেটের চুনা পাথরের উপর ভিত্তি করে ১৯৪১ সালে সিলেটের ছাতকে একটি সিমেন্ট কারখানা স্থাপিত হয় । ছাতক সিমেন্ট কারখানাটি বৎসরে ৯০,০০০ টন সিমেন্ট উৎপাদন করতে পারতো ।

বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বাধিক পাট উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন বাংলাদেশে ১৯৪৭ সাল নাগাদ একটিও পাটকল স্থাপিত হয়নি । উৎপাদিত সমস্ত পাটই কাঁচামাল হিসেবে রপ্তানী হতো । বাংলাদেশকে কাঁচাপাট রপ্তানি করতে হতো তদানীন্তন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভিত্তিক বাণিজ্যনীতির ফলেই ।

তখন যে কয়টি কলকারখানা ছিল তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উৎপাদন দিয়ে বস্ত্র চাহিদার সিংহভাগ মিটতো। অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল কুটিরশিল্প । বলা যায় তদানীন্তন বাংলাদেশের শিল্পভিত্তি ছিল দুর্বল । বিশ্বব্যাংকের এক রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের মাত্র ৪ ভাগ শিল্পখাত থেকে আসতো ।

১৯৪৭-১৯৭১ সাল ঃ

পাকিস্তান সরকার সাহায্যপুষ্ট ই.পি.আই. ডি.সি. ১৯৫১-১৯৭১ সালের মধ্যে ৬০টিরও অধিক পাটকল, ১৫টির অধিক চিনিকল, ৪০টি বস্ত্রকল, ২টি কাগজের মিল, ১টি নিউজ প্রিন্ট মিল, ২টি সারকারখানা, ২টি ওষুধের কারখানা স্থাপন করে । কিন্তু ই.পি. আই.ডি.সি. (ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল

Dhaka University Institutional Repository

ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন) বাঙালি উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে পৌছতে পারেনি । বাংলাদেশে অবস্থিত অবাঙালি পাকিস্তানীগণ রাজনৈতিক কারণে ই.পি.আই. ডি. সি-র উদ্যোগের সুফল ভোগ করেছিলেন । তাই দেখা যায় পাটকলগুলোর বেশীর ভাগই (যেমন, আদমজী জুট মিলস, আহমদ বাওয়ানী জুট মিলস, করিম জুট মিলস, ক্রিসেন্ট জুট মিলস, কর্ণফুলি কাগজ মিল, ভালিকা উলেন মিল ইত্যাদি) অবাঙালী পাকিস্তানীদের হস্তগত হয়। ১৯৪৭ সালের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে কয়টি শিল্প গড়ে উঠেছিল তার অধিকাংশ অবাঙালি মালিকানায় অথবা ব্যবস্থাপনায় গড়ে উঠেছিল ।

সরকারি শিল্পের বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার ১৯৫৫-৭০ সাল পর্যন্ত গড়ে ৬৬% ছিল । আলাদা করে দেখলে বৃহৎশিল্পগুলোর প্রবৃদ্ধির হার ছিল গড়ে ১৪.৫% এবং ক্ষুদ্র শিল্পের প্রবৃদ্ধির হার (বাৎসরিক) ছিলো মাত্র ২.৫% । ১৯৫০-১৯৭০ সালের মধ্যে যে শিল্পায়ন ঘটেছিল তার ফলে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে শিল্পের অবদান বৃদ্ধি পেয়ে ১০% দাঁড়ায় । ১৯৪৭ সালে এ অবদান ছিল মাত্র ৪%।

পৃথিবীর শতকরা ৭৫ ভাগ পাট উৎপাদনকারি জমির মালিক হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫১ সালের আগে কোন পাটকল স্থাপিত হয়নি।[৭৩] দেশ বিভাগের সময় পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প কারখানাগুলির প্রধান অংশটি ছিল সূতা ও বস্ত্র উৎপাদন কারখানা । ১৯৪৭-৪৮ অর্থবছরে এসব কারখানাতে মোট ৪৯ লাখ ২৯ হাজার ৭৭ পাউন্ড সূতা এবং ১৬ লাখ ৮৯ হাজার ৭৭২ গজ লংক্লথ, মার্কিন ও সার্টিং জাতীয় কাপড় উৎপাদিত হয়।[৭৪]

দেশ বিভাগের সময় চিনি শিল্পের উৎপাদনও অত্যন্ত নিম্নস্তরে ছিল । ১৯৪৭-৪৮ সালে মাত্র ৬ লাখ ২৪ হাজার ১৪৯ মন চিনি উৎপাদিত হত।[৭৫] এ অর্থবছরে একমাত্র সিমেন্ট কারখানায় মাত্র ৩২ হাজার ৮০৭ টন সিমেন্ট উৎপাদিত হয়[৭৬] এবং ম্যাচ উৎপাদনের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫৬ হাজার ৭৫০ গ্রোস।[৭৭]

সেসময় শিল্প প্রতিষ্ঠান কম ছিল । যেগুলো দ্রুত বিকশিত হচ্ছিল সেগুলোও দেশ বিভাগের পর হুমকীর সম্মুখীন হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৯৪৭-৪৮ অর্থবছরে পণ্যজাত পানীয় এর উৎপাদন ছিল ৬ লাখ ৫২ হাজার ৪০৮ গ্যালন কিন্তু পরবর্তীতে এর উৎপাদন সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পেয়ে ১৯৫০-৫১ অর্থবছরে এসে মাত্র ৭৯ হাজার ৬৮৬ গ্যালনে দাঁড়ায়।[৭৮] অর্থাৎ ১৯৪৭-৪৮ অর্থবছরে উৎপাদনের মাত্র ১২%। শুধু এ সব পণ্যই নয় দেশ বিভাগের পর গোটা শিল্প সেক্টরেই দুর্যোগ নেমে আসে এবং ১৯৫০-৫১ অর্থবছর পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে । আধুনিক শিল্প গড়ে উঠার পূর্বশর্ত বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিমাণ তখন খুবই অল্প ছিল । ১৯৪৮ সালে মাত্র ১ কোটি ৩৪ লাখ ৬৬ হাজাব ১৮০ কিলোওয়াট ঘন্টা বিদ্যুত উৎপাদিত হয়। তার মধ্যে মাত্র ৩০ লাখ ৩২ হাজার ৩৯০ কিলোওয়াট ঘন্টা শিল্প উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় আর বাকী

Dhaka University Institutional Repository

শতকরা ৭৮ ভাগই ব্যবহৃত হয় অন্যান্য কাজে।[৭৯] পূর্ব পাকিস্তানে এ সময় মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ ছিল বছরে মাত্র ০.৩১ কিলোওয়াট ঘন্টা, পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪৭ সালে মোট ৬১টি শহরের মধ্যে মাত্র ১৮টি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল।[৮০]

বিদ্যুৎ সরবরাহের এই স্বল্পতার দিকে লক্ষ্য করলেই শিল্প ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার কারণ স্পষ্ট হয়ে উঠে। ১৯৫০ সালে পি. আই. ডি. সি. গঠিত হবার পর পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়ে উঠতে থাকে । পি আই ডি সি এর উদ্দেশ্য ছিল বড় বড় ব্যবসায়ীদের সাথে যৌথভাবে কারখানা প্রতিষ্ঠা করে তা লাভজনক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং তারপর সরকারি পুঁজি প্রত্যাহার করে ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়া।[৮১] কিন্তু এ ব্যবস্থাটি শুধু পাটকল তৈরীর ক্ষেত্রেই কিছুটা কার্যকরী হয়েছিল অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কেউ বিনিয়োগ করেনি । ফলে পি. আই. ডি. সি. শতকরা ১০০ ভাগ পুঁজি নিজে বিনিয়োগ করে শিল্প সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল । নিম্নের সারণীতে পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫২-১৯৬২ কালপর্বে পি.আই.ডি.সি.-র বিনিয়োগের খতিয়ান দেয়া হল ঃ

সারণী ৬.১৮ ঃ পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫২-১৯৬২ কালপর্বে পি আই ডি সি বিনিয়োগের খতিয়ান।

বিনিয়োগের খাত	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকা)	উদ্যোগ সংখ্যা
পাটকল	২২.৯২	১২
সূতী বস্ত্রকল	২.০০	১
কাগজ কল	২১.৫৯	২
জাহাজ মেরামত ও প্রকৌশল	৫.৭৪	২
চিনি শোধনাগার	৬.৬৪	৩
সার কারখানা	২৪.৩৯	১
মোট	৮৩.২৮	২১

Source : EPIDC Planning Division (1969) : EPIDC Progress Report 1966-67, Dacca: EPIDC Public Relations Depertment.

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬২ সাল নাগাদ মোট ২১টি শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে । এ ২১টি কারখানার মধ্যে ১২টি পাট ও পাটজাত পণ্য উৎপাদন কারখানা, ২টি কাগজ কল, ২টি জাহাজ মেরামত ও প্রকৌশল কারখানা, ২টি চিনি শোধন কারখানা এবং ১টি সার কারখানা। এ কারখানাগুলি প্রতিষ্ঠায় ব্যয় হয় মোট ৮৩ কোটি ২৮ লাখ টাকা । এর মধ্যে ১২টি পাটকলের পেছনে ২২ কোটি ৯২ লাখ টাকা ব্যয় হয়। সার কারখানার পেছনে ২৪ কোটি ৩৯ লাখ টাকা খরচ হয় ।

এভাবে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নত কলাকৌশল সম্বলিত ও পুঁজিঘন কারখানাগুলি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এরপর ১৯৬২ সালে PIDC পিআইডিসিকে ভেঙ্গে পূর্বপাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (EPIDC) প্রতিষ্ঠা করে এর উপরই ন্যাস্ত করা হয় পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প উন্নয়নের দায়িত্ব। ১৯৬২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৬৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত এ সংস্থাটি মোট ৩৮টি শিল্পে ৯২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে । প্রায় শূন্য থেকে শুরু করে ১৯৫৯-৬০ অর্থ বছরে এসে সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত প্রধান প্রধান কারখানার সংখ্যা ১৫২৪ টিতে দাঁড়ায় এরপর থেকে শিল্প কারখানার সংখ্যা খুব দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে এবং ১৯৬৪-৬৫ অর্থবছরে এর সংখ্যা মোট ৩৫৩৮টিতে দাঁড়ায় । ১৯৬৭-৬৮ অর্থবছরে তার সংখ্যা ৩৫৮২ তে দাঁড়ায় । এরপর থেকে কারখানার সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে এবং ১৯৬৯-৭০ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১২৪টিতে ।

সারণি ৬.১৯ ঃ সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান প্রধান শিল্প কারখানার সংখ্যা

শিল্প কারখানার ধরন	১৯৫৯ - ৬০	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৪-৬৫	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯	১৯৬৯-৭০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
শিল্প	-	-	-	৩৯৬	৩৮৫	৪২৩	৪০৮	৪১৬	৪৩০	৪০৬	৪০৮
পাট ও বস্ত্র শিল্প	-	-	-	১০০৯	১০৯৩	১২০১	১১৭০	১২০৩	১২৩২	৯৯৮	৯৯৮
প্রকাশনা শিল্প	-	-	-	১০৮	১১৪	১৩৯	১৪০	১৪৮	১৪৭	১৪৩	১৪১
চামড়া শিল্প	-	-	-	৯৯	১১৬	১৬৭	১৪৮	১৫১	১৪৯	১৪৯	১৪৯
রসায়নজাত শিল্প	-	-	-	৩৪৫	৩৮১	৬০৭	৫৭২	৬১৮	৬৪২	৫৭৬	৫৭২
মৌল ধাতুনির্ভর শিল্প	-	-	-	৩২৯	২৯১	৩১০	২৮৭	২৯৮	২৯৭	২৯৩	২৯২
অন্যান্য শিল্প*	-	-	-	৩৯৮	৪৬৩	৬৯১	৬৩৭	৬৫৫	৬৮৫	৫৬৫	৫৬৪
মোট	১৫২৪	১৫৯৬	২৪৪৫	২৬৮৪	২৮৬৩	৩৫৩৮	৩৩৩২	৩৪৮৯	৩৫৮২	৩১৩০	৩১২৪

সূত্র ঃ Statistical Digest of Bangladesh, No. 8: 1972. Dacca: BBS. Table No. 5.1.pp: 70-71.No. 5: 1968. Table 6.1.p. 98 and No.2.1964. Table 4.1

* অন্যান্য শিল্প বলতে পানীয়, তামাক, আসবাবপত্র, রাবার, কয়লা, ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.২০ ঃ পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত ভারি শিল্পসমূহে ষাট দশকে উৎপাদনের পরিমাণ

পণ্যের নাম		১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৪-৬৫	১৯৬৫-৬৬	১৯৬৬-৬৭	১৯৬৭-৬৮	১৯৬৮-৬৯
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.পাটজাত পন্য	(হাজার টন)	২৫৭	২৬৮	২৯৮	৩৩১	২৮৯	৪০৯	৪০৪	৫১৩	৫১৮
২. তুলা										
ক) সূতা	(বিলিয়ন পাউন্ড)	৪৮	৫৪	৫৪	৬৪	৬৪	৭৩	৭৪	৭৭	৯৬
খ) বস্ত্র	(বিলিয়ন পাউন্ড)	৬৯	৬৭	৫৫	৪৮	৪৯	৪০	৫৫	৫২	৬১
৩. চিনি	(হাজার টন)	৫৬	৬৮	৭৫	৮৮	৭৭	৮৫	১১৩	১১০	৫৭
৪.কাগজ ও নিউজ প্রিন্ট	(হাজার টন)	৬০	৬৭	৬৪	৬২	৭৯	৭৬	৭১	৭৮	৮৩
৫. ম্যাচ	(হাজার গ্রোস)	৯,১৭১	৯,৬২২	১০,০১৩	১১,৫৪৮	১০,৬৯৬	১২,১৮১	১০,৩৭২	১১,০৬৪	১৩,১৯১
৬. সিমেন্ট	(হাজার টন)	৮৬	৭০	৯৪	৬৫	৫৬	৪৩	৭৫	৮২	৬৩
৭. সিগারেট	(মিলিয়ন)	১,৪৫০	২,৭৬০	৩,৭২৯	৪,৮৮৫	৫,৫৩৭	১,৫৭৬	১৩,১৩৪	১৪,৯০৫	১৭,৮১১
৮.সার (ইউরিয়া)	(হাজার টন)	-	১৭	৭২	১০৬	৭২	৯১	৯৩	১১২	৮৭

Source : Planning Department, Government of Pakistan (1970) : Economic Survey of East Pakistan 1969-70. Dacca: East Pakistan Govt. Press. Table 3, p. 105.

বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পখাতে কর্মসংস্থান, সংযুক্ত মূল্য এবং মোট উৎপাদন কাঠামো (১৯৬৯-৭০ সালে শতকরা হারে) নিম্নের সারণীতে দেখা যায় ।

সারণী ৬.২১ ঃ বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পখাতে কর্মসংস্থান ইত্যাদি

	কর্মসংস্থান	মোট উৎপাদন	সংযুক্ত মূল্য
ভোগ্য সামগ্রী	১১.৩	৩৪.৭	৩৪.৫
খাদ্য	২৩.০	২০.৩	১৫.১
মধ্যবর্তী সামগ্রী	২.০	১০.৩	১৩.৫
টেক্সটাইল	৬৩.৫	৩৮.৩	৪৪.২
রসায়ন	৭.৭	৯.৩	১০.৭
পুঁজি দ্রব্য	৪.৫	৭.৭	৬.০
অন্যান্য	১.২	৪.০	১.৯
মোট	১০০	১০০	১০০

উৎস ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস সারণী ১.৫, পৃ. ৫৪৯

Dhaka University Institutional Repository

তদানীন্তন বাংলাদেশে স্থানীয় পুঁজি ও উদ্যোক্তার অভাবের জন্যই সরকারি উদ্যোগে শিল্প স্থাপিত হয়। এর পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও দুর্বল হলেও একটি বেসরকারী শিল্পখাত গড়ে উঠতে থাকে। তখনো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ছিলনা বলে বাঙালি উদ্যোক্তার অভাব থাকায় রাজনৈতিক দক্ষতার বলে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী অবাঙালী পাকিস্তানী উদ্যোক্তাগণ সবরকম সাহায্য পেতেন । তাই বেসরকারী খাতে উল্লেখযোগ্য শিল্পকারখানাগুলোর মালিক ছিলেন অবাঙালি পাকিস্তানী ।

ষাটের দশকে যে বেসরকারি শিল্পখাত গড়ে উঠেছিল তা ছিলো অবাঙালি শিল্পপতিদের অধীনে । ১৯৫০-৭০ সময়কালে শিল্পায়নের ধারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র কয়েকটি পাটকলে বাঙালি উদ্যোক্তাগণ অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলেন । তাছাড়া বেসরকারি খাতে অথবা সরকারি ও বেসরকারি যৌথ মালিকানায় যে সমস্ত শিল্প স্থাপিত হয়েছিল তার বেশীর ভাগই ছিলো অবাঙালি শিল্পপতি বা আমলাদের অধীনে । বস্তুত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানীদের অর্থনৈতিক শোষণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় । বেশীরভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রধান দফতরগুলো করাচীতে থাকায় সমস্ত মুনাফা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হত। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫০-৭০ সাল পর্যন্ত পাটকল, চিনিকল, বস্ত্রকল স্থাপিত হলেও বাঙালি উদ্যোক্তাগণ ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠী খুব বেশী উপকৃত হননি । রাষ্ট্রীয় সহায়তায় অধিকাংশই পেতেন পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পপতিগণ । এই কারণে বাংলাদেশে ১৯৬৯ সালে ২২ পরিবারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিলো । কারণ তখন সরকারি শিল্পনীতি, বাণিজ্যনীতি, রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতি ইত্যাদি তাদের সুবিধার জন্য প্রণীত হতো। উল্লেখিত ২২ পরিবার ছিলো অধিকাংশ বৃহৎশিল্প-কারখানা, ব্যাংক ও বীমার কোম্পানীগুলোর মালিক। অধ্যাপক রেহমান সোবহান তাঁর 'বুর্জোয়া ব্যবস্থার সংকট' নামক গ্রন্থে বলেছেন ১৯৬৯-৭০ সালে আধুনিক শিল্পখাতে স্থায়ী পরিসম্পদের ৪৮ শতাংশের মালিকানা ছিল অবাঙালী পাকিস্তানীদের হাতে এবং ৩৪% ছিল ই.পি.আই.ডি.সি-র মতো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে । শিল্পখাতে পরিসম্পদের মাত্র ১৮ শতাংশের মালিকানা ছিল বাঙালিদের হাতে। এভাবে শিল্প বিকাশের মধ্যদিয়ে শুধুমাত্র শিল্পপতি শ্রেণীরই জন্ম হয়নি, গড়ে উঠেছিল একটি শ্রমিক শ্রেণী এবং গড়ে উঠে শ্রমিক ও শিল্পপতিদের মাঝামাঝি অবস্থানকারী একটি কর্মচারী সমাজ ।

শিল্পায়ন ১৯৭২-১৯৮৫ ঃ

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে বহু শিল্প কারখানার অবকাঠামো যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বিনষ্ট হয় । তাছাড়া অবাঙালি শিল্পপতিগণ, অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপক ও দক্ষ শ্রমিক বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ায় ১৯৭২ সালে শিল্প ব্যবস্থাপনায় শূন্যতার সৃষ্টি হয় । আবার রাজনৈতিক চিন্তাধারায়ও পরিবর্তন ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান আমলে ব্যক্তিমালিকানায় শিল্পায়নকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল । রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প গড়ে উঠেছিল যেখানে শিল্পবিকাশের সম্ভাবনা ছিলনা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ প্রণীত হয় ঃ " বাংলাদেশ শিল্পকারখানা জাতীয়করণ অধ্যাদেশ"। শিল্পকারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করার পেছনে রাজনৈতিক কারণও ছিল এবং শিল্প ব্যবস্থাপনায় যে বড় ধরনের শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল তা পূরণ করার জন্য যথেষ্ট বাঙালি ব্যবস্থাপক কিংবা বেসরকারী শিল্পপতি ছিলোনা। ফলে সরকার সমস্ত শিল্প ইউনিট বা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজের আয়ত্বে আনতে বাধ্য হয় । ১৯৭২ সালের এই অধ্যাদেশ জারি হওয়ার ফলে দেশের শতকরা ৮৫ ভাগের বেশী শিল্পকারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অধীনে চলে আসে । ১৯৭২ সালের জাতীয়করণ অধ্যাদেশ জারি করার আগে থেকেই শতকরা ৪৫ ভাগের মতো শিল্প রাষ্ট্রায়ত্ত ছিল । পরিসংখ্যানুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্তখাতে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত হয় সেগুলোর মধ্যে প্রাক ১৯৭২ এর ই.পি.আই.ডি.সি.-র মালিকানাধীন ৫৩টি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাঙালি মালিকানাধীন ৭৫টি পাট ও বস্ত্রকল, পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত ১১১টি বৃহৎ ও প্রায় ৪০০টি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিলো । সব মিলে মোট শিল্পখাতের ৮৫% ভাগের অধিক। মোট সম্পদের ৪৫% আগে থেকেই রাষ্ট্রায়ত্ত ছিল এবং বাকি ৫৫% সম্পদ নতুনভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয় । পরিত্যক্ত ছিল শিল্প সম্পদের ৬১% ভাগ আর বাকী ৩৯% সম্পদ বাঙালি বৃহৎ কলকারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করে সংগৃহিত হয়।

তারপর শিল্প ব্যবস্থাপনার জন্য নতুন পদ্ধতি চালু করা হয়। ই.পি.আই.ডি.সি. ভেঙ্গে নয়টি আধা-সরকারী কর্পোরেশন স্থাপন করা হয়; এ কর্পোরেশনগুলো ছিলো ঃ (১) বাংলাদেশ জুটমিলস্ কর্পোরেশন (২) বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ কর্পোরেশন (৩) বাংলাদেশ সুগার মিলস্ কর্পোরেশন (৪) বাংলাদেশ ফুড এণ্ড এলাইড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, (৫) বাংলাদেশ স্টিল মিলস্ কর্পোরেশন (৬) বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিপিং কর্পোরেশন (৭) বাংলাদেশ পেপার এণ্ড বোর্ড কর্পোরেশন (৮) বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার ক্যামিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল কর্পোরেশন (৯) বাংলাদেশ টেনারীজ কর্পোরেশন । প্রথমে এ ৯টি কর্পোরেশনের অধীনে শিল্প ইউনিটগুলো পরিচালিত হতো । পরে কর্পোরেশনের সংখ্যা ৯ থেকে ৫ এ কমিয়ে আনা হয় ব্যবস্থাপনায় সুবিধা ও ব্যয় হ্রাসের জন্য । এই পাঁচটি ছাড়াও শিল্পের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত আরো কয়েকটি কর্পোরেশনও সৃষ্টি করা হয়। যেমন ঃ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বাংলাদেশ বনজ শিল্পসংস্থা এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন ।

কিন্তু নানা কারণে নতুন সৃষ্ট পাঁচটি ও অন্যান্য কর্পোরেশনগুলোর উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকে। ১৯৭২-৭৩ সালে মোট দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ ১৯% এর কম ছিল। ১৯৬৯-৭০ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত

Dhaka University Institutional Repository

খাতের উৎপাদনসূচক যে অবস্থানে ছিলো সেখানে পৌছতে ঐ খাতের বেশ কয়েক বছর সময় লাগে । ১৯৭৪-৭৫ সালে ১৯৬৯-৭০ সালের উৎপাদিত পরিমাণের ৮৫.৯৮% সম্ভব হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৭৭-৭৮ সালে উৎপাদনশীল খাত (ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর) ১৯৬৯-৭০ সালের উৎপাদন পর্যায়ে পৌছতে সক্ষম হয় । অবশ্য কোন কোন শিল্পকে পৃথকভাবে দেখলে দেখা যায় যে, সেগুলোর উৎপাদন ১৯৭৭-৭৮ সালেও ১৯৬৯-৭০ সালের উৎপাদনের সমান ছিলোনা । এগুলোর মধ্যে পাট, বস্ত্র, কাগজ ও তামাক শিল্প উল্লেখযোগ্য । ১৯৮১-৮২ সালে এগুলোর উৎপাদন ১৯৬৯-৭০ সালের উৎপাদনের সমপর্যায়ে এসেছিল।

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিক লোকসান দিতে থাকায় জাতীয়করণকৃত শিল্পখাতের ব্যাপারে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে কয়েক বছরের মধ্যেই । তখন রাষ্ট্রায়ত্তখাতে শ্রমিক ইউনিয়নের যে ভুমিকা থাকা দরকার ছিল তা ট্রেডইউনিয়নে পরিলক্ষিত হয়নি । তখনকার ট্রেড ইউনিয়নসমূহের নেতৃত্ব দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলনা। তখন নানাকারণে রাষ্ট্রায়ত্তখাতে প্রায় নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিল। তাই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের অনেকেই এই খাতের নীতি পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করেন । ১৯৭৪ সালে বিনিয়োগ নীতি নতুন করে পরিবর্তিত হয় । ১৯৭৫ সাল থেকে শুরু হয় রাষ্ট্রায়ত্ত খাতকে সংকুচিত করে ব্যাক্তিগতখাতকে প্রসারের উদ্যোগ। ১৯৭৬-৮২ সালের জুন মাসের মধ্যে মোট ৯০টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরনের কারখানা থেকে সরকারি পুঁজি প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৮২ সালের জুনের পর থেকে এই বিরাষ্ট্রীয়করণ নীতি আরো কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করা হয় । পরবর্তী ১৬ মাসে মোট ২১টি ক্ষুদ্র মাঝারি ধরনের কারখানা থেকে পুঁজি প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৭২-৮৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ১৭০.৪৭ কোটি টাকার ৪৭৪টি শিল্প ইউনিট বিরাষ্ট্রীয়কৃত করা হয় । ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রীয়কৃত শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ছিল মোট ৬৩৯ টি।

১৯৮৫ সালের এপ্রিলে প্রদত্ত বিশ্বব্যাংকের ৫৪০৯ নম্বর প্রতিবেদনের ৫.১ নং সারণিতে প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী এ সংখ্যা ১৯৮৪ সালে ৩০৩ -এ দাঁড়ায়। আর এ ইউনিটগুলোর অধিকাংশই ছিল বৃহৎ শিল্প। পরবর্তী পৃষ্ঠার ৬.২২ নং সারণী দ্রষ্টব্য ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.২২ ঃ বাংলাদেশের উৎপাদনশীল খাতের (ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের) কাঠামো ১৯৮১-৮২

	ইউনিটের সংখ্যা	কর্মসংস্থান ০০০	শতকরা অংশ %	মূল্য সংযোজন value add of লক্ষ টাকা	শতকরা অংশ
রাষ্ট্রীয়কৃত খাত	৩০৩	৩১০.২	১৩.৭	৮,৬৮,০০০	৪৬.১
বেসরকারী খাত	৪,২৫,০৮৯	১৯৫৮.৫	৮৬.৩	১,০১,৫৬০	৫৯.৯
মোট বেসরকারী খাতের আপেক্ষিক অবস্থান	৪,২৫,৩৯২	২২৬৮.৭	১০০	১,৮৮,৩৬০	১০০
বৃহৎ শিল্প ইউনিট	২,৪২৫	৯৩.২	৪.১	২১,৩৯০	১১.৪
ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট	২৪,২১৭	৪০০.০	১৭.৬	৩২,০৫০	১৭.০
কুটির শিল্প ইউনিট	৩,৯৮,৪৪৭	১৪৬৫.৩	৬৪.৬	৪৮,১২০	২৫.৫
	৪,২৫,০৮৯	১৯৫৮.৫	৮৬.৩	১,০১,৫৬০	৫৩.৯

উৎস ঃ বিশ্বব্যাংক প্রতিবেদন- এর ৫৪০৯ ঃ Bangladesh Economic Social Development Prospect, Vol.11 এপ্রিল ২, ১৯৮৫, সারণি নং ৫.১ , পৃঃ ৭৩ ।

প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, যখন রাষ্ট্রীয়কৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৩০৩টি তখন বেসরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৪২৫০৮৯টি। এর মধ্যে বৃহৎ শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ২৪২৫টি, ক্ষুদ্র শিল্পের ইউনিট ছিলো ২৪২১৭টি এবং কুটির শিল্প ইউনিট ৩৯৮৪৪৭টি। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলোতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা ছিলো ৩১০২০০ অর্থাৎ শিল্পে নিয়োজিত মোট শ্রমিকের ১৩.৭% । আর বেসরকারি শিল্প ইউনিটগুলোর মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিলো ১৯৫৮৫০০ অর্থাৎ ৮৬.৩% । রাষ্ট্রীয় ইউনিটগুলো বৃহৎ বলে মাত্র ৩০৩ ইউনিটে মূল্য সংযোজন মোট মূল্য সংযোজনের ৪৬.১% এবং মোট কর্মসংস্থানের মাত্র ১৩.৭% সুযোগ সৃষ্টি করতে পেরেছিল । যেসমস্ত বৃহৎ শিল্প বেসরকারি খাতে ছিল, কর্মসংস্থানে তাদের অবদান ছিল মাত্র ৪.১% মূল্য সংযোজন সৃষ্টির পরিমাণ ছিল ১১.৪%। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে অধিক শ্রমিক নিয়োজিত থাকায় শ্রমিক প্রতি উৎপাদন অপেক্ষাকৃত কম ছিল । ১৯৭৪-৮৪ সালে শিল্প কাঠামোতে যে পরিবর্তন আসে তাতে রাষ্ট্রীয় খাতের আকার ক্রমাগত হ্রাস পায় এবং বেসরকারী খাত ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় ।

বিশ্বব্যাংকের ১৯৮৫ সালের ৫৪০৯ নম্বর প্রতিবেদন অনুযায়ী শিল্প খাতে নিয়োজিত শ্রমসংখ্যার ৩২.৬% (৫১১১৩৩০ জন) বয়নশিল্প ও তৈরী পোশাক শিল্পে নিয়োজিত ছিল। এখাতের মূল্যযোগ ছিল মোট মূল্যযোগের ৩৩.৫% ভাগ। দ্বিতীয় বৃহত্তম উপখাত হল খাদ্য, পানীয়, তামাকশিল্প। এই উপখাতে

Dhaka University Institutional Repository

৪,৪২,৫০০ জন শ্রমিক কাজ করে এবং মোট মূল্যযোগের ২৫% উৎপন্ন করে । রাসায়নিক খাতে মাত্র ৪৩,২০০ জন শ্রমিক ২১৭.৩৭ কোটি টাকার মূল্যযোগ সৃষ্টি করে । নিম্নের সারণীতে শিল্পের কাঠামোর সঙ্গে সম্পৃক্ত কিছু পরিসংখ্যান দেয়া হল। এ পরিসংখ্যানগুলোর মধ্যে রয়েছে খাতওয়ারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শ্রমিকের সংখ্যা এবং মূল্যসংযোজনের পরিমাণ।

সারণী ৬.২৩ ঃ সরকারি ও বেসরকারি শিল্পখাত

উপখাত	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	শ্রমিকের সংখ্যা(১০০)%		মূল্যসংযোজনের পরিমাণ (কোটি টাকায় %)	
খাদ্য, পানীয় এবং তামাক	৭৪,৩৫৯	৪৪২.৫	২৮.২	৪২১.৭৫	২৫.০
বয়ন, পোশাক ও চামড়া	৪৫,৯৪৬	৫১১.৩	৩২.৬	৫৬৫.৪২	৩৩.৫
কাঠ ও আসবাবপত্র	৭১,৬৮৩	২২৯.৯	১৪.৭	৮৯.২১	৫.৩
কাগজ ও প্রকাশনা	২,৯২১	৩০.৫	১.৯	৭৫.০৯	৪.৪
রাসায়নিক	২,১৬০	৪৩.২	২.৭	২১৭.৩৭	১২.৯
অধাতব খনিজদ্রব্য	১৮,৮০২	৯৬.৮	৬.২	৪৯.১৩	২.৯
মৌল ধাতব	৪১	৯.০০	০.৬	১১২.১১	৬.৬
ধাতব দ্রব্য	২৫,৮৪৩	১১৯.৭	৭.৬	১২৯.৫০	৭.৭
অন্যান্য কারুশিল্প	৩৩,৬৩৭	৮৫.৮	৫.৪	২৯.৯১	১.৮
	২,৭৫,৩৯২	১,৫৬৮.৭	১০০	১৬,৮৯৪.৯	১০০

উৎস ঃ বিশ্বব্যাংক প্রতিবেদন সংখ্যা ৫৪০৯. ২ এপ্রিল ১৯৮৫, Bangladesh Economic & Social Development Prospects: vol. II, সারণি নং ৫.২ , পৃঃ ৭৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.২৪ ঃ দ্বিতীয় পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) মেয়াদে শিল্প গ্রুপ ভিত্তিক বরাদ্দ ও মঞ্জুরীকৃত বিনিয়োগ (কোটি টাকায়)

শিল্প গ্রুপ	বরাদ্দ			মঞ্জুরীকৃত বিনিয়োগ		
	বড় ও মাঝারি	ক্ষুদ্র	কুটির	বড় ও মাঝারি	ক্ষুদ্র	কুটির
১. খাদ্য ও সমজাতীয় শিল্প	২৭৩.৭৬	৫৭.৭০	১৩.৭৫	৫৬৪.৫৯৫	৪৩.৯৪৪	৪.৯০৩
২. বস্ত্র শিল্প	১৪৫.০৫	৯৩.৬৬	১৭.৮১	৭৯৫.০৯৮	১৮৩.৩৭৫	৫.৯৪২
৩. বিশেষ ধরনের পাটজাত পণ্য,পাটজাত সূতা ও কার্পেট	৮২.৬৩	১১.৯৮	৩.৫০	৫৬.৩৪৮	১.৫৩০	০.৫০২
৪. বন শিল্পজাত পণ্য ও সমজাতীয় শিল্প	১১.৭০	১১.৭৬	১৪.৩৭	১৩.৮৭৮	৪.৮৪৬	৩.৯৮৮
৫. কাগজ, বোর্ড, মুদ্রণ ও প্রকাশনা	৩৬.৫৭	২৮.৪২	১.৭৫	৭২.০৩৫	৯.৫৮৮	০.১০১
৬. ট্যানারী, চামড়া ও রবারের সামগ্রি	৯৫.০৬	৩৮.৮০	৪.৩৮	৯১.৫৪৬	৯.৬২২	০.৩৪৬
৭. রসায়ন, ভেষজ ও সমজাতীয় শিল্প	৪৫৫.৫৩	৪৩.৪৭	৪.০০	২৩৬.০১১	২১.০৯৭	০.৪৩৭
৮. কাঁচ, সিরামিক ও অন্যান্য অধাতব খনিজ- সামগ্রি	১০৯.৬৬	২১.৪৪	৩.৬৯	৬৮.৫৫৯	১.৯০৪	১.৫২০
৯. প্রকৌশল শিল্প	৬৮৭.১৫	১৬১.৫০	১৮.৭৫	৭৩৩.০৮২	৫০.৯৮৮	১.৭২৭
১০. বিবিধ শিল্প	৫৪.৫২	৩০.৯৬	১৩.০৬	৩৮.৬৫৯	১৫.৩৫৭	...
১১. সেবামূলক শিল্প	৯৯.৭০	২২.৯০	...	৬৯.৯১৬	...	...
১২. জাহাজ আভ্যন্তরীণ নৌযান ও সড়ক যান সংগ্রহ	৬৭.৬০	১৬.৮০	...	৪০.৬৩৬	...	...
১৩. অন্যান্য শিল্প	২৮.৪২	৩২.৫৫	৪.৯৪	৮২.১৮০	১১.৬৩৭	০.১০২
মোট ঃ	২,১৪৭.৩৫	৫৭২.০০	১০০.০০	২,৮৬২.৫৪৩	৩৫৩.৮৮৮	১৯.৫৬৮

উৎস ঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮৫-৯০, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, পৃ. ২৩৯

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য ঃ

কয়েকটি নির্বাচিত প্রধান শিল্পপণ্য খাতে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিম্নের সারণিতে দেয়া হলো ঃ

সারণি ৬.২৫ ঃ নির্বাচিত পণ্যসমূহের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ও সাফল্য

শিল্প পণ্যসমূহ	১৯৭৯/৮০ সালে প্রকৃত উৎপাদন	১৯৮৪/৮৫ সালে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা প্রকৃত		১৯৭৯/৮০ সালের তুলনায় বৃদ্ধি (শতাংশ)	লক্ষ্যমাত্রা থেকে ঘাটতি (শতাংশ)
১	২	৩	৪	৫	৬
১. পাট শিল্পজাত পণ্য(হাজার টন)	৫২৫.০	৬৫০.০	৫৬১.০	৬.৯	১৩.৭
২. তুলাজাত সুতা (মিলিয়ন কেজি)	৪৩.২	৮৩.২	৫৯.৪	৩৭.৪	২৮.৭
৩. কলে তৈরী কাপড় (মিলিয়ন মিটার)	৮৫.৯	১৩৮.২	৮৬.৯	১.২	৩৭.১
৪. সার ('০০০' টন)	৪৪২.০	১০৩৭.০	৮০৬.০	৮২.৪	২২.৩
৫. ইস্পাত পিণ্ড ('০০০ টন)	১১৩.০	২২৫.০	১০১.০	(-) ২৪.১	৫৫.১
৬. সিমেন্ট ('০০০' টন)	৩৪৩.০	৪৫০.০	২৪০.০	(-) ৩০.০	৪৬.৭
৭. কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট ('০০০' টন)	৭১.৯	৯৩.০	৯০.০	২৫.২	৩.২
৮. চিনি ('০০০' টন)	৯৩.২	২০০.২	৮৮.০	(-) ৫.৬	৫৬.০

উৎস ঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮৫-৯০, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকাঃ পৃ.২৪০

সারণী ৬.২৬ ঃ উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার ও উৎপাদনশীলতার হার

শিল্পপণ্য	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ১৯৮৪/৮৫	উৎপাদন ১৯৮৪/৮৫	উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহারের হার (১৯৮৪/৮৫ সালে) (%)	শ্রম উৎপাদনশীলতা ১৯৮৩/৮৪ সালে (১৯৭৯/৮০ সালে ১০০ হিসাবে) (%)
১. পাটজাত শিল্প ('০০০' টন	১১৫০ (১০৩৫)	৫৬১	৪৮.৮ (৫৬.০)	৯২.০
২. তুলাজাত সুতা (মিলিয়ন কেজি)	৯০ (১৬০)	৫৯	৬৬.০ (৮২.৫২)	১৩৫.৪
৩. সিমেন্ট ('০০০' টন	৩৯০ (৩৬০)	২৬০	৬৬.৭ (৭২.২)	৮০.০
৪. সার ('০০০' টন	১১৩৮ (১০৮০)	৮০৬	৭০.৮ (৭৫.৯)	১৩১.১
৫. কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট ('০০০' টন	১২৩ (১১১)	৯০	৭৩.২ (৭৩.৯)	৮৩.২
৬. ইস্পাত পিণ্ড ('০০০')টন	২৫.০ (১৫০)	১০১	৪০.০ (৬৬.৭)	৮২.০

বিঃ দ্রঃ বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত সংখ্যাগুলো অর্জনযোগ্য উৎপাদন ক্ষমতা।

উৎস ঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৮৫-৯০, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা ঃ পৃ. ২৪৮

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৭-৮৮ শিল্প শুমারী অনুযায়ী শ্রমনিয়োজনকারী শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪,৭৯৩টি। ১৯৮৯-৯০ সালের শিল্প শুমারীতে দেখা যায় তা ২৫,২৮৩ তে উন্নীত হয়েছে । আশির দশকের শেষের দিকে শিল্পখাতের যে চিত্র পাওয়া যায় তা নিম্নে দেয়া হল ঃ

সারণী ৬.২৭ ঃ শিল্পখাতের মূল পরিসংখ্যানসমূহ, ১৯৮৯-৯০

শিল্প	শিল্প ইউনিটের সংখ্যা	নিয়োজিত শ্রমিক (সংখ্যা হাজার)	স্থির সম্পদ (মিলিয়ন টাকা)	মোট উৎপাদন (মিলিয়ন টাকা)	মোট মূল্য (মিলিয়ন টাকা)
১. মাঝারি ও বৃহৎ (বেসরকারী)	২৫.০৭৩ (৪.৯২)	১.০২১ (৩৫.৩)	২৯.৪৩৯	১৫৪.৩৪৮ (৬০.৭)	৪২.৬৫৭ (৪৯.৩৫)
২. মাঝারি ও বৃহৎ (সরকারী)	২১০ (০.০৪)	২৯১ (১০.১)	৫৩.৯৫৪	৪৭.৪৮৮ (১৮.৭)	২৩.১৫৮ (২৬.৭৯)
৩. ক্ষুদ্র ও কুটির	৪৮৪.৪০৮ (৯৫.০৪)	১৫৮১ (৫৪.৬)	*	৫২.৩৭৬ (২০.৬)	২০.৬২৮ (২৩.৮৬)
মোট	৫০৯.৬৯১ (১০০)	২৮৯৩ (১০০)	*	২৫৪.২১২ (১০০)	৮৬.৪৪৩ (১০০)

* উপাত্ত পাওয়া যায়নি ।

মন্তব্য ঃ বন্ধনীর ভেতরে কলামের শতকরা হার দেয়া আছে ।

উৎস ঃ অর্থনৈতিক সংস্কারের অভিজ্ঞতা ঃ বাংলাদেশের উন্নয়ন পর্যালোচনা ১৯৯৫, পৃ. ৭৪

দশ ও ততোধিক শ্রম নিয়োজনকারী ব্যক্তি মালিকানাধীন ইউনিটের ওপর বাংলাদেশের শিল্পায়ন কৌশল শীর্ষক গবেষণার অধীনে বিশ্বব্যাংক পরিচালিত জরিপ (এ জরিপের ভিত্তিকাল ১৯৯১-৯২) -এর ফলাফলে মোট দেশজ উৎপাদনে শিল্পখাতে অবদান এসেছে শতকরা ১৪.৭ ভাগ । অর্থ মন্ত্রণালয়ের 'স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা উইং' কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী রাষ্ট্রীয় খাতে ১৯৯১ সালে মোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ২০৮টি । এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক নিয়োজিত ছিল মোট ২ লক্ষ ২০ হাজার এবং বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৩.১৪৫ মিলিয়ন টাকার সমান । এসব তথ্য থেকে বুঝা যায় ১৯৮৯-৯০ সালের পর বাংলাদেশের শিল্পখাতের তেমন পরিবর্তন হয়নি বরং এগুলোর উৎপাদন তুলনামূলকভাবে আগের চেয়ে হ্রাস পেয়েছে। সারণী ৬.২৮ থেকে ঐ সময়ের বাংলাদেশের শিল্পখাতের উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধির একটি তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.২৮ ঃ শিল্পখাতে মোট দেশজ উৎপাদন ও প্রবৃদ্ধি ঃ ১৯৮৮/৮৯ - ১৯৯৩/৯৪

বৎসর	১৯৮৮-৮৯	১৯৮৯-৯০	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪
চলতিমূল্যে শিল্পখাতে জি.ডি.পি						
সামগ্রিক	৫৫৬০৮	৬৪৫০৬	৭২৮০১	৮২৫৭১	৯২০০৯	১০২৮২২
বৃহৎ	৩১৪১৪	৩৭৫৬৫	৪২২৫৯	৪৯৩৪৭	৫৭০৮৭	৬৬০৭৮
ক্ষুদ্র	২৪১৯৪	২৬৯৪১	৩০৫৪২	৩৩২২৪	৩৪৯২২	৩৬৭৪৪
স্থিরমূল্যে শিল্পখাতে জি.ডি.পি						
সামগ্রিক	৪৫৯২৭	৪৯২৫৬	৫০৪২৩	৫৪১১৭	৫৯০৩৩	৬৪৫১৮
বৃহৎ	২৫৯৪৫	২৮০৯৫	২৯২৬৯	৩২৩৪২	৩৬৬২৭	৪১৪৬২
ক্ষুদ্র	১৯৯৮২	২০৫৬১	২১১৫৪	২১৭৭৫	২২৪০৬	২৩০৫৬
শিল্পখাতে জিডিপি-র প্রবৃদ্ধি						
সামগ্রিক	২.৭৯	৭.২৫	২.৩৭	৭.৩৩	৯.১	৯.৩
বৃহৎ	২.৭	৮.২৯	৪.১৮	১০.৫	১৩.৩	১৩.২
ক্ষুদ্র	২.৯	২.৯	২.৮৮	২.৯৪	২.৯৪	২.৯

উৎস ঃ অর্থনৈতিক সংস্কারের অভিজ্ঞতা ঃ বাংলাদেশের উন্নয়ন পর্যালোচনা, ১৯৯৫, পৃ. ৭৫।

বিশ্বব্যাংকের ১৯৯৫ সালের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের ৩৩টি উপখাতের মধ্যে মাত্র ১০টি খাতে উৎপাদন আগের বছরগুলোর তুলনায় বেশী ছিল (রসায়ন, চা, তৈরী পোষাক, প্রকাশনা ও সার শিল্প ইত্যাদি) । বি.বি.এস./ সি.ই.এস. এর পরিসংখ্যানেও ৯০-এর দশকে তৈরী পোশাক বহির্ভূত শিল্পখাতের স্থবিরতা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.২৯ ঃ তৈরী পোশাক বহির্ভূত শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি

	১৯৮৯-৯০	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪
বি.বি.এস.এর উৎপাদন সূচক	১৬৭.৪১	১৭১.৪	১৮৮.৮৩	২১৩.৬৫	২৩১.১১
তৈরী পোষাক ব্যাতিরেকে বি.বি.এস. এর উৎপাদনসূচক	১২৯.০২	১২২.৬৫	১২৭.৫৮	১৩৮.৫৪	১৪৭.৬৫
শিল্পখাতে মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার	৮.২৯	৪.১৮	১০.৫	১৩.৩	১৩.২
তৈরী পোষাক বহির্ভূত শিল্পখাতে মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার	৬.৩৯	২.৯৯	৭.০৯	৮.৬২	৮.৪৩
শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির পুনঃনির্ধারিত হার (তৈরী পোষাক ব্যাতীত)	৩.৬৭	১.৭২	৪.০৮	৪.৯৬	৪.৮৫

উৎসঃ অর্থনৈতিক সংস্কারের অভিজ্ঞতা ঃ বাংলাদেশ উন্নয়ন পর্যালোচনা ১৯৯৫, সিপিডি ইউপিএল ২, পৃ. ৭৯।

নিম্নে কিছু নির্ধারিত বছরে জি.ডি.পি-তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অংশ এবং এখাতের প্রবৃদ্ধির হার সারণিতে দেখানো হল ।

সারণী ৬.৩০ ঃ জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অংশ এবং বিগত প্রবৃদ্ধির হার সমূহ (স্থির দামে)

বৎসর	জিডিপি-র অংশ (শতাংশ)	সময়কাল	পুরো সময়কালে গড় যৌগিক প্রবৃদ্ধি হার (শতাংশ)
১৯৭২/৭৩	৯.০০	১৯৭৩-৭৮	৭.৩৫
১৯৭৯/৮০	১১.২২	১৯৭৮-৮০	৬.২১
১৯৮৪/৮৫	৯.৮৬	১৯৭৩-৮০	৭.০২
১৯৮৯/৯০	৯.৯১	১৯৮০-৮৫	০.৯৩
১৯৯৪/৯৫	১১.৩৬	১৯৮৫-৯০	৪.২২
১৯৯৫/৯৬	১১.৩৭	১৯৯০-৯৫	৭.০০
১৯৯৬/৯৭	১১.০৮	১৯৯৫-৯৬	৫.৩৩
		১৯৯৬-৯৭	৩.৩১

উৎস ঃ বি বি এস

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৯/৯০ সালে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.২ শতাংশ যা ১৯৯৪/৯৫ সালে এসে দাঁড়ায় ৮.৬ শতাংশে । ১৯৯০/৯১ সাল থেকে ১৯৯৫/৯৬ সালের মধ্যে এখাতের উঠা-নামাসহ গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৩ শতাংশ । চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বছরে প্রবৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম (২.৩৯ শতাংশ ছিল)। আর ১৯৯২/১৯৯৩ সালে সবচেয়ে বেশী (৯.১০ শতাংশ) ছিল। ১৯৯৫/৯৬ এবং ১৯৯৬/৯৭ সালে প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৫.৩% এবং ৩.৩% ছিল । শিল্প উপখাতগুলোর মধ্যে ঔষধ ও তৈরী পোশাক শিল্প সবচেয়ে বেশী প্রবৃদ্ধি (১০ শতাংশের বেশী) অর্জন করেছিল । তবে পাট ও তুলা বস্ত্রশিল্পে প্রবৃদ্ধির হারের অবনতি ঘটেছিল ।

১৯৯০/৯১ থেকে ১৯৯৪/৯৫ মেয়াদে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩১,৪৫৭ মিলিয়ন টাকা । এতে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১০.৫৪% আর ব্যক্তিখাতের মোট অবদান ছিল ৮৫.৮৯% । ১৯৯৫/৯৬ এবং ১৯৯৬/৯৭ সালে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৪,৯১৯ মিলিয়ন টাকা ও ৩৪,৫১৩ মিলিয়ন টাকা এবং ব্যক্তিখাতে অবদান যথাক্রমে ৯৫% ও ৯৭% । সার, ঔষধ এবং রপ্তানী পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগের বড় অংশ ব্যয় হয়। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে মোট বিনিয়োগের ৭০ শতাংশ তৈরী পোশাক ও বয়ণজাত পণ্যে বিনিয়োজিত হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নের সারণিতে মোট বিনিয়োগ এবং সংস্থাভিত্তিক গণখাতের ব্যয় দেখানো হয়েছে ।

সারণী ৬.৩১ ঃ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বিনিয়োগ (চলতি দামে)

মিলিয়ন টাকা

বৎসর	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭	মোট
মোট বিনিয়োগ	২৩,৪১৫	২২,৬৯৯	২৪,৩১৯	২৫,৮২৫	৩৫,১৯৯	৩৪,৯১৯	৩৪,৫১৩	২,০০,৮৮৯
গণ খাতে বিনিয়োগ	৮,৩৩১	৩,৩৩৮	১,২৪০	২,২৭৩	২,২২৭	১,৭১৮	১,০৮২	২০,২০৯
ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ	১৫,০৮৪	১৯,৩৬১	২৩০৭৯	২৩৫৫২	৩২৯৭২	৩৩২০১	৩৩৪৩১	১,৮০,৬৮০
অভ্যন্তরীন ব্যক্তি বিনিয়োগ	১২,৫৭৯	১৭,৯২৭	২১,২৪৮	২০,৫৯৫	১৯,০৫৩	১৬,৩৪৬	১৫,০০৩	১,২২,৭৫১
প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ	১,৫৬৮	৪২৮	৮৯৪	১,৩৬৭	১২,৩৯২	১৫,৫৫৫	১৫,৫০৬	৪৭,৭১০
ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগ	৯৩৭	১,০০৬	৯৩৭	১,৫৯০	১,৫২৭	১,৩০০	২,৯২২	১০,২১৯
শতকরা অংশ								
গণ খাত	৩৫.৫৮	১৪.৭১	৫.১০	৮.৮০	৬.৩৩	৪.৯২	৩.১৪	১০.০৬
ব্যক্তি খাত	৬৪.৪২	৮৫.২৯	৯৪.৯০	৯১.২০	৯৩.৬৭	৯৫.০৮	৯৬.৮৬	৮৯.৯৪
অভ্যন্তরীণ ব্যক্তি বিনিয়োগ	৫৩.৭২	৭৮.৯৮	৮৭.৩৭	৭৯.৭৫	৫৪.১৩	৪৬.৮১	৪৩.৪৭	৬১.১০
প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ	৬.৭০	১.৮৮	৩.৬৮	৫.২৯	৩৫.২০	৪৪.৫৫	৪৪.৯৩	২৩.৭৫
ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগ	৪.০০	৪.৪৩	৩.৮৫	৬.১৬	৪.৩৪	৩.৭২	৮.৪৬	৫.০১

উৎস ঃ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯৭-২০০০, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা ঃ পৃ.২৭৬

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.৩২ ঃ চতুর্থ পরিকল্পনাকাল (১৯৯০-৯৫) ১৯৯৫/৯৬ এবং ১৯৯৬/৯৭ সালে মন্ত্রণালয় এবং সরকারি সংস্থা সমূহ কর্তৃক এডিপি-এর ব্যয় (চলতি দামে)

(মিলিয়ন টাকায়)

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম	১৯৯০/৯১	১৯৯১/৯২	১৯৯২/৯৩	১৯৯৩/৯৪	১৯৯৪/৯৫	মোট ১৯৯০-৯৫	১৯৯৫/৯৬	১৯৯৬/৯৭
০১	বাংলাদেশের রপ্তানি শিল্প সংস্থা	৭৬৯৪.৪৭ (৯২.৩৬)	২৫৭৫.৯৪ (৭৭.১৫)	৪৬৫.৯৩৯ (০.৩৮)	১০৬৪.৪১ (৪৬.০৪)	৮৫১.৯২৭ (৩৮.২২)	১২৬৩৪.৬৯ (৭২.৮৯)	৬৬৬.৪০ (৩৮.৭৯)	১০৫৮.১১ (৯.৭৮)
০২	বাংলাদেশ ইস্পাত শিল্প ও প্রকৌশল সংস্থা	১৬.২০ (০.১৯)	২৪.৭০ (০.৭৪)	-	-	-	৪০.৯০ (০.১৮)	২.৫০ (০.১৫)	বাকীগুলি বুঝা যায়না
০৩	বাংলাদেশ বস্ত্রকল সংস্থা	-	-	-	৩৫.০০ (১.৫৪)	৪৩.৫৮ (১.৬৯)	৭৮.৫৮ (০৪৫)	৭৬.৫০ (৪.৪৫)	৬০০০ (৫.৪৪)
০৪	বাংলাদেশ পাটকল সংস্থা(বিজেএমসি)	৫৭.৭৭ (০৬৯)	-	-	-	-	৫৭.৭৭ (০.৩৩)	৪.০০ (০.২৩)	
০৫	বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা (বিএসএফ আইসি)	১৮৯.২৫ (২.২৭)	৭৪.৯০ (২.২৪)	২১৪.৭০ (১৭.৩২)	৩০১.২২ (১৩.২৫)	১০৭.১৩ (৪.৮১)	৮৮৭.২০ (৫.০৮)	৬৮.০০ (৩.৯৬)	২০১০ (১.৮৬)
০৬	বাংলাদেশ বন শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (বিএফআইডিসি)	-	-	-	-	-	-	-	
০৭	বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা	১৭৮.৫০ (২.১৪)	৩১২.৮০ (৯.৩৭)	২১৭.৩০ (০.১৮)	৩৩৩.৮০ (১৪.৬৯)	৩৪৯.৩০ (১৫.৬৯)	১৩৯১.৭০ (৮.০৩)	২৮৭.৫০ (১৬.৭৩)	১১৮.৪০ (১০.৯৪
০৮	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	৯২.৫০ (১.১১)	৩৭.৪০ (১.১২)	২০.০০ (০.০২)	১০.৩৫ (০.৪৬)	১৮০.৪০ (৮.১০)	৩৪০.৬৫ (১.৯৭)	২২.১৫ (১.২৯)	৩৫.১০ (৩.২৪)
০৯	বাংলাদেশ রেশম বোর্ড	৪০.০০ (০.৪৮)	৮০.০০ (২.৪০)	৬১.৯০ (০.০৫)	১১৫.০০ (৫.০৬)	১৪৬.২৫ (৬.৫৭)	৪৪৩.১৫ (২.৫৬)	১২১.৯০ (৭.০৯)	১৫.০০ (১.৩৯)
১০	বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বিইপিজেডএ)	৫০.০০ (০.৬০)	২২০.০০ (৬.৫৯)	২২০.০০ (১৭.৭৪)	২৮০.০০ (১২.৩২)	২৪৯.২০ (১১.১৯)	১০১৯.২০ (৫.১২)	১৩৪.৩০ (৭.৮২)	৪৮.৪০৩ (৪৪.৭৩)
১১	বাংলাদেশ শিল্প প্রযুক্তি সহায়তা কেন্দ্র (বিআইটিএসি)	১০.০০ (০.১২)	০.৮৩ (০.০২)	৪.৬৭ (০.৩৮)	৪৪.৭৭ (১.৯৭)	-	৬০.২৭ (০.৩৫)	৯.২০ (০.৫৪)	-
১২	শিল্প মন্ত্রণালয়	-	-	০.০১৫ (০.০০১২)	২৯.৬৪৮ (১.৩০)	১৫.১৬৭ (০.৬৮)	৪৪.৮৩ (০.২৬)	১৫.০০ (০.৮৭)	-
১৩	বস্ত্র মন্ত্রণালয়	১.৪৪ (০.০২)	১.৭৮ (০.০৫)	৩.৪৩ (০.২৮)	২.৭০ (০.১২)	৮.৩৮ (০.৩৮)	১৭.৭৩ (০.১০)	৬.০০ (০.৩৫)	২.৩০ (০.২১)
১৪	বস্ত্র অধিদপ্তর (ডিওটি)	-	-	-	-	৬৪.৭১ (২.৯১)	৬৪.৭১ (০.৩৭)	৫৭.৩০ (৩.৩৩)	১০.০০ (০.৯২)
১৫	পাট মন্ত্রণালয় (এমওজে)	-	-	-	-	-	-	১৩৩.৩৭ (৭.৭৮)	১৪৫.০০ (১৩.৪০)
১৬	পাট অধিদপ্তর (ডিওজে)	-	-	-	-	-	-	-	১৬.৬০ (২.৪৬)
১৭	মুদ্রণ, ষ্টেশনারী, ফরম ও প্রকাশনা অধিদপ্তর	-	৭.৫০ (০.২২)	২৮.৬৭ (২.৩১)	৪০.০০ (১.৭৬)	৫২.৭৫ (২.৩৭)	১২৮.৯২ (০.৭৪)	৫.০ (০.২৯)	৫৯.৮৯ (৫.৫৩)
১৮	প্যাটেন্ট ও ডিজাইন	০.৩৬৫ (০.০০৫)	১.১৮৭ (০.০৪)	১.৬০ (০.১৩)	০.৩৬৩ (০.০১৬)	০.৪৫০ (০.০২)	৩.৯৬৫ (০.০২)	-	-
১৯	ট্রেডমার্ক নিবন্ধন	০.৩৬৫ (০.০০৫)	০.৯০০ (০.০৩)	১.৬০ (০.১৩)	০.৪০০ (০.০২)	০.৩৬০ (০.০১৬)	৩.৬২৫ (০.০২)	-	-
২০	বিনিয়োগ বোর্ড	-	-	-	১১২০ (০.৪৯)	৬৭.৪০ (৩.০৩)	৭৮.৬০ (০.১৭)	১.১০ (০.০৬	-
২১	ট্যারিফ কমিশন	-	-	-	২১.৪৬ (০.৯৪)	২৫.৪৯২ (১.১৪)	৪৬.৯৬ (০.২৭)	১৬.৭০ (০.৯৭)	-
২২	এনপিও	-	-	-	-	-	-	০.১০ (০.০০৫)	-

Dhaka University Institutional Repository

২৩	বেসরকারিকরণ বোর্ড	-	-	-	০৩৬৫ (০.১৬)	৪০.১৭৩ (১.৮০)	৪০.৫৪ (০.২৩)	৫৯.০০ (৩.৪৩)	-
২৪	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)	-	-	-		২৩.২০০ (১.০৪)	২৩.২০ (০.১৩)	১৫.০০ (০.৮৭)	-
২৫	বাংলাদেশ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান (বিআইএম)	-	-	-	-	-	-	২.০০ (০.১২)	-
২৬	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	-	-	-		০.৮৪২ (০.০৪)	০.৮৪ (০.০০৫)	৭.৫০০ (০.৪৪)	-
২৭	ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স এণ্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)	-	-	-	-	-	-	৫.০০ (০.২৯)	-
২৮	ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন সহায়তা ও সেবা (এমআইডিএএস)	-	-	-	-	-	-	২.৩০ (০.১৩)	-
	মোট	৮,৩৩০.৮৬ (১০০)	৩,৩৩৭.৯৪ (১০০)	১,২৩৯.৮২ (১০০)	২,২৭২.৬৯ (১০০)	২,২২৬.৭১ (১০০)	১৭,৪০৮.০২ (১০০)	১,৭১৮.১৫ (১০০)	১.০৮২.২৩ (১০০)

উৎস ঃ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯৭-২০০০, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা ঃ পৃ. ২৭৬-২৭৭

এই সময়ে উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানী গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল বার্ষিক ১৬ শতাংশ হারে । ১৯৮৯/৯০ সালে ৬৭ শতাংশ থেকে ১৯৯৬/৯৭ সালে ৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে রপ্তানী আয় ১৯৮৯/৯০ সালে ১১৫০ মিলয়ন মার্কিন ডলার থেকে ১৯৯৬/৯৭ সালে ৩৭০৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসে দাঁড়ায় অর্থাৎ ঐ খাতে ২৫৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানী আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই উপার্জনের প্রধান অংশ (৬৭ শতাংশ) আসে তৈরী পোশাক ও নিট ওয়ার থেকে । দেশের মোট কর্মসংস্থানে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান ৭.৪ শতাংশ। এই খাত ৩.৬৩ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে । দেশের মোট কর্মসংস্থানের এক তৃতীয়াংশ বড়, মাঝারি ও ছোট শিল্পগুলিতে, এক তৃতীয়াংশ কুটির শিল্পে এবং অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ হস্তচালিত তাঁত শিল্পের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় ।

<u>বিদেশী সহযোগিতায় যৌথ উদ্যোগে শিল্পায়ন</u> ঃ বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের পূর্বে যৌথ উদ্যোগে যে শিল্পায়ন হয় সেগুলো হচ্ছে চা বাগান, পেট্রোলিয়াম ও গ্যাস এবং ঔষধ শিল্প । স্বাধীনতার পর যৌথ উদ্যোগে যে শিল্পবিকাশ হয় সেগুলো হচ্ছে সামুদ্রিক মাছ ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ, রাসায়নিক ঔষধ শিল্প, তৈরী পোশাক, বৈদ্যুতিক প্রকৌশল, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, যন্ত্র প্রকৌশল শিল্প ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নের সারণিতে স্বাধীনতার পূর্বে বহুজাতিক ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, উৎসদেশ ও মূলধন দেখানো হয়েছে ।

সারণী ৬.৩৩ ঃ স্বাধীনতার পূর্বে যৌথ উদ্যোগে চালু বহুজাতিক ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, উৎস-দেশ ও মূলধনে তাদের অংশ

	বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের নাম	উৎসদেশ	মূলধনের অংশ % বাংলাদেশী/বিদেশী	
১.	হোয়েকস্ট ফার্মাসিউটিক্যাল কোং	পঃ জার্মানী	৪৮	৫২
২.	ফাইজার ল্যাবরেটরিজ (বাংলাদেশ)	যুক্তরাষ্ট্র	২৩.৬৭	৭৬.৩৩
৩.	বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রি (মে এণ্ড বেকার)	যুক্তরাজ্য	৪০	৬০
৪.	গ্লাক্সো বাংলাদেশ	যুক্তরাজ্য	৩০.৭০	৬৯.৩৯
৫	আই সি আই (বাংলাদেশ)	যুক্তরাজ্য	৩০	৭০
৬.	ফাইসন্স (বাংলাদেশ)	যুক্তরাজ্য	৫১	৪৯
৭.	অবগানন (বাংলাদেশ)	নেদারল্যাণ্ড	৪০	৬০

উৎস ঃ Sadrel Reza and Hafiz G.A. Siddiqi, Bangladesh in South Asia and Asean A Study in Economic R Lations; Bangladesh Unyan Parishad, Dhaka-5, 1984, p. 66.

সারণী ৬.৩৪ ঃ নিম্নের সারণির সাহায্যে বৈদেশিক বিনিয়োগের অবস্থা দেখানো হল ঃ

অর্থ বছর	প্রকল্প সংখ্যা		কোটি ডলারে বিনিয়োগ	কর্মসংস্থান জন	
	স্থানীয়	বৈদেশিক		স্থানীয়	বৈদেশিক
১৯৯৬-৯৭	১২৪৭	১৩৮	২১৬.২০	১৫৫৬৮৪	২৮৮৮৭
১৯৯৭-৯৮	১৪৪৮	১৪০	৪৫৭.৭	১৯৪১৫৮	২৭৭৯০
১৯৯৮-৯৯	১৫৩৫	১৬১	৮১০.৯০	২০০৭৬৩	৪৯৯২৯
১৯৯৯-২০০০	১৪২৮	১৩৫	৩৪৪.৩০	১৯৪০৯৫	২৩৫৪২
মোট -	৫৬৫৮	৫৭৪	১৮২৯.১০	৭৪৪৭০০	১৩০১৪৮

উৎস ঃ বিচিত্রা , ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০০ ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.৩৫ ঃ নিম্নের সারণিতে কয়েকটি শিল্পখাতে উৎপাদন শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের পরিমাণ দেখানো হল

সময়কাল	পাট	তুলা	কাগজ	ইস্পাত	সিমেন্ট	সার	পেট্রোলিয়াম
১৯৯১-৯২	৮৮.২৬	১০৮.০৪	৯৯.৮৯	৯৮.৭৩	৯৬.০০	১৫৯.০০	৯৯.০০
১৯৯২-৯৩	৮৫.৬১	১০৯.৩৫	৯৬.৮১	৯৬.৬০	৯৩.৬৮	১১৩.৭১	১০৫.৯৯
১৯৯৩-৯৪	৮১.০৮	৯১.৫৬	৮৭.২৮	৯০.৮৪	--	১১০.৬২	১১৩.৩৫
১৯৯৪-৯৫	৭৮.৮০	৮২.৫৬	৮২.০৮	৭৬.১০	--	১০৭.৫৫	১১৫.৮০
১৯৯৫-৯৬	৭৬.৭০	৭২.২০	৭৯.৮৪	৭৫.১১	১১৩.১৮	১০৮.৮৫	১২২.০৭
১৯৯৬-৯৭	৭৫.৪২	৭২.২০	৭৭.০৫	৩৯.০৪	১১২.০৮	১০৬.৯০	১১৮.২৫
১৯৯৭-৯৮	৭৫.৫০	৭২.৩৩	৭৪.৫৫	৩৭.৪৫	১২১.৪২	১০৮.৭৮	১১৭.৭৬

উৎস ঃ বাংলাদেশের সমাজ ও অর্থনীতি ভাবনা, পৃ. ২২ ।

ড. নজরুল ইসলাম, মৌলি প্রকাশনী, অক্টোবর, ২০০০।

বিনিয়োগ বোর্ডের তথ্যানুযায়ী, গত ১০ বছরে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদেশী বিনিয়োগ আসলেও সে অনুযায়ী কর্মসংস্থান হয়নি । দেশীয় বিনিয়োগ কম হলেও কর্মসংস্থান হয়েছে অনেক । বিনিয়োগ বোর্ডের তথ্য মতে, ১০ বছরে মোট ৬১ হাজার ৯৬ কোটি ২০ লাখ টাকায় বিদেশী বিনিয়োগ নিবন্ধিত হয়েছে । এতে দুই লাখ ৭৪ জনের কর্মসংস্থানের কথা বলা হয়েছে। অপরদিকে এসময়ে বিনিয়োগ বোর্ডে ৪৯ হাজার ৪৮৮ কোটি ৪০ লাখ টাকার দেশী বিনিয়োগ নিবন্ধিত হয়েছে । এসব দেশী শিল্প প্রতিষ্ঠানে ১৮ লাখ ৮১ হাজার ৭০৬ জনের কর্মসংস্থানের কথা বলা আছে ।

বিনিয়োগ বোর্ডের সূত্রানুযায়ী গত ১০ বছরে বোর্ডের কাছে নিবন্ধিত দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৪ হাজার ৭৭টি। এসময় নিবন্ধিত বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৫ হাজার ২৪৪টি। বিদেশী বিনিয়োগ এবং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেশী হলেও কর্মসংস্থান কম হওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে এসব কোম্পানীর ম্যানেজমেন্টের দক্ষতা। তাছাড়া বিদেশীরা এমন কিছু প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করছে যেগুলোতে অনেক কম সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন । অপরদিকে দেশীয় বিনিয়োগকারীদের অনেকেই শ্রমঘণ শিল্পে বিনিয়োগ করে ।

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগ বোর্ডের হিসেব মতে, গত অর্থবছরে ২,৮৭৫টি দেশীয় প্রতিষ্ঠান বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন নিয়েছে । এতে ৮,৮০৬ কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা বলা হয়েছে । নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানগুলো বাস্তবায়ন হলে মোট ৩,৫৮,৪৬২ জনের চাকুরীর সুযোগ হবে । একই অর্থ বছরে ৮৯টি বিদেশী প্রতিষ্ঠান বোর্ডের কাছে নাম অন্তর্ভূক্ত করেছে। ১,৭৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত এসব শিল্পে ১৫,১৬৩ জনের কর্মসংস্থানের কথা বলা হয়েছে ।

বিনিয়োগ বোর্ডের অপর এক হিসেবে দেখা যায় যে, এ পর্যন্ত বোর্ডে মোট ১৪,৩৪৩ মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব নিবন্ধিত হয়েছে । বিনিয়োগ প্রস্তাবে শীর্ষে আছে যুক্তরাষ্ট্র (৪,৫০৫ মিলিয়ন ডলার), দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য (১,৫৯১ মিলিয়ন ডলার), তৃতীয় অবস্থান মালেশিয়ার । তাদের বিনিয়োগের পরিমাণ ১,৩৩৭ মিলিয়ন ডলার ।

সূত্র ঃ ইত্তেফাক, শনিবার, ৩১ আগস্ট, ২০০২ইং, ।

ইপিজেড এবং বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা ঃ

বাংলাদেশ সরকার ১৯৮০ সালে জাতীয় সংসদে পাসকৃত আইনের মাধ্যমে ঢাকা ও চট্টগ্রাম দুটি রপ্তানি প্রক্রিয়া অঞ্চল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল । চট্টগ্রাম ইপিজেড-এ ৭৩টি শিল্প উইনিট এবং ঢাকা ইপিজেড -এ ২৩টি শিল্প ইউনিট বর্তমানে চালু আছে । তাছাড়া চট্টগ্রাম ইপিজেড-এ ৩৪টি এবং ঢাকা ইপিজেড-এ ৪৬টি শিল্প ইউনিট বাস্তবায়নাধীন রয়েছে । চালু ইউনিটগুলোতে বিনিয়োগের পরিমাণ ২৩৬.৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ঐ সকল ইউনিটে ৪৬,০০০ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরো তিনটি রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা স্থাপন করতে চাচ্ছে । অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি তরান্বিত করার জন্য রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকাসমূহে আরো বেশী বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে পঞ্চম পরিকল্পনা মেয়াদে যে প্রাক্কালন করা হয়েছে তার সারণিটি পর পৃষ্ঠায় (৬.৩৬) এ দেখানো হল ঃ

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.৩৬ ঃ

২০০১/২০০২ সালে ইপিজেডসমূহে প্রত্যাশিত বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান-

এলাকা	শিল্পের সংখ্যা	বিনিয়োগ (মিলিয়ন- ইউএস ডলার)	কর্মসংস্থান সংখ্যা	বাৎসরিক রপ্তানি (মিলিয়ন ইউ.এস ডলার)
চট্টগ্রাম ইপিজেড	১১০	৩৫০	৫০০০০	৬০০
ঢাকা ইপিজেড	৯০	৩০০	৪০০০০	৫০০
গাজীপুর ইপিজেড	১৫০	৪০০	৬০০০০	৭০০
মংলা ইপিজেড	১০০	৩০০	৪০০০০	৫০০
উত্তরবঙ্গ ইপিজেড	৯০	৩০০	৪০০০০	৭০০
মোট	৫৪০	১৬৫০	২৩০০০	৩০০০

উৎস ঃ বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বিইপিজেড-এ)

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯৭-২০০২ এর শেষে ৫৪০টি শিল্প ইউনিটে ১৬৫০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ এবং ২,৩০,০০০ লোকের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং পরিকল্পনার শেষ বছরে রপ্তানীর পরিমাণ ৩ বিলিয়ন ডলারে উপনীত হবে বলে আশা করা হয়েছে ।

প্রধান শিল্পপণ্য সামগ্রীর ভিত্তি বছরে উৎপাদন এবং পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছরের উৎপাদনের প্রাক্কলন সারণী ৬.৩৭ এ দেখানো হল।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ৬.৩৭ ঃ পঞ্চম পরিকল্পনা মেয়াদে প্রধান শিল্পদ্রব্যসমূহের প্রক্ষেপিত উৎপাদন

প্রকার	একক	১৯৯৬/৯৭ (ভিত্তি বছর)	২০০১/২০০২ (প্রান্তিক বছর)
ইউরিয়া	০০০ এম. টি.	২০৪৯.৮১	২৩৬৩.০০
টিএসপি/এসএসপি	০০০ এম. টি.	১০৪.১৮	২২০.০০
কাগজ, মণ্ড এবং নিউজপ্রিন্ট	০০০ এম. টি.	৭০.০০	১২৪.২০
সিমেন্ট	০০০ এম. টি.	১০৭.৩০	২৩৩.০০
সূতা উৎপাদন	মিলিয়ন কেজি	১১৩.০০	৫২২.০০
তুলা উৎপাদন	মিলিয়ন কেজি	৭৫.৭১	৩৪৯.৭৪
টিসি এবং অন্যান্য	মিলিয়ন কেজি	৩৭.২৯	১৭২.২৬
বস্ত্র উৎপাদন	মিলিয়ন মিটার	১১৬৩.০০	৩৬৫১.০০
তুলা কাপড়	মিলিয়ন মিটার	৭৭৯.২১	২৪৪৬.১৭
টিসি এবং অন্যান্য	মিলিয়ন মিটার	৩৮৩.৭৯	১২০৪.৮৩
তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য বস্ত্র	মিলিয়ন মিটার	২১০.০০	১৬১৪.০০
তুলা বস্ত্র	মিলিয়ন মিটার	১৪০.৭০	১০৮১.৩৮
টিসি এবং অন্যান্য	মিলিয়ন মিটার	৬৯.৩০	৫৩৮.৬২
পাট বস্ত্র	০০০ এম. টি.	৪৩৫.০০	৫০০.০০
হেসিয়ান	০০০ এম. টি.	১৩৯.২০	১৬০.০০
চট	০০০ এম. টি.	২৫২.৩০	২৯০.০০
সিবিসি	০০০ এম. টি.	৪৩.৫০	৫০.০০
চিনি	মিলিয়ন এম .টি.	০.১৪	০.২৩
স্পিরিট	০০০ লিটার	২৫০০.০০	৪০০০.০০
বাস, ট্রাক ও কার	সংখ্যা	১২০০	১৩৫০
মটর সাইকেল	সংখ্যা	৭০০০	৮০০০
ডিজেল ইঞ্জিন	সংখ্যা	৭৫০	৪০০০
ইস্পাত পিণ্ড	০০০ এম.টি	২১.৯০	৭৫.০০

উৎস ঃ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯৭-২০০০, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকাঃ পৃ. ৩১২

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার ঃ ১৯৪৭-১৯৭১ সময়কাল পর্যন্ত বাংলাদেশ মৃদু শিল্পোন্নয়ন অর্জন করেছিল এবং সামগ্রিক শিল্প বিকাশের গতি ছিল অত্যন্ত ধীর । ১৯৬০ এর দশকে প্রতিষ্ঠিত বৃহদায়তন শিল্পগুলো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অবাঙালি মালিকানার অধীনে বিকাশ লাভ করেছিল। ফলে সম্পদের অনাকাঙ্খিত বন্টনের সূত্রপাত হয়। সম্পদের বরাদ্দ অল্প থাকায় ক্ষুদ্রায়তন ও কুটিরশিল্পগুলোর প্রবৃদ্ধি ছিল সামান্য এবং সরকারের কিছু নীতির কারনে শিল্পগুলো স্থবিরতায় ভুগতে থাকে । পাকিস্তান সরকারের পক্ষপাতপূর্ণ নীতি, বিনিয়োগ দ্রব্য আমাদানির জন্য বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পোদ্যোক্তাদের অধিক সুবিধা দেয়ায় এবং পূর্ব-পাকিস্তানে উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার প্রকৃত আয় পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তর করায় আধুনিক শিল্পের বিকাশ পশ্চিম পাকিস্তানে দ্রুতগতিতে হয় ।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং সামরিক শাসন শক্তিশালী ট্রেডইউনিয়নের বিকাশকে ব্যাহত করেছিল । ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পরও শ্রমিকদের মধ্যে বিভক্তির কারণে গঠনমূলক ট্রেডইউনিয়ন কাঠামো গড়ে উঠতে পারেনি । তাই স্বাভাবিকভাবেই ট্রেডইউনিয়ন শ্রমিকদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা না রেখে দুর্বলতার পরিচয় দেয়। তারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যেমন ঃ ধর্মঘট, বিক্ষোভ ইত্যাদিতে জড়িয়ে পড়ে । মমতাজউদ্দীন আহমদ লিখেছেন, " প্রকৃতপক্ষে বহুসংখ্যক দুর্বল, অত্যন্ত রাজনৈতিকীকৃত এবং তীব্রভাবে দ্বিধাবিভক্ত ইউনিয়নসমূহই হচ্ছে বাংলাদেশ এবং অন্যান্য অধিকাংশ দক্ষিণ এশিয় দেশে শিল্প সম্পর্ক কাঠামোর একটি ধ্বংসাত্মক বৈশিষ্ট্য (ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ১৯৯৬)। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ট্রেডইউনিয়ন-সমূহের রাজনৈতিক সংযোগ (যেমন, স্বাধীনতাপূর্ব সময় থেকেই আওয়ামী লীগের সঙ্গে 'শ্রমিক লীগ'-এর সংযোগ) সামগ্রিক শিল্পসম্পর্ক ব্যবস্থায় টানাপড়েন সৃষ্টি করে এবং শিল্প ও ফ্যাক্টরীতে সুষ্ঠু পরিচালনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বলে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয়। রাজনৈতিক পার্থক্যজনিত রাজনৈতিক বিরোধ থেকে উদ্ভূত আন্তঃইউনিয়ন এবং অন্তঃইউনিয়ন বিরোধ, উৎপাদনে বিঘ্ন, ঘন ঘন হরতাল এবং ধর্মঘট ইত্যাদি গভীর শ্রমিক বিশৃঙ্খলা এবং একটি উত্তেজনাকর শ্রমবাজার পরিস্থিতির সৃষ্টি করে"।[৮২]

তিনি আরও লিখেছেন, " ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকদের মধ্যে সহযোগিতার চেতনার বিকাশ এবং বৃদ্ধির পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত বাধাসমূহ হচ্ছে ট্রেডইউনিয়নগুলোর অতিরিক্ত রাজনৈতিকীকরণ। নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সমঝোতার অভাব, সিবিএ-র মাত্রাতিরিক্ত হস্তক্ষেপ, শ্রমিকদের উচ্চহারে নিরক্ষরতা এবং তাদের প্রেষণা ও অঙ্গীকারের অভাব ইত্যাদি"।[৮৩]

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানেও সংঘাতমুখী শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক ও বিরোধ নিরসনের ব্যবস্থা সন্তোষজনক ও কার্যকর নয়। শ্রমিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক উত্তেজনাপূর্ণ থাকলে স্বাভাবিক উৎপাদন কার্য পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আদমজী পাটকলে ইউনিয়নের জঙ্গিপনার ফলে পুনঃপুনঃ উৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল। যার ফলশ্রুতি হচ্ছে আদমজী বন্ধ হয়ে যাওয়া । এ থেকে বুঝা যায় বাংলাদেশে শিল্পে অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে। আমরা বলতে পারি শিল্পে আধুনিকায়নের প্রভাবের ফলে আন্দোলন, অস্থিরতা, অরাজকতা দেখা দিলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ ঃ

১. ঐতিহাসিক Aronold Toynbee উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ বিপ্লবকে শিল্প বিপ্লব নামকরণ করেন।

২. Prof. Lady Williams C.B.E.P. Professor of emeritus of School of Economics, London University. উদ্ধৃতিঃ শামসুজ্জামানখান,'*উচ্চতর সমাজকল্যাণ,*' ঢাকা বুক মার্ট, ১৯৬৮, পৃ. ৬০-৬১

৩. Erle Fiske Young (ed.) *The dictionary of School Welfare* Social Services Publishers, Inc. New York, 1948, p. 209

৪. শ্রী খগেন্দ্রনাথ সেন, *'সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা'* ২য় খণ্ড, বিদ্যা, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ২১২-২১৩

৫. অমিত সেন, *ইতিহাসের ধারা*, পৃ. ১২১

৬. A Birnie,*'The Economic History of Europ* Methreen Co. Ltd., London,1953

৭. Ogburn and Nimkoff, *A Handbook of Sociology* Routledge and Kegan Paul. Broadway House, London, 1960. pp. 368-377

৮. Henry Pratt, *Dictionary of Sociology & Related Sciences.* Fairchild (eds.) Littlefield, Adams & Co. New Jersy, 1964, p.155

৯. V. Tyagunenko and V. Kollontai. *Problems of Industrialization in the Developing Countries.* Moscow, 1971. উদ্ধৃতি ঃ শ্রী খগেন্দ্রনাথ সেন, *সমাজবিপ্লবের ভূমিকা ২য় খণ্ড*, বিদ্যা, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃঃ ৪২১-৪২২

১০. উদ্ধৃতি ঃ শ্রী খগেন্দ্রনাথ সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯

১১. Harold L Wilenesky and charls N. Lebeaux. *Industrial Society and Social Welfare* Russell Sage Foundation. New York. 1958. p. 50

১২. Ibid. p. 27

১৩. পরিমল ভূষণ কর, *সমাজতত্ত্ব পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ*, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৫১৬

১৪. Report of the International Export meeting on, *'The Maladjusted Behaviour of young people in present day society'*, Buttein of unesco youth Institute, June, 1958, No-2, p.36

১৫. আবেদীন কাদের, *শিল্প বিপ্লব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৮৫, পৃ. ৫৪

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ.৫৫

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬

২২. ফারুক আবদুল্লাহ্, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জানুয়ারি, ১৯৭৪, পৃ. ৫৯

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১-৬২

২৪. Edwin B. Flippo *Principles of personnel management*, MC Graw Hill Book Company, 5th Edition, 1980, p. 378

২৫. Sedny and Betrice Webb, *History of Trade Union*, p.1

২৬. বদরুদ্দীন উমর, *আজকের কাগজ*, ১১ই মার্চ, ১৯৯২

২৭. বদরুদ্দীন উমর, *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ২৬মে , ১৯৯২

২৮. বদরুদ্দীন উমর, *ত্রৈমাসিক মাটি*, "মে দিবস ও বাঙালাদেশে শ্রমশক্তি শোষণ", মে, ১৯৯২

২৯. বদরুদ্দীন উমর, *বাঙলাদেশের আর্থ রাজনৈতিক পরিস্থিতি*, ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, সেপ্টেম্বর,১৯৯৪, পৃ. ২৬

৩০. ঐ, পৃ. ২৯

Dhaka University Institutional Repository

৩১. B. B. C. NEWS. 3.8.2002

৩২. 'Bangladesh Country Study and Norwegian Aid Review' (1986) থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৬

৩৩. দেখুন, ঢাকাস্থ বাংলাদেশের জন্য বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি ক্রিস্টোফার উইলোঘবাই (Christapher Willanghby), এর সাক্ষাৎকার। জার্মানীর ডর্টমান্ড থেকে প্রকাশিত পত্রিকা Sud Asian, ১৫ অক্টোবর, ১৯৯২ এর সংখ্যা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৭০

৩৪. পি.জে.জে. এম. কাস্টারস্ অনুবাদ ঃ হায়দার আকবর খান রনো, *এশীয় অর্থনীতিতে পুঁজির সঞ্চয় ও নারীশ্রম*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৯৯, পৃ. ১১২

৩৫. *Far Easter Economic Review*, April 14, 1994. থেকে উদ্ধৃত (ঢাকার) শিল্প ও বাণিজ্যের মেট্রোপলিটন চেম্বার কর্তৃক প্রদত্ত পরিসংখ্যান মতে ১৯৯০ এর জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে মোট রপ্তানী ছিল ১,২৮৭.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে গার্মেন্ট রপ্তানির অংশ হচ্ছে ৬৯২.৫ মার্কিন ডলার, চার্ট দেখুন।

৩৬. সাপ্তাহিক হলিডে (ঢাকা)-এর ১৩ মার্চ ১৯৯২ এর সংখ্যায় World Bank Playing the Role of a parallel Government' শিরোনামে অধ্যাপক Micheal Chossuidovski এর সাক্ষাৎকার আছে।

৩৭. আনু মুহাম্মদ , *সংস্কৃতি*, মে, ২০০০, পৃ. ৩২

৩৮. Marx (1977a) Chapter X 'the Working Day' (দেখুন Section 2 'the Greed for Surplus Labour Manufacturer and Boyard'. p. 226

৩৯. বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের মুখপাত্র *গার্মেন্ট* এর ১৯৯৩ এর মে সংখ্যায় পৃ. ২, প্রকাশিত সাম্প্রতিক শ্রম আইন ও গার্মেন্ট শিল্প' ।

৪০. দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ব্যারণ গার্মেন্ট' ও 'ডাক গার্মেন্ট লিমিটেড'- এ সংঘর্ষ , ১৯৯৩ নভেম্বরে *Clean Cloth* No 1এ প্রকাশিত হয়েছে, পৃ. ১২

৪১. *Clean Cloth*. Vol. 2 (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪), পৃ. ১৩/১৪, ফ্লিন্ট গার্মেন্ট নারী শ্রমিকদের সংগ্রামের উপর রিপোর্ট।

৪২. ১৯৯২ এর অক্টোবরে প্রদত্ত বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সাক্ষাৎকার।

৪৩. উপরে উল্লিখিত বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক কর্মচারি ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের বিবৃতি

৪৪. ঐ

৪৫. *Spur*, সেপ্টেম্বর / অক্টোবর সংখ্যা ১৯৯২, পৃ. ৪, ইহা World Development movement, (লন্ডন যুক্তরাজ্য) এর সংবাদ বুলেটিন । সেখানে প্রকাশিত প্রবন্ধ ' Hard Work - But There is Hope' দেখুন (Ben Jackson.)

৪৬. পূর্বে উল্লেখিত প্রবন্ধ 'সাম্প্রতিক শ্রম আইন ও গার্মেন্ট শিল্প'।

৪৭. সাপ্তাহিক *Holiday* এর ১ জানুয়ারি, ১৯৯৩ এর সংখ্যায় প্রকাশিত S.M. Khodker এর লেখা 'Axe comes Down on Garment worker' নিবন্ধ থেকে উদ্ধৃত ।

৪৮. আনু মুহাম্মদ, *সংস্কৃতি*, 'গার্মেন্টস ও ইপিজেড-এ ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিকদের রাজনৈতিক অধিকার', মে, ২০০০, পৃ. ৩২

৪৯. Bangladesh Peoples solidaity Center, Amsterdam, the Netherlands এর সংবাদ বুলেটিন *সমাচার*, মার্চ /এপ্রিল, ১৯৯১ এর সংখ্যা- এ প্রকাশিত রিপোর্ট দেখুন ।

৫০ *সমাচার* (জুন-জুলাই ৯১ ও মার্চ-এপ্রিল ৯২) প্রকাশিত রিপোর্টগুলি দেখুন

৫১. *Clean Cloth*, Campaign, (আমষ্টারডাম, নেদারল্যাণ্ড)- এর সংবাদ বুলেটিন *Clean Cloth* এর ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪- এর সংখ্যায় (পৃ. ১৩-১৪), প্রকাশিত রিপোর্ট দেখুন।

৫২. ৪৮, ঐ. পৃ. ৩৩

৫৩. ইত্তেফাক, রবিবার, ২৩ জুন ২০০২ইং , ১৪০৯

৫৪. বদরুদ্দীন উমর, *ভাষা, শ্রেণী ও সমাজ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, পৃ. (৩৩-৩৯)

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬
৫৭. বদরুদ্দীন উমর, *ভোরের কাগজ*, ১লা মে, ১৯৯৩ইং
৫৮. বদরুদ্দীন উমর , *ভোরের কাগজ*, ১৭.৫.১৯৯৩ইং
৫৯. ইত্তেফাক, ১৯শে আষাঢ়, ১৪০৯,
৬০. ইত্তেফাক, 'আদমজী জুটমিল ও বিরাষ্ট্রীয়করণ' সিদ্ধান্ত, বৃহস্পতিবার, ১৩ই আষাঢ়, ১৪০৯,
৬১. ইত্তেফাক, সোমবার, ১লা জুলাই, ২০০২ইং
৬২. ইত্তেফাক, 'আদমজীর ভেঁপু আর বাজিবেনা',বুধবার, ১৯শে আষাঢ়, ১৪০৯
৬৩. হাসান মামুন, ইত্তেফাক, 'বন্ধ আদমজী ঃ দেখতে হবে অর্থনৈতিক ও নীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, সোমবার, ১৫ই জুলাই, ২০০২,
৬৪. ইত্তেফাক, বৃহস্পতিবার, ১৩ই আষাঢ়, ১৪০৯,
৬৫. ঐ
৬৬. ইত্তেফাক, বরিবার, ১৪ই জুলাই ২০০২ইং,
৬৭. রাশেদ খান মেনন, ঐ
৬৮. ইত্তেফাক, বৃহস্পতিবার, ২৭ জুন, ২০০২ ইং ,
৬৯. ইত্তেফাক, রবিবার, ৩০ জুন, ২০০২ইং
৭০. রাশেদ খান মেনন, ইত্তেফাক, ১৪ই জুলাই, ২০০২ইং
৭১. নির্মল সেন, আদমজী পাটকল বন্ধ করলেই সমাধান মিলবে, ইত্তেফাক, বৃহস্পতিবার, ৪ জুলাই ২০০২,
৭২. মুহাম্মদ আয়নউদ্দীন, আদমজী বন্ধের ক্ষতিও বিশাল, ইত্তেফাক, বরিবার, ১১ই আগস্ট, ২০০২ইং
৭৩. Government of East Pakistan (1955) : Statistical abstract for East Pakistan containing Statistical data on variour subjects for the years 1947-48 to 1952-53, Dacca, Planning Department Govt of East Bengal. p. 249
৭৪. Ibid. p. 247
৭৫. Government of East Pakistan (1955) : op. cit., p. 247, Table-59
৭৬. Ibid, p. 248, Table 60
৭৭. Ibid, p. 249, Table 63
৭৮. Ibid, p. 249, Table 63
৭৯. Ibid, p. 250, Table 63a
৮০. বারানভ, এস.এস (১৯৮৬) : *পূর্ববাংলা অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য (১৯৪৭-৭১)* ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী- পৃ. ১২
৮১. Hexner, J. Tomas (1969) : EPIDC. A conglomerate in Pakistan -- The Spinoff Process, Cambridge: Development Advisory Service, Mimeo, p. 97
৮২. আহমেদ, মমতাজউদ্দীন ২০০০ ' সাতচল্লিশ-উত্তর সময়ে শিল্প এবং শিল্প সম্পর্ক,' সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, ২য় খণ্ড অর্থনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, পৃ. ৫৫৭
৮৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৯

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় - ৭

উপসংহার

দীর্ঘ আলোচনা থেকে দেখতে পাই যে আধুনিকীকরণ ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত । আধুনিকীকরণের প্রভাবে দেখা যায় যে এর Positive ও Negative effect দুই-ই আছে । আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার সময়ই অস্থিতিশীলতা দেখা দেয় । সনাতন, রক্ষণশীল সমাজের মানুষেরা তাদের যে কোন পরিস্থিতির জন্য বিধাতাকে দায়ী মনে করে এবং তারা ভাগ্যকে মেনে নিয়েই বসে থাকে । কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ এসব সনাতন চিন্তা ভেঙ্গে আধুনিক চিন্তায় উদ্ভাসিত হয়ে প্রতিবাদী হয়ে উঠে। প্রতিবাদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার আগ পর্যন্ত ব্যাপারটাই হচ্ছে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া । তবে সর্বক্ষেত্রে ক্ষোভ সৃষ্টি হলেই যে প্রতিবাদ করতে পারবে তার নিশ্চয়তা নেই, সেক্ষেত্রে মানসিক অস্থিরতা দেখা দেয় । অনগ্রসর জনগোষ্ঠী আন্দোলন করতে পারেনা । যেমন ঃ শিল্প-বিপ্লব যখন হয় তখন তৎকালীন ইংল্যান্ডের শোষিত শ্রেণী প্রথমেই বিদ্রোহাত্মক হয়ে উঠেনি । পর্যায়ক্রমে তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠে । রবার্ট ওয়েন নামক জনৈক আইনজীবি শ্রমিকদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন । এক পর্যায়ে শ্রমিকদের মধ্যে চৈতন্য ফিরে আসে এবং তারা বুঝতে পারে যে মানুষই তাদের নিজেদের ভাগ্যের নির্মাতা । শিল্প বিপ্লব ও শিল্পায়নের বিভিন্ন নেতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও সমাজ জীবনে ও মানব সভ্যতার উন্নয়নে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনিয়তা অপরিসীম । শিল্পায়নের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মালিক শ্রেণী সব সময় সর্বক্ষেত্রেই শ্রমিক মজুরদেব শোষণ করে থাকে । ক্রমাগত শোষণ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ফলে শ্রমিকদের মনে ক্ষোভ সঞ্চারিত হতে থাকে । এ রকম পরিস্থিতিতে শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলনে নামে। শ্রমিকদের প্রথম আন্দোলন হয় আমেরিকার শিকাগো শহরে ১৮৮৬ সালের ১লা মে । তখন শ্রমিকরা কাজের সময় ৮ ঘন্টা করার দাবিতে আন্দোলন করেছিল । সেদিন শ্রমিকদের উপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করা হয় । এতে বহু শ্রমিক হতাহত হয় । এরপর থেকে প্রতিবছর ১লা মে শ্রমিক দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে । এরপর থেকে শ্রমিকদের ট্রেডইউনিয়ন কার্যক্রম শুরু হয় । বাংলাদেশের ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলন তেমন শক্তিশালী নয় উন্নত বিশ্বের তুলনায় । তবে বিভিন্ন সময়ে তারা বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে সোচ্চার হয়ে উঠে । তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য বা অপ্রতুল হলেও রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তুলে । বাংলাদেশে শিল্পায়ন খুব দ্রুতগতিতে হচ্ছেনা । শিল্পের যে ক্রমবিকাশ হচ্ছে তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রতি বছর ৪.৫% হারে শ্রমিক বাড়ছে । তবে বাংলাদেশের শ্রমিক উন্নত বিশ্বের শ্রমিকদের

Dhaka University Institutional Repository

তুলনায় অদক্ষ এবং অনিয়মিত । শিল্পায়নের ফলে দেশের বিশাল এক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান হচ্ছে । তবে শিল্প বন্ধ হয়ে গেলে এর বিরূপ প্রভাব সমাজ জীবনে পড়ে । যেমন - আদমজী জুটমিল বন্ধ হওয়ার ফলে প্রায় ২৫,০০০ শ্রমিক বেকার হয়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে মানবিক দিক দিয়ে বেদনাদায়ক। শিল্প বিরাষ্ট্রীয়করণ করতে গেলেও শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয় । শিল্পায়নের ফলে বাংলাদেশে যে শহরায়ণ হয়েছে এর ফলে বস্তি সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করায় সমাজ জীবনে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলছে । অস্থিরতা বিরাজ করছে নগর জীবনে । তবে উন্নয়নের প্রয়োজনে এবং বর্তমান পৃথিবীতে এগিয়ে যেতে হলে আধুনিকায়ন চলতে থাকবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেখানে সনাতনপন্থী সমাজ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল । কিন্তু দেশ বিভাগের পর এই অঞ্চলে আধুনিকীকরণ তথা শিল্পায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয় । যেমন ঃ কাপ্তাই প্রকল্প, কর্ণফুলি পেপার মিল, চন্দ্রঘোনা কাগজ কল, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি স্থাপিত হয় । বাঙালিদেরও অনুপ্রবেশ ঘটে । আধুনিকায়নের ফলে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলির অন্যান্য শহরের সাথে যোগাযোগ বাড়ে । এই ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে চাকমারা বৃটিশ আমল থেকেই তুলনামূলকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল । তবে দেশ বিভাগের পর যখন স্কুল-কলেজের সংখ্যা বাড়তে থাকে তখন অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেও শিক্ষিতের হার বাড়তে থাকে । শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও যোগাযোগের ফলে সচেতন, শিক্ষিত, মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে উঠে । তাদের মধ্যে সনাতন চিন্তার পরিবর্তে আধুনিক চিন্তা বিকশিত হতে থাকে । এই সচেতন শিক্ষিত শ্রেণীই বৃটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলের বিভিন্ন নীতি এবং আধুনিকায়ন করতে যেয়ে যে পরিবারগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাদের পক্ষে নেতৃত্ব দেয় এবং বিভিন্ন আমলের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদি হয়ে উঠে। বার বার শোষণের ফলে তাদের মধ্যে চেতনা, ক্ষোভ, দ্বন্দ্ব দেখা দেয় । ক্ষোভের এক পর্যায়ে উপজাতীয়দের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যাপারে সচেতনতাও বৃদ্ধি পায়। তাদের মধ্যে গোষ্ঠী চেতনাও জাগ্রত হয়। এই প্রেক্ষাপটে তারা বিভিন্ন ধরনের অর্গানাইজেশন ও এসোসিয়েশন গঠন করে । এরই প্রেক্ষিতে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন এবং তার অনুজ সন্তু লারমা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভ করে উপজাতীয়দের নিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলেন । তারা যখন প্রতিবাদি হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলেন তখনই পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয় ।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের ফলে প্রচুর পরিমানে খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে যার ফলে বর্তমানে পৃথিবীতে দ্রুত বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মিটানো সম্ভব হচ্ছে । কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে সুফলের সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক প্রভাবও দেখা দিচ্ছে। যেমন- পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা যায় । কোন কোন ক্ষেত্রে মানব স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিরূপে দেখা দিচ্ছে। তাছাড়া কৃষিক্ষেত্র বর্তমান বিশ্বে প্রায় ইন্ডাষ্ট্রির পর্যায়ে চলে গেছে । যার ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে । ধনী কৃষকরা তাদের পুঁজি থাকায় লাভবান হতে পারছে । তেমনি তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলো উন্নত দেশের কাছে মার খাচ্ছে । যেমন ঃ গরীব দেশের কৃষকরা আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত বীজ ব্যবহার করতে গিয়ে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির শিকার হয়ে মানসিক অস্থিরতায় ভুগছে । অনেক সময় কৃষকরা ছোটখাট আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিবাদিও হয়ে উঠছে । বিভিন্ন সময় সরকার ও কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠায় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয় ।

মুগল আমল থেকেই বাংলার কৃষকরা রাজা, জমিদারদের দ্বারা নীপিড়ন ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল । এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে চৈতন্য উদয় হলে তারা প্রতিবাদি হয়ে বিদ্রোহ করে । বিভিন্ন সময়ের কৃষক বিদ্রোহগুলো লক্ষ্য করলেই এর গভীরতা বুঝা যায় । বহু যুগ ধরে কৃষক সমাজ শোষিত হওয়ায় তারা ক্রমেই দরিদ্র শেণীতে পরিণত হয় । এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে ক্ষোভ হতাশা দেখা দেয় । দারিদ্র উৎসারিত নির্যাতনের বিরুদ্ধে কৃষকরা প্রতিবাদি হওয়ায় তৎকালীন বাংলায় বিভিন্ন সময়ে অস্থিতিশীলতা দেখা দেয় । এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, কৃষক বিদ্রোহ ও আন্দোলনগুলির আদর্শ বিভিন্নমুখী হওয়া সত্ত্বেও এদের মূল ঐক্য ছিল ইংরেজ বিরোধিতা এবং সার্বিক কৃষক মুক্তি । পাকিস্তান আমলেও কৃষকরা জোতদার, মহাজনদের দ্বারা শোষিত হচ্ছিল । পাকিস্তান সরকারের ভূমি ও কৃষিনীতির ফলে ভূমিহীন কৃষি মজুরদের সংখ্যা বাড়তে থাকে । পাকিস্তান পূর্ববাংলার কৃষি অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল । কিন্তু ১৯৬৮ সালের দিকে অর্থনীতির ক্ষেত্রে আইয়ুব খানের নীতি অকার্যকর হয়ে পড়েছিল । ১৯৬৮-৬৯ সালের ব্যাপক গণ-আন্দোলনে তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় । কৃষকরাও এসব আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছিল ।

পাকিস্তান ভাঙ্গনে আমরা দেখতে পাই যে শিক্ষিত সচেতন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তান সরকার তৎকালীন পূর্ববাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে বৈষম্যমূলক আচরণ করে তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ অঞ্চলের অগ্রসর জনগোষ্ঠী সোচ্চার হয় । তখন তুলনামূলকভাবে শিক্ষিত তরুণ ছাত্র শ্রেণীই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় । এখানে দেখা যায় যে আধুনিক

Dhaka University Institutional Repository

চিন্তাধারার অধিকারি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীই পাকিস্তান সরকারের একতরফা বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদি হয়ে উঠে । এর প্রথম বহিঃ প্রকাশ ঘটে '৫২ এর ভাষা আন্দোলনে । তারপর পর্যায়ক্রমে '৬২-'৬৪ ছাত্র আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলনে এর স্বরূপ দেখা যায়, ১৯৬৮-'৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান বিপ্লবের পর্যায়ে পৌছে । প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদী ছাত্ররা এসবের নেতৃত্ব দেয় । আর এসব আন্দোলনের সর্বশেষ ফলশ্রুতি হচ্ছে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ । যার মাধ্যমে বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে । এখানে বলা যায় পাকিস্তান আঙ্গনে আধুনিকতার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ।

বাংলাদেশে বর্তমানে আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া চলছে । আধুনিকায়নের সবচেয়ে বড় সংযোজন হচ্ছে ডিশ সংস্কৃতি । তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির ফলে বিশ্বের আকাশ আজ উন্মুক্ত । স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর বদৌলতে একদেশের সংস্কৃতি জীবনাচার আছড়ে পড়ছে অন্য দেশে । নিজের সংস্কৃতি বিলীন হচ্ছে অপরের মধ্যে । বাংলাদেশের অবস্থাও এর থেকে মুক্ত নয় । অপসংস্কৃতির ধারা ক্রমেই জোরদার হচ্ছে তা প্রতিদিনের খবর ও পত্রিকা লক্ষ্য করলেই অনুধাবন করা যায় । বিদেশী সংস্কৃতি ধারণ করার ক্ষমতা অর্থাৎ ভাল মন্দ বুঝার বা আয়ত্ত করার ক্ষমতা আমাদের দেশের অনেকেরই নেই। আর এর বিরূপ প্রভাব সমাজের সর্বস্তরে পড়ছে প্রতিনিয়ত। ফলশ্রুতিতে নানা ধরনের অঘটন ঘটছে যা অস্থিতিশীলতা ও অরাজকতা সৃষ্টিতে সহায়ক ।

বর্তমানে বাংলাদেশ সনাতন ও রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে আধুনিকায়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে । আর এই রূপান্তর প্রক্রিয়াকালীন সময়ে নানা ধরনের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সামগ্রিক আলোচনা পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে যেখানেই আধুনিকায়ন হয়েছে সেখানেই আন্দোলন ও অসন্তোষের ঘটনা ঘটেছে । ফলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দিয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

আকাশ, এম এম — *ভাষা আন্দোলন ঃ শ্রেণীভিত্তি ও রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহ*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০০ইং

আহমেদ, মওদুদ — *বাংলাদেশ ঃ স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৯ইং

আজাদ, লেনিন — *উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান রাষ্ট্র সমাজ ও রাজনীতি*, ঢাকাঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৭

আইয়ুব, সালাউদ্দীন — *আধুনিকতা ও উত্তর আধুনিকতা*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, জুলাই ১৯৯৪

আবেদীন, জয়নাল — পার্বত্য চট্টগ্রাম : স্বরূপ সন্ধান, ঢাকা : চৌকস প্রিন্টার্স লিঃ, ১৯৯৭

আজাদ, হুমায়ুন — *ভাষা আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি*, ঢাকা ঃ দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০০

আহমদ, আবুল মনসুর — *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭০।

আলী, এম ওয়াজেদ — *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা, ২০০০ইং

আহমেদ, এমাজউদ্দীন — *শান্তি চুক্তি ও অন্যান্য প্রবন্ধ।*

আজাদ, আবুল কালাম — *ভারত যখন স্বাধীন হচ্ছিল।*

আজাদ, লেনিন — *ভারতীয় সামন্ততন্ত্র ও মোগল আমলে বাংলার কৃষি কাঠামো*, ঢাকা : ইউপিএল।

আলম, মাহবুবু-উল — *চট্টগ্রামের ইতিহাস/নবাবী আমল ও কোম্পানী আমল*, চট্টগ্রাম : নয়ালোক প্রকাশনী, ১৯৬৫।

আহমদ, এমাজউদ্দীন — *বাংলাদেশ রাজনীতি কিছু কথা ও কথকতা* , ঢাকা : মৌলি প্রকাশনী, মে, ২০০০।

ইবরাহিম, সৈয়দ মুহাম্মদ (মেজর জেনারেল,বীর প্রতীক) — প্রার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতির মূল্যায়ন, ঢাকাঃ মওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০১ইং

ইসলাম, সিরাজুল — *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, ১ম খণ্ড রাজনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০০০

ইসলাম, নজরুল — *বাংলাদেশ সমাজ ও রাজনীতি ভাবনা*, ঢাকা : ফাকলী প্রকাশনী, অক্টোবর, ২০০০ইং

ইসলাম, সিরাজুল — *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০২-১৯৭১, ২য় খণ্ড অর্থনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০০ ।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম, জিয়াউল	*আধুনিক উন্নয়ন অর্থনীতি*, ঢাকা : মিনার্ভা পাবলিকেশনস্,১৯৯৫ ।
ইসমাইল, খন্দকার মোহাম্মদ	*বাংলাদেশের সমাজ বিপ্লবে বঙ্গবন্ধুর দর্শন*. ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০০ইং
উমর, বদরুদ্দীন	*বাংলাদেশের আর্থ রাজনৈতিক পরিস্থিতি*, ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৪ইং।
উমর, বদরুদ্দীন	*পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (১ম ও ২য় খণ্ড), ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৫ইং
উমর, বদরুদ্দীন	*পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (তৃতীয় খণ্ড)*, ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৫ইং
উমর, বদরুদ্দীন	*বাংলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন*, ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৮ ।
উমর, বদরুদ্দীন	*যুদ্ধপূর্ব বাংলাদেশ*।
উমর, বদরুদ্দীন	*একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের পথে*, ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০
এর্‌লার, বৃগিতে	*সাহায্য না মরণাস্ত্র ? উন্নয়নমুলক সাহায্য বিষয়ক একটি রিপোর্ট*, ঢাকা : ইউপিএল, ১৯৯৫ ।
কাস্‌টারস্, পি জে জে এম	*এশীয় অর্থনীতিতে পুঁজির সঞ্চয় ও নারী শ্রম* , ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯ ।
ক্লিং, ব্লেয়ার বি	*নীলবিদ্রোহ বাংলায় নীল আন্দোলন ১৮৫৯-১৮৬২*, ঢাকা : আই, সি. বি.এস., ১৯৯৫ ।
কামাল, আহমেদ	*কালের কল্লোল বাংলাদেশ ১৯৪৭-২০০০*, ঢাকা : মৌলি প্রকাশনী, ২০০১ ।
কাদের, আবেদীন	*শিল্প বিপ্লব*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫
কবির, শাহরিয়ার	*শান্তির পথে অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম*
খান, মোহাম্মদ শামসুল কবির	*বাংলাদেশের অর্থনীতি*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী
চক্রবর্তী, তপন	*বিজ্ঞান ও প্রত্যাশা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪
চক্রবর্তী, রতনলাল	*সিলেটের নিঃস্ব আদিবাসী পাত্র*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮
চক্রবর্তী, রতনলাল	*ভাষা আন্দোলন ঃ দলিলপত্র*, ঢাকা : কল্যাণ প্রকাশন, ১৯৯১
চৌধুরী, মফিজ	*দূর্নীতিঃ বিপ্লব ও সমকালীন প্রসঙ্গ*, ঢাকা : হাক্কানী পাবলিশার্স,১৯৯৩
চৌধুরী, আবদুল মমিন	*শিল্প উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০০
ছফা, আহমদ	*শান্তিচুক্তি ও নির্বাচিত নিবন্ধ*, ঢাকা : ইনফো পাবলিকেশনস
জাহাঙ্গীর, বোরহান উদ্দীন খান	আধুনিকতা ও উত্তর আধুনিকতা অভিজ্ঞতা, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭
জাহাঙ্গীর, বোরহান উদ্দীন খান	*বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চল ও শ্রেণী সংগ্রাম*

Dhaka University Institutional Repository

জাহাঙ্গীর, বোরহান উদ্দীন খান	*বাংলাদেশ আন্দোলন ও অন্যান্য প্রবন্ধ*
জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দীন খান	*জার্নাল '৭১*, ঢাকা : ওয়ার্ল্ড প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশিং, ১৯৯০
দত্ত, শেখর	*মে দিবসের কথা ও বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণী*, ঢাকা : ১৯৮৩
পারভেজ, মাহফুজ	*বিদ্রোহী পার্বত্য চট্টগ্রাম ও শান্তিচুক্তি*, ঢাকা : সন্দেশ প্রকাশনী, ১৯৯৯
পান্না, মুস্তাফা	*বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫
ফারুক, আব্দুল্লাহ	*বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪
বিশ্বাস, নীল কমল	*বাংলাদেশের রাজনীতি একাত্তর থেকে আটনব্বই*, ঢাকা : এশিয়া পাবলিকেশনস, ২০০১
বকুল , ইসমাইল হোসেন	*ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রক্তঝরা একুশ*, ঢাকা : এশিয়া পাবলিকেশনস, ২০০০
ভট্টাচার্য, অজয়	*নানকার বিদ্রোহ*, ঢাকা : মুক্তধারা, ১৯৮৬
মুহিত, আবুল মাল আব্দুল	*বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০
মাসুম, আব্দুল লতিফ	*জাতীয় ঐকমত্য ও উন্নয়ন সংকট*, ঢাকা : আফসার ব্রাদার্স, ২০০২
মুকুল, এম আর আখতার	*ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা : নিউ শিখা প্রকাশনী, ১৯৯৯
মুহাম্মদ, আনু	*পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণ ও অনুন্নত বিশ্ব*
মুকুল, এম আর আখতার	*একুশের দলিল*, ঢাকা : অনন্যা প্রকাশ, ১৯৯৯
মুকুল, এম আর আখতার	*চরমপত্র*, ঢাকা : সাগর পাবলিশার্স, ২০০০
মামুন, মুনতাসীর	*পরাজিত পাকিস্তানী জেনারেলদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা : সময় প্রকাশন, ১৯৯৯
মামুন, মুনতাসীর	*রাও ফরমান আলী খান*, ভূমিকা, বাংলাদেশের জন্ম, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৬
মোহান্ত, দীপংকর	*মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের চা-শ্রমিক*, ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০
মুৎসুদ্দী, চিন্ময়	*পার্বত্য চট্টগ্রাম ইতিহাস, অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী
রহমান, ফজলুর	*তৎকালীনস পূর্ব পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব (১৯৪৭-৭১)*, পি.এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮
রশীদ, মুহাম্মদ আব্দুর	*শিল্প ব্যবস্থাপনা ও মানবীয় সম্পর্ক* , দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২ইং
রহমান, মোঃ মাহবুবুর	*বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, ঢাকা : সময় প্রকাশনী, ১৯৯৯ইং
রহমান, মীজানুর	*কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ ১ম, ২য় খণ্ড*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী
রহমান, হাসান হাফিজুর (সম্পাদিত)	*বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র ঃ প্রথম খণ্ড*, ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২

Dhaka University Institutional Repository

রহমান, হক	*বাংলাদেশের অর্থনীতি*, ঢাকা : নিউ পূবালী মুদ্রারণ , ১৯৯৬ইং
রশীদ, হারুন-অর	*রাহুর কবলে বাংলাদেশের অর্থনীতি*, ঢাকা : আফসার ব্রাদার্স, ২০০২
রহমান, আতিকুর	*গবেষণাকর্ম ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম*, ঢাকা : কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি
রহমান, আতিউর	*ভাষা আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক পটভূমি*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০০
রহমান, আসহাবুর	*বাংলাদেশ কৃষিপ্রশ্ন তত্ত্ব ও বাস্তবতা*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৭
রহমান, আতিউর	*কৃষি প্রশ্ন ঐতিহাসিক রুশ বিতর্ক এবং তৃতীয় বিশ্বে তার প্রাসঙ্গিকতা*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯
রহমান, আতিউর ও আজাদ লেনিন	*ভাষা- আন্দোলন অর্থনৈতিক পটভূমি*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০০
রহমান, আতিউর ও হাশেমী সৈয়দ	*ভাষা আন্দোলন ঃ অংশগ্রহণকারীদের শ্রেণী অবস্থান*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০০
লেনিন, নূহ-উল আলম	*পার্বত্য চট্টগ্রাম সমুখে শান্তি পারাবার*, ঢাকা : হাক্কানী প্রকাশনী, ১৯৯৯
শফি, মোহাম্মদ	*ভাষা আন্দোলন আগে ও পরে*, ঢাকা : বিদ্যা প্রকাশ , ২০০১
শামসুদ্দীন এ টি এম	পাকিস্তান যখন ভাঙলো, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৬
সামাদ, আতিকুস	*মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম* , (বি বি সি থেকে প্রচারিত) ঢাকা : জাগৃতি প্রকাশনী, ১৯৯৫
সিংহ , মণি	*জীবন সংগ্রাম* , জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯১
সিদ্দিকী, হাফিজ গোলাম আজম	বাংলাদেশের শিল্প, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫
সোবহান, রেহমান	*বাংলাদেশের অভ্যুদয়ঃ একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য* , ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮
সোবহান, রেহমান	*বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংকট*, বাংলাদেশের অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধাবলী, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
সিদ্দিকী, চৌধুরী হাবিবুর রহমান	*ভাষা আন্দোলনের পটভূমিকায় বাঙালীর বাংলাদেশ*, ঢাকা : চৌধুরী প্রকাশনী, ১৯৯২
সফিউল্লাহ্, কে.এম.(বীর উত্তম)	*মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫
সাহেব, লাল	*পার্বত্য চট্টগ্রাম, বিচিত্র উপজাতীয় জীবন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা*, ইউসুফ প্রিন্টিং প্রেস এণ্ড পাবলিসার্শ
হোসেন, হোসেন উদ্দীন	*বাংলার বিদ্রোহ (৬০০-১৯৪৭)*, ঢাকা : বিদ্যা প্রকাশ, ১৯৯৯
হান্নান, মোহাম্মদ	*বাংলাদেশের ছাত্র-আন্দোলনের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড)*, মুক্তিযুদ্ধ পর্ব, ঢাকা : গ্রন্থলোক, ১৯৯১

Dhaka University Institutional Repository

হান্নান, মোহাম্মদ	*বাঙালীর ইতিহাস*, ঢাকা : অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৮
হক, মোহাম্মদ আব্দুল	*রাষ্ট্রগ্রন্থ বাংলাদেশ* , ঢাকা : রুনা প্রকাশনী, ১৯৯৭
হক, এম আজিজুল	*বাংলার কৃষক*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২ইং
হেলাল, বশীর আল	*ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫
হোসেন, ফেরদৌস	*বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের রাজনীতি অর্থনীতি*, ঢাকা : মৌলি প্রকাশনী, ২০০১
হক, মাসুদুল	*বাঙালি হত্যা এবং পাকিস্তানের ভাঙ্গন*, ঢাকা : সুচয়নী পাবলিশার্স, ১৯৯৭
হোসেন, তফাজ্জল (মানিক মিয়া),	পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর, ঢাকা : বাংলাদেশ বুকস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ , ১৯৮১
Apter, David,E,	*The Politics of Modernization*, Chicago, University of Chicago Press, 1965
Ahmed, Emajuddin	*Millitary Rule and Myth of Democracy*, UPL, Dhaka, 1988
Ahmed, Mushtaq	*Government and Politics in Pakistan*, Pakistan Publishing House Second Edition (Karachi-1963)
Black, C.E.	*The Dynamics of Modernization*, New York, Harpar and Row, 1966
Chowdhury, Najma	*The Legislative Process in Bangladesh: Politics And Functioing of the East Bengal Legislature* 1947-58, Dhaka : The City Press,
Callard, Keith	*Pakistan a Political Study*, Oxford University Press, Karachi, First Published, 1957
Chowdhury, A.K.	*The Independence of East Bengal*, Dhaka : Jatiya Grantha Kendra, 1984
Das, Abhoy Chandra	*The Indian Ryot*, Howrah Press, 1881
D.A. Rastow,	*A World of Nations Problem of Political Modernization*
LEVY, Marion J(Jr.)	*Modernization and Structure of Societies : A Setting for International Affairs*, Princeton, Princeton University Press, 1969
Malik, A.M.	*Labour Problems and Policy in Pakistan*, Movieland Printing Press, Burns Road, Karachi, 15 July, 1954
Maniruzzaman, Talukder	*Redical Politics and the Emargence of Bangladesh*, Bangladesh books International Ltd. Dhaka, 1975

Dhaka University Institutional Repository

Mahmood, Safdar	*Pakistan Divided*, New Delhi : Alpha & Bravo, 1983
Huntingtion S.P.	*Political Order in Changing Societies*, Yale University Press, New Haven, London, 1964
Hossain Mahabub	*Green Revolution in Bangladesh*, UPL. Dhaka, 1989
Jahan, Rounaq	*Pakistan Failure in National Integration*, UPL. Dhaka, 1973
Pye, L.W.	*Aspects of Political Development*, Boston, Little Brown and Co., 1966
Quibria, M.G	*The Bangladesh Economy in Transition*, UPl. Dhaka, 1997
Sen, Rangalal	*Political Elites in Bangladesh*, UPL, Dhaka, 1968
Shelly, Mizanur Rahman	*The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh*, Centre for Development Research, Bangladesh, 1992
WELCH C.E. Jr. (ed)	*Political Modernization, a reader in Comperative Political Change*, State University of New York Prfess, 1976
Zaheer, Husan	*The Separation of East Pakistan the Rese and Realization of Bengali Muslim Nationalism*. Dhaka : University Press Ltd., 1994

Government Publications

Preliminary Report, Population Cencus, 2001 ....
Bangladesh Bureau of Statistics.

Bangladesh Population Cencus, 1991
Zila series (64 new Zilla) each zila
Labour Force Survey

Bangladesh Population Cencus, 1991
Zila Dhaka Community Series April 1993
Bangladesh Bureau of Statistics

Bangladesh Population Cencus, 1981
Analytical Findnas and National Tables
August 1984 By Dr. A.K.M. Ghulam Rabbani
Bangladesh Bureau of Statistics

Dhaka University Institutional Repository

1999
Statistical Year book of Bangladesh
Twentieth edition

Bangladesh Population Census 1991
Volume- 4
Socio-Economic and Demographic Report
August 1999

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৮৫-১৯৯০, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯১-১৯৯৬, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯৭-২০০২, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা ।

জার্নাল

অর্থনৈতিক সংস্কারের অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশের উন্নয়ন পর্যালোচনা ১৯৯৫, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ।

রাজনীতি অর্থনীতি জার্নাল, জানুয়ারী-জুন,১৯৯৯, ঢাকা : রাজনীতি গবেষণাকেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা-৪৩, জুন-১৯৯২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রকাশিত।

উন্নয়ন বিতর্ক, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুন ১৯৯৯, ঢাকা : বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ।

সমাজ নিরীক্ষণ, ৭৯, ফেব্রুয়ারী, ২০০১, ঢাকা : সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।

বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, সপ্তম খণ্ড, ১৩৯৬, ঢাকা : বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ।

বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, অষ্টম খণ্ড, ১৩৯৭, ঢাকা : বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ।

বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, নবম খণ্ড, ১৩৯৮, ঢাকা : বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ।

বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, দশম খণ্ড, ১৩৯৯, ঢাকা : বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ।

বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, এয়োদশ খণ্ড, ১৪০২, ঢাকা : বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, পঞ্চদশ খণ্ড, ১৪০৪, ঢাকা : বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান।

সংবাদপত্র

ইত্তেফাক
দৈনিক ভোরের কাগজ
প্রথম আলো
আজকের কাগজ
ত্রৈমাসিক মাটি
Observer
The Daily Star
বিচিত্রা